AMARBOI.COM

আমার আমি

উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমার স্বর্গত পিতৃদেবের উদ্দেশে
অর্পণ করলাম—
উত্তম

AMARBOI.COM

আমার কিছু কথা/কৃতজ্ঞতা

বহু বিশেষণে উত্তমকুমার আজ স্নাত।

সে সব বিশেষণের প্রতি আমি বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট নই। যাঁকে ঘিরে আজ এই বিশেষণ, আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম সেই মানুষটির, সেই কিংবদন্তীর নায়ক-এর ফেলে আসা কয়েকটি রক্তাক্ত পদচিহ্ন দেখে। প্রতিভা, কর্মক্ষমতা, সাধনা আর একনিষ্ঠতা দিয়ে আজকের বিদগ্ধ জনমানসের একান্ত ভালবাসার জগতে পৌঁছবার জন্য অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, অজস্র কাঁটা বিছানো বন্ধুর পথ মাড়িয়ে যে মানুষটি সারা দেহ-মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে উল্কার মত ছুটে আসছিলেন, অবশেষে যিনি সেই বন্ধুর পথ পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছেন তাঁর আরাধ্য শিল্প-চেতনার আলোকময় জগতে, আমি তাঁকে আমার সাংবাদিক মন থেকে অন্তরের সবটুকু শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছি মাত্র। আর তারই নিদর্শন এই "আমার আমি"।

অভিনয় শিল্পের প্রতি, কলাশিল্পের সর্বস্তরের সব শ্রেণীর শিল্পীদের প্রতি, সাধারণ মানুষের প্রতি যাঁর অন্তরের একান্ত প্রীতি বার বার বর্ষিত হয়েছে, তাঁর সেই প্রগাঢ় প্রীতিকে প্রণতি জানাতেই আমি অগ্রণী হয়েছিলাম। আমাকে আকৃষ্ট করেছিলেন শুধুমাত্র শিল্পী উত্তমকুমার নন, বিরাট এক মানুষ উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়। সদা হাস্যময়, উদার মানুষ।

প্রায় দশ বছর আগের কথা, উত্তমবাবু যখন সবচাইতে বেশী ব্যস্ত, যখন তিনি মধ্যাহ্ন গগনের উজ্জ্বলতম সূর্য, যখন তাঁর চতুর্দিকে বৃত্তাকারে মানুষ তাঁকে কাজে কাজে ভরিয়ে রেখেছেন, যখন তাঁকে মূলধন করে নিজেদের সাজাবার ভাবনা ভাবছেন অনেকেই, ঠিক তখন আমি তাঁর সান্নিধ্যে আসি, আমি তাঁকে আত্মজীবনী লেখায় বার বার অনুপ্রাণিত করি। অবশেষে আমার অনুলেখকের ভূমিকা। জন্ম নেয় এই "আমার আমি"। আজ আমি চরম খুশি, আমি ধন্য সেই গ্রন্থের তৃতীয় ও পরিবর্দ্ধিত রাজকীয় সংস্করণ দেখে, ঠিক তেমনি চরমতম ব্যথিত এই কারণে, যে রাজার জন্যে এই রাজকীয় সংস্করণ, সেই রাজা নেই।

বছর দশেক আগে প্রসাদ পত্রিকায় এই আত্মজীবনী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম এবং পরে যখন ১৩৮১ সালে দে'জ পাবলিশিং থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন আমার অগ্রজ উত্তমকুমার বার বার বলেছেন, "দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলে আমার জীবনের অনেক না বলা কাহিনী উদ্ঘাটন করবো।"

B. No. 1594
1544

আমার কিছু কথা/কৃতজ্ঞতা

বহু বিশেষণে উত্তমকুমার আজ খ্যাত।

সে সব বিশেষণের প্রতি আমি বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট নই। যাঁকে ঘিরে আজ এই বিশেষণ, আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম সেই মানুষটির, সেই কিংবদন্তীর নায়ক-এর ফেলে আসা কয়েকটি রক্তাক্ত পদচিহ্ন দেখে। প্রতিভা, কর্মক্ষমতা, সাধনা আর একনিষ্ঠতা দিয়ে আজকের বিদগ্ধ জনমানসের একান্ত ভালবাসার জগতে পৌঁছবার জন্ত অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, অজস্র কাঁটা বিছানো বন্ধুর পথ মাড়িয়ে যে মানুষটি সারা দেহ-মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে উল্কার মত ছুটে আসছিলেন, অবশেষে যিনি সেই বন্ধুর পথ পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছেন তাঁর আরাধ্য শিল্প-চেতনার আলোকময় জগতে, আমি তাঁকে আমার সাংবাদিক মন থেকে অন্তরের সবটুকু শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছি মাত্র। আর তারই নিদর্শন এই "আমার আমি"।

অভিনয় শিল্পের প্রতি, কলাশিল্পের সর্বস্তরের সব শ্রেণীর শিল্পীদের প্রতি, সাধারণ মানুষের প্রতি যাঁর অন্তরের একান্ত প্রীতি বার বার বর্ষিত হয়েছে, তাঁর সেই প্রগাঢ় প্রীতিকে প্রণতি জানাতেই আমি অগ্রণী হয়েছিলাম। আমাকে আকৃষ্ট করেছিলেন শুধুমাত্র শিল্পী উত্তমকুমার নন, বিরাট এক মানুষ উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়। সদা হাস্যময়, উদার মানুষ।

প্রায় দশ বছর আগের কথা, উত্তমবাবু যখন সবচাইতে বেশী ব্যস্ত, যখন তিনি মধ্যাহ্ন গগনের উজ্জ্বলতম সূর্য, যখন তাঁর চতুর্দিকে বৃত্তাকারে মানুষ তাঁকে কাজে কাজে ভরিয়ে রেখেছেন, যখন তাঁকে মূলধন করে নিজেদের সাজাবার ভাবনা ভাবছেন অনেকেই, ঠিক তখন আমি তাঁর সান্নিধ্যে আসি, আমি তাঁকে আত্মজীবনী লেখায় বার বার অনুপ্রাণিত করি। অবশেষে আমার অনুলেখকের ভূমিকা। জন্ম নেয় এই "আমার আমি"। আজ আমি চরম খুশি, আমি ধন্য সেই গ্রন্থের তৃতীয় ও পরিবর্ধিত রাজকীয় সংস্করণ দেখে, ঠিক তেমনি চরমতম ব্যথিত এই কারণে, যে রাজার জন্যে এই রাজকীয় সংস্করণ, সেই রাজা নেই।

বছর দশেক আগে প্রসাদ পত্রিকায় এই আত্মজীবনী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম এবং পরে যখন ১৩৮১ সালে দে'জ পাবলিশিং থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন আমার অগ্রজ উত্তমকুমার বার বার বলেছেন, "দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলে আমার জীবনের অনেক না বলা কাহিনী উদ্ঘাটন করবো।"

আমি জানি এই প্রথম পর্বে আমার পরম শ্রদ্ধেয়া বেণুদির (সুপ্রিয়া দেবী) কথা ছিলই না বললে চলে, সেই সঙ্গে ছিল না মহানায়ক উত্তমকুমারের ভাল-মন্দয় মেশানো মানসিকতার বিশ্লেষণ। এবার সবই সংযোজিত হয়েছে। '৮০ সালের গোড়া থেকেই আমি মাঝে মাঝে দাদাকে বিরক্ত করেছি সেই না বলা কাহিনী বলার জন্যে। যাত্রা-জগতে নির্দেশক ও সুরকার রূপে তাঁকে যুক্ত করার স্পর্ধা দেখিয়ে যখন সম্মতি পেয়েছি, যখন যাত্রার ব্যাপারে প্রায় প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছি, তখন মধ্যে মধ্যে শুনেছি তাঁর না বলা অনেক কথা। মাঝে মাঝে তাঁর জীবনকাব্য নিয়ে গবেষণার মত করে পড়েছি-জেনেছি তাঁকে। দাদাকে শুনিয়েছি পাণ্ডুলিপি। তারপর হঠাৎ জলন্ত প্রদীপটা নিভে গেল। দাদার সঙ্গে আমার শেষ দেখা জুলাই-এর বাইশ তারিখ।

এরপর চোখের জলে কাগজ নষ্ট করে করেও তাঁর না বলা সব কথার মালা গেঁথেছি রাতের পর রাত জেগে। গত পর্ব '৭৪ সালে শেষ হয়েছিল, তারপর ৫ই আগষ্ট থেকে ২০শে আগষ্ট এই পনের দিনের মধ্যে এই মালা গাঁথা শেষ করেছি। কিছু ত্রুটি থাকতে পারে তার জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নেব। একটা কথা পরিষ্কার করে বলে রাখি, দাদার মহাপ্রয়াণের পর নিছক ব্যবসার জন্য আমাকে যে কলম ধরতে হয়নি তার জন্য আমি কৃতার্থ।

আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞ লালুদার কাছে, দাদার বাল্যবন্ধু ডাক্তার লালমোহন মুখার্জী আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ আমার অগ্রজ সাংবাদিক বিজয় রায়ের কাছে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এই গ্রন্থের সার্থক রূপায়ণের জন্যে। আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ প্রসাদ পত্রিকার সম্পাদক-কর্ণধার প্রণব বসু ও সহযোগী সম্পাদক প্রণব বিশ্বাসের কাছে। এঁরা নানা-ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন।

শিল্পী সংসদের প্রাক্তন সম্পাদক, প্রবীণ চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রদ্ধেয় অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং প্রযোজক অসীম সরকারের কাছেও আমি ঋণী। কৃতজ্ঞ সুসাহিত্যিক বিমল মিত্রের কাছে। তিনি এই গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন।

অবশেষে আমি চরমতম কৃতজ্ঞ স্বয়ং চরিত্রস্রষ্টা অমর উত্তমকুমারের কাছে —যিনি আমার প্রতি করুণা দেখিয়ে আমার হাত ধরে অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়েছেন তাঁর ভালবাসা আর স্নেহ দিয়ে।

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ

আমার আমি

Acc No.
1597

AMARBOI.COM

অনুলেখক
গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ

Uttam Kumar

PHONE : 44-7135
43-1260

13, MOIRA STREET
CALCUTTA-700 017

শ্রীমান গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ যখন আমার আত্মজীবনী আমার ভাষায় লিখবার জন্য অনুরোধ জানালো তখন তার আব্দার উপেক্ষা করতে পারলাম না।

শ্রীমান গৌরাঙ্গের এই রচনার পাণ্ডুলিপি আমি পড়েছি এবং কিছু রদবদলও করেছি, তবু এ আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার বলেই বোধকরি গোটা পাণ্ডুলিপির ভাষায় এবং রচনাকুশলতায় আমি সন্তুষ্ট হলেও, কোথায় যেন কিছুটা ত্রুটি রয়ে গেছে। সে ত্রুটি অবশ্যই অনুলেখকের নয়। আসলে, ঠিক এই সময়ে আমার আত্মজীবনী প্রকাশিত হোক আমি চাইনি। চাইনি তার কারণ, আত্মজীবনীতে কিছু মাত্র বাদ থাকা উচিত নয়। অথচ শ্রীমান গৌরাঙ্গের আব্দার রক্ষার্থে আমি অনেক কথাই বলতে পারলাম না। অবশ্য ঠিক এখনই সব কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভবও নয়।

ইতিপূর্বে অনেকেরই এই আত্মজীবনী প্রকাশে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রত্যাখ্যান করেছি, এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলাম এই তরুণ সাহিত্যিক-সাংবাদিকের কাছে।

প্রথম খণ্ড হিসেবে এটি প্রকাশিত হলে মন্দ হবে না। তবে দ্বিতীয় খণ্ড আপনারাই ভবিষ্যতে প্রকাশ করবেন আশা রাখি, সেই সংগে আমার জীবনের অনেক না বলা কাহিনী উদ্ঘাটন করব।

এই বইয়ের সব রকম দায় দায়িত্ব গৌরাঙ্গের উপর ন্যস্ত করলাম।

নমস্কারান্তে

১২ই মে ১৯৭১
ময়রা ষ্ট্রীট
কলকাতা-১৭

UTTAM KUMAR

AMARBOI.COM

MANMATHA RAY

President :
Natyakar-Sangha, West Bengal
Indo-Soviet Cultural Society, Calcutta
North Calcutta Film Society
Girish Chandra Ghosh Lecturer, (1953)
Calcutta University
Academic Councillor :
Rabindra Bharati University
Vice-President :
All India Peace Council, Calcutta

Phone : 35-3125
229C, Vivekananda Road,
Calcutta-6

30.1.1970

সর্বোত্তমেষু।

তোমার ২৮/১/৭০ তারিখের পত্র কাল পেয়ে জানলাম আমার সঙ্গীত নাটক আকাদামির সম্মান প্রাপ্তিতে শিল্পীসংসদ রবীন্দ্র ভবনে আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারি আমাকে অভিনন্দন জানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ অভিনন্দন আমার কাছে সর্বোত্তম সন্দেহ নেই, কিন্তু আকাদামির ঐ সম্মান অর্পণ উৎসব নয়াদিল্লীতে আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঠিক থাকায়, আমি এখন কি করি বলো।

তোমার উপদেশের প্রতীক্ষায় থাকবো।

ভালোবাসা।

গুণমুগ্ধ
কৃতার্থী
মন্মথ রায়

শ্রীউত্তমকুমার
সভাপতি, শিল্পীসংসদ
সমীপেষু॥

25, Dharamtalla Street
Calcutta 13

আমার দেবতা আমার মা ।। আমার প্রেরণা আমার বাবা।

স্থাপিত

বাড়ি ফিরলেই ওরা ছুটে আসে, ভীষণ ভালবাসে আমাকে।

অনুলেখকের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে।

পাড়ার বন্ধুরা মিলে ফুটবল খেলতাম। পরে অনেক প্রদর্শনী খেলা খেলেছি। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশান অব বেঙ্গলের লাইফ মেম্বার ও আমি।

তখন বয়স এগারো হবে। পাড়ার ভজের কানাই যাত্রায় লাঙ্গল কাঁধে আমি বলরাম। আমার এক বন্ধু। নীচে কামনা'র প্রচার পত্র, তখন আমার নাম দেওয়ার রেওয়াজ হয়নি।

গৌরী, গৌতম, বেণু, সোমা এদের সবাইকে নিয়েই আমি। আমার অস্তিত্ব।

ছেলে গৌতমের আদর, বন্ধু লালুর সান্নিধ্য দুই শিবিরের দুই সভাপতি হিসেবে
আমাদের এমন ভাব, মাঝে মাঝে মন্ত্রীদের সঙ্গে পাতপেড়ে খাওয়া এ সব তো আছেই।

আমাদের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো হয় ঘটা করে, তখন কারও মধ্যে কোন ভেদাভেদ দেখিনি।

গানবাজনা ভালবাসি। এখানে শ্যামল মিত্র, রমা (সুচিত্রা), আশা এ'দের সঙ্গে বাজাচ্ছি, গাইছি আবার গান তোলাচ্ছি।

আমার জন্মদিন অথবা আমাকে ঘিরে বেণুর খুশি। মাঝে আমাদের সংগে সোমা, নীচে
সুশীল মজুমদার।

গৌতমের বিয়ে। আমার বৌমার পাশে রমা। মাঝে আমার কল্যাণ কামনায় গৌরী, নীচে বাড়ির কচি কাঁচাদের সঙ্গে আমি। কোলের মধ্যে তরুণের কন্যা ঝিমলি।

অহীন্দ্র চৌধুরী সাংবাদিক বিজয় রায়—আমার প্রিয়তম প্রসাদ সিংহ—গিরীন্দ্র সিংহ, প্রণব বসু, এ'দের সকলের কাছেই আমি কিছু না কিছু পেয়েছি।

এই তো সেদিনও শিল্পী সংসদের আলিবাবা নাটকে বাবা মুস্তাফা করেছি। নীচে, শ্যামলী নাটকে স্টারের সবার সঙ্গে আমি একেবারে পিছনে।

ওপরে স্টুডিওতে সৌমিত্র ক্ল্যাপ দিচ্ছে, পাশে দেবেশ ঘোষ, প্রণব বোস, নীচে খেলার মাঠে বন্ধু বসন্ত চৌধুরী—কমল ভট্টাচার্য। নীচে আমার মেক-আপ নেওয়া।

নায়ক জীবনের গোড়ায় দেবেশ ঘোষের সঙ্গে বন্ধুত্ব, মাঝে দেবকী বসুর ভালবাসা, তারপরই সেই খোকাদা অর্থাৎ বিভূতি লাহা আর দীপচাঁদ যাঁরা আমাকে গড়েছেন। এরপর বন্ধু পীযূষ বসু,—নীচে সলিল দত্ত। এসব ইতিহাস।

পরিচালক হয়ে বিকাশদাকে বোঝাচ্ছি আবার পরিচালক শক্তি সামন্তর দেওয়া নির্দেশ মনে মনে রেওয়াজ করছি।

খেলার মাঠে জ্যোতি বসু, দিল্লীতে রাজবাহাদুর, কোলকাতার এক অনুষ্ঠানে সিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়।

শিল্পী সংসদের পক্ষে অহীন্দ্র চৌধুরীর হাতে পুরস্কার দিচ্ছি, আনন্দ আশ্রমের পুরস্কার নিচ্ছি, আর একদিকে শ্যামল মিত্র, অন্যদিকে শক্তি সামন্ত, একেবারে শেষে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

শঙ্করপ্রসাদ ব্যানার্জী পুরস্কার দিচ্ছেন আমাকে, আমি যাত্রাজগতের প্রণম্য শিল্পী ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদকে, নীচে আবার আমি।

ওপরে ডেপুটী কনস্যুলেট, মাঝে ভরত পুরস্কার পাবার পর আই. জি উপানন্দ মুখার্জীর সঙ্গে, শেষে নন্দিনী শতপথী।

আমার পৌর সম্বর্ধনা। মেয়র গোবিন্দ দে। আমার চরিত্র বুকে নেওয়া। পাশে মানিকদা অর্থাৎ সত্যজিৎ রায়।

জগৎবল্লভপুরে আমরা যখন আলোচনায় মুখর তখন একদিকে দু'হাত নিজেই বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন নিরহংকারী-সদাহাস্যময় পরম শ্রদ্ধেয় নারায়ণ সাধুখাঁ। নীচে গৌরীর সংগে ঘরোয়া আলোচনা।

অভিনয়ে, ঘরে, পার্টীতে, বিদেশ সফরে সর্বত্র বেণু আমার সঙ্গিনী।

এই ছবিতেও তাই। পরে জহরদা—মান্না দে। মাঝে আমরা দু'জনা—নীচে আমরা ৩ জনে।

AMARBOI.COM

আমি সিনেমার হীরো-বাড়ির দাদু। ভবানীপুরে একটুকরো জোৎস্না আমার নাতনী নবমীতা। নীচে একটা তারার মত নাতনী টুলি ময়রা স্ট্রীটে আমার কোলে।

চিরনিদ্রিত কিংবদন্তীর নায়ক উত্তমকুমার। শোকাচ্ছন্ন সত্যজিৎ রায় প্রমুখ। মুক পুত্র গৌতম, কান্নায় ভেঙে পড়া জায়া গৌরী দেবী।

মিছিলে মূর্ছা গেছেন এক টেকনিসিয়ান। ওপরে শোকস্তব্ধ সুপ্রিয়া দেবীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন পি. কে. বানার্জী
নীচে মিছিলে শোকাপ্লুত জনসাধারণের মধ্যে সোমা, সুপ্রিয়া দেবী, অজয় কর।

শেষ শর্ট মাকে। ওপরে পুত্র গৌতম—নীচে কন্যা সোমা। ওদের হৃদয় জুড়ে পিতা উত্তম।

আমার চারপাশে ঘন অন্ধকার। নিকষ কালো অন্ধকার।

আমি দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে আছি একটি আলোকিত বৃত্তের মাঝখানে। পরিক্রমা করে চলেছি একটি উজ্জ্বলতম পটভূমি। আমি জানি, স্থির জানি, এই আলো, উজ্জ্বলতা কিছুই দীর্ঘস্থায়ী নয়।

সেই আলো যে কোন মুহূর্তে নিভে যেতে পারে। আমাকে নিক্ষেপ করতে পারে আরও গভীরে। গভীরতর অন্ধকারে।

অথচ আমার চারপাশের এই ঘন অন্ধকারের ওপারেই আছে বিরাট এক আলোর জগৎ। সে আলো মেকী নয়। কৃত্রিম নয়।

সেই আলোর জগৎ থেকেই তো আমার আসা। এসেছিলাম অনেক অন্ধকার পেরিয়ে। কী ভয়ঙ্কর সেই অন্ধকারের মূর্তি!

মনে পড়ছে। আস্তে আস্তে সব মনে পড়ছে। মনে পড়তেই হবে।

অতীতকে ভুলে গেলে চলবে না। বিস্মৃতির অতলে যদি আমি আমার সেই একান্ত আপনার অতীতটাকে হারিয়ে ফেলি, তা হলে যে অপরাধ করা হবে। মনে পড়ছে আমার সব।

মা আমায় গল্পচ্ছলে বলেছিলেন, তোকে নিয়ে একবার কী মুশকিলেই না পড়তে হয়েছিল আমাকে—

এই পর্যন্ত বলে মা থেমেছিলেন। আমার সামনে আমারই জন্মের সময়কার গল্প বলতে অহেতুক লজ্জা পাচ্ছিলেন আমার মা চপলা দেবী।

কৌতূহল বড় বেশী আমার।

তখন সবে আমি পৃথিবীর আলোয় এসেছি। একেবারে নবজাতক। জন্ম নেবার মাস তিনেক চারেক পরে কি করেছিলাম আমি, কি হয়েছিল আমাকে নিয়ে, সেই গল্পই মা বলতে চাইছিলেন। বলতে পারছিলেন না। শুধু হাসছিলেন। যত হাসছিলেন আমার মা, যত সময় কাটছিল, ততই আমার

ভিতরকার মানুষটা অস্থির হয়ে পড়ছিল। সংযমী হতে পারছিলাম না। আব্দার ধরলাম। আব্দারের সুরে বললাম, বল না মা, কি করেছিলাম আমি, কি হয়েছিল আমাকে নিয়ে ?

মা বলতে শুরু করলেন, তুই যখন জন্মালি তখন তুই এই গাঁট্টা-গোট্টা। কর্শা। চোখ দুটো টানা-টানা। চোখের মণিজোড়া সামান্য ট্যারা। লক্ষ্মী ট্যারা। ও সব নিয়ে আমি মোটেই ভাবিনি। তোর দাদামশায়ের কি খেয়াল হ'ল, আমাকে ডেকে বললেন, চপলা শোন, তোর ছেলের নাম রাখলুম আমি উত্তম। আমার বাবা তোর নাম রেখে খুব খুশি হলেন তা তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, নামটা কিন্তু তখন আমার মোটেই ভাল লাগেনি। মনে মনে বাবার উপর কিছুটা রেগেই গিয়েছিলাম। একটু ক্ষোভও হয়েছিল মনে। কিন্তু এ ব্যাপারে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে কি তখন কোন কথা বলার জো ছিল! বাবার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কোন কথা তো দূরের কথা, দু'দণ্ড দাঁড়াবার সাহসও ছিল না তখন আমাদের। শুধু মনে মনে ভাবতাম, বাঙালীর ছেলের আবার উত্তর কি নাম!

সম্ভবত বাংলাদেশের বাইরেই ও ধরনের নামের খুব প্রচলন। 'নরোত্তম', 'পুরুষোত্তম' নামগুলো শোনা যায় খুব। তবুও আমার বাবার দেওয়া নাম। সুতরাং মনের ক্ষোভ মনেই রেখে দিলাম।

মায়ের মুখে ছেলেবেলার গল্প শুনছিলাম আর মনে মনে দাদামশায়ের ছবি আঁকছিলাম। কল্পনার তুলিতে আঁকছিলাম ছবি। কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তুলছিলাম আমার দাদামশায়ের মেজাজ।

ভাল করে চেনবার-জানবার আগেই দাদামশাইকে হারিয়েছি।

মায়ের মুখে গল্প শুনতে শুনতে আমার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে আসছিল। দাদামশায়ের জন্য ভারাক্রান্ত।

মা থামলেন না। বলে চললেন, আমাদের বাড়ির কুলগুরুদেব—

এই পর্যন্ত বলে মা নিত্যদিনের অভ্যাসমত দু'হাত জোড় করে, চোখ বুজে গুরুদেবের উদ্দেশে প্রণাম জানালেন। আমি অবাক হয়ে মাকে দেখছিলাম। মা প্রণাম সেরে হাত নামিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। পরক্ষণে আবার সহজ হয়ে বলতে শুরু করলেন, আমাদের বাড়ির কুলগুরুদেব শ্রীপূর্ণ সন্ন্যাসী আমার সেই দুঃখ একদিন মিটিয়ে দিয়ে গেলেন। প্রত্যেক চার বছর অন্তর গুরুদেব আমাদের বাড়িতে আসতেন। মানে তোমার মামার বাড়িতে। আহিরীটোলায়। বাড়িতে তিনি অন্ন গ্রহণ করতেন না। তে-রাত্তিরও কাটাতেন না! তোর যখন তিন মাস বয়স হ'ল, তখন আর একবার গুরুদেব

এলেন। তুই তখন আমাদের বাড়ির ছাদে। তোকে তেল মাখিয়ে দোলনায় শুইয়ে রেখেছিলাম। গুরুদেব সোজা চলে এলেন ছাদে। সেই বয়সেই তোর কী কড়া ঘুম! হাঁ, একটা কথা বলতেই হবে, অন্য অনেক শিশুদের মত তুই বেশী কাঁদ্‌তিস না। প্রায় কোন সময়ই কাঁদতিস না বলা যায়।

মা গল্প বলছিলেন আর আমি আমার শিশুকালের সেই ছবিটা যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

একটা ইমেজ সৃষ্টি হচ্ছিল আমার ভেতরে। মজা পাচ্ছিলাম।

মা একটু অন্যমনস্ক হতেই বললাম, তারপর, তারপর কি হ'ল মা?

মা বলে চললেন, তারপর? আমি তখন ছাদের এককোণে কি যেন একটা কাজে ব্যস্ত। মুখ ঘোরাতেই গুরুদেবের চরণযুগল দেখলুম একেবারে আমার চোখের সামনে। প্রণাম করলাম। গুরুদেব শান্ত-নম্র স্বরে বললেন, কৈ, তোর ছেলে-কৈ? আমি দোলনা দেখিয়ে বললাম, ঐ দোলনায়। ঘুমুচ্ছে।

গুরুদেব এগিয়ে গেলেন দোলনার কাছে। অতি সন্তর্পণে তোর মাথায় হাত রাখলেন। কী আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে তোর ঘুম ভেঙে গেল। গুরুদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে তুই হেসে উঠলি। একগাল হাসি।

পরের কাহিনীটুকু বলতে গিয়ে মায়ের মুখে কেমন যেন ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম। মায়ের সর্বাঙ্গে যেন শিহরণ খেলে গেল। আমি খুব অবাক হলাম। বিস্মিত হলাম। মা বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন, গুরুদেব তোর গায়ে হাত রেখেই বলেছিলেন, মা এই হাসিতে তোর ছেলে একদিন তোদের সবাইকে ভোলাবে। গোটা বাংলা দেশকে মাতাবে। আর তোর বাবার দেওয়া নামের জন্য তোর মনে যে দুঃখ আছে তা থাকবে না। দেখিস, এই নামেই ও একদিন সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পাবে—

সেবারই গুরুদেব মামার বাড়িতে তে'রাত্তির কাটিয়ে পরের দিন চলে গেলেন।

তারপর মায়ের মুখেই শুনেছিলাম, দিন-পনের বাদে একটা মর্মান্তিক খবর বহন করে এনেছিল একটা পোস্টকার্ড। হৃষিকেশে গুরুদেব দেহ রেখেছেন।

এ সবই ১৯২৬ সালের কথা। এই সালের ৩রা সেপ্টেম্বর আমি পৃথিবীর আলোয় এসেছিলাম। জন্মের পরই যেমন সব সন্তানের রাশ নাম রাখা হয়, আমারও তেমনি রাশ নাম হয়েছিল হেরম্ব। হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়। আজ থেকে প্রায় পাঁচ যুগ আগের কথা।

AMARBOI.COM

মনে পড়েছে। এতগুলো বছর পর মনে পড়ছে সেই হারানো অতীত।

আজকের এই স্বীকৃতির সোপানে দাঁড়িয়ে আমি ভাবতে পারছি আমার ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। ভাল লাগছে। খুব ভাল লাগছে ভাবতে।

চলে এলাম। মামা-বাড়ি থেকে আমরা চলে এলাম।

এলাম এক জায়গা থেকে আর এক নতুন জায়গায়। উত্তর থেকে দক্ষিণে। ৫১নং আহিরীটোলা স্ট্রীট থেকে একেবারে ভবানীপুর। ৪৬এ, গিরিশ মুখার্জী রোডের চাটুজ্জে বাড়িতে।

এ পাড়ায় চাটুজ্জে বাড়ির সঙ্গে সবারই পরিচয়। অতি পরিচিত একটা বাড়ি। আমাদের অভিজাত বাড়ি।

আমি বড় হ'তে থাকলাম এখানে। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্ঞান বাড়তে থাকল প্রকৃতির নিয়মে। জ্ঞান হবার পর এ কথাই বুঝতে পারলাম, বংশ-মর্যাদায় আমরা যতটা অভিজাত, আর্থিক অনটনে আমরা ঠিক ততখানি মধ্যবিত্ত।

সাধারণ। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে পুতুলদি ছিল। আমি আর একজন এলাম। খুকি এসেছিল আরও ক'টা বছর আগে। খুকিদি। আমার একমাত্র বোন। বড় দিদি। আমার দিদি খুকি। পুতুলদিদি।

ডাকনাম খুকি। ভাল নাম পুতুল।

আমাদের পরিবার মধ্যবিত্ত হলেও যৌথ পরিবার। তাই প্রাচুর্য না থাকলেও অন্নকষ্ট ছিল না। সাধারণ ভাবে চলে যেত। প্রাচুর্য আর বিলাসের আকাঙ্ক্ষা অবশ্য আমাদের কারো ছিলও না।

হাসি-খুশিতে আমি আর পুতুলদি বড় হচ্ছিলাম। এমন সময় জন্মাল আমার মেজ ভাই বরুণ। তারপর ছোট ভাই তরুণ।

পরিবারে আর্থিক অনটন যেমন ছিল তেমনই রইল, তবে শিশুর হাসিতে গোটা বাড়িতে যেন চাঁদের হাট বসে গেল।

আমি তো মহাখুশি।

আমি আর পুতুলদি ভাইদের সঙ্গে মেতে থাকি। খেলা করি। হাসিতে খুশিতে ভরে থাকি। আনন্দে মেতে থাকি। এ সব ১৯৩১ সালের কথা।

দিন তো বসে থাকে না। এগিয়ে যায়। সঙ্গে বয়সও বাড়ে। আমি শৈশব থেকে কৈশোরের সোপানে এসে দাঁড়ালাম।

আমাদের বাড়ির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল।

দিনরাত টাকা টাকা করে মনটাকে ক্ষইয়ে ফেলতে রাজী ছিলেন না কেউই। বাড়ির মেয়েরাও অবস্থার সঙ্গে সমতা বজায় রেখে মানিয়ে গুছিয়ে চলতে জানত। বিশেষ করে আমার মা। খুব অল্প বয়সে মা আমার এ বাড়ির বউ হয়ে এসেছিলেন। অল্প বাড়ির মেয়ে এ বাড়ির বউ হয়ে এসেই নিজেকে সহজে মানিয়ে নিয়েছিলেন। মানিয়ে নিয়েছিলেন এমনভাবে যে সবাই বলতো বউ তো নয় যেন সাক্ষাৎ লক্ষী!

এ সব কথা জ্ঞান হবার পর পর্যন্ত শুনেছি। তাই বাবা-মার শিক্ষা থেকে আমরা কেউই নিজেদের সরিয়ে আনতে পারিনি। সে ভাবনাও আমাদের আসেনি। মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মেছিলাম বলে মনে কোন ক্ষোভ ছিল না, দুঃখ ছিল না। গর্বই ছিল। যা পেতাম তাতেই সন্তুষ্ট থাকতাম।

অর্থসংকট ছিল বটে, মেট্রো সিনেমার এক সাধারণ অপারেটর আমার বাবাকে দিনের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে প্রায় আঠারো ঘন্টা পরিশ্রম করতে হ'ত ঠিকই, কিন্তু কোথায় যেন একটা শিল্পীসুলভ মন লুকিয়ে থাকত তাঁদের। তাঁদের, মানে আমার জ্যাঠামশাইয়ের কথাও বলছি।

কাজ থেকে ফিরে এসে তাই বাবা-জ্যাঠামশাই সবাই আনন্দে-খুশিতে ঝলমল করে উঠতেন। হাসি-ঠাট্টা হত। গল্পের আসর বসত। থিয়েটারও হত। শখের থিয়েটারের একটা দলও ছিল বাড়িতে। নাম ছিল সুহৃদ সমাজ। যাত্রাগানের দল। আজকের মত এতটা থিয়েটারের প্রভাব ছিল না তখন। প্রভাব ছিল যাত্রাগানের। পাড়ার মধ্যে মাঝে মাঝে যাত্রার আসর বসত। সেই যাত্রাই একদিন ভাল লাগল আমার। কি থেকে যেন কি হয়ে গেল!

আমার কিশোর মনের ওপর যাত্রা-থিয়েটারের ছায়া এসে পড়ল।

যাত্রার রিহার্সাল দেখার একটা ঝোঁক চেপে গেল আমার। কোথাও থেকে যাত্রা-থিয়েটারের খবর এলে আমি অস্থির হয়ে পড়তাম। যতক্ষণ না আমি পালিয়ে সেই যাত্রা দেখতে যেতাম ততক্ষণ আমার অস্থিরতা থামত না।

একদিকে মা আর বাবার কঠিন শাসনের বেড়াজাল, অন্যদিকে আমাকে পাহারা দেবার মত দিদির একটা কঠিন অভিব্যক্তি কোনমতেই এড়িয়ে যাত্রার ক্লাবে যাবার উপায় নেই।

কিন্তু জ্যাঠামশাই আমার সেই আকাঙ্ক্ষার কথা যেন সহজেই অনুমান করতে পারলেন। আমি তখন রীতিমত চোরের মত পালিয়ে যেতে আরম্ভ

করেছি রিহার্সাল দেখতে। সুহৃদ সমাজের যাত্রার রিহার্সাল। প্রথম প্রথম ক্লাবের ঘরে ঢুকতে পারতাম না। সাহস পেতাম না। ভয়, ঘরে ঢুকলে যদি কেউ বের করে দেয়!

সন্ধ্যের অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে বইখাতা নিয়ে পড়তে বসবার কথা, সেখানে পালিয়ে রিহার্সাল দেখতে যাওয়া যে কতখানি অপরাধ তা যে বুঝতাম না তা নিশ্চয়ই না, অথচ সন্ধ্যের আলো জ্বললেই মনটা গিয়ে পড়ত ক্লাবে। তারপর এদিকে ওদিকে দৃষ্টি ফেলে দেখতাম আশেপাশে কেউ আছে কিনা, কেউ আমাকে দেখছে কি না। না। যদি দেখতাম কেউ নেই, মনকে শক্ত করে, পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসতাম বাড়ি থেকে। চলে আসতাম সোজা ক্লাব ঘরের জানলার ধারে।

একটা সান্ত্বনা ছিল।

সান্ত্বনা ছিল ধরা পড়লে বকুনি শুনতে হবে। সে তো সামান্য বকুনি মাত্র।

মারধোর তো আর খেতে হবে না! কারণ, তখন অন্য ছেলেরা অন্যায় করলে তাদের বাপ-মায়েরা যেমন গায়ে হাত তোলেন, আমার মা কিংবা বাবা কেউই তেমনি করে আমার গায়ে হাত তুলতেন না।

গায়ে হাত তুলতেন না বলেই বাবাকে ঘিরে একটা প্রচণ্ড ভয় আমার মনের ভিতর সব সময় জেঁকে বসে থাকত। বাবাকে কখনো রাগতে দেখিনি আমরা। মাঝে মধ্যে যদি তাঁর মুখখানা গম্ভীর দেখতাম, তখন চোখ তুলে বাবার দিকে তাকাবার সাহস পেতাম না। বাবার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই বোধ করি তাঁকে আমরা সবাই ভয় করতে শিখেছিলাম যেমন, শ্রদ্ধাও করতাম তার দ্বিগুণ।

তবুও রিহার্সাল যেন বার বার আমাকে হাতছানি দিয়ে ঘর থেকে বার করে নিয়ে যেত। সুহৃদ সমাজের জানলা অথবা দরজা ফাঁক করে উঁকি মেরে যাত্রার রিহার্সাল দেখা ছাড়া আমার আর অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। ওখানে দাঁড়িয়ে ওদের থিয়েটার করার ভঙ্গি যত দেখতাম ততই আকৃষ্ট হতাম। একাত্ম হয়ে যেতাম থিয়েটারের সঙ্গে।

বাড়ি ফিরে এসে আপন মনে থিয়েটার করতাম। ক্লাবের বাইরে দাঁড়িয়ে কান পেতে ওদের যে সংলাপ শুনতাম সেই সংলাপ আমি মনে মনে বিড় বিড় করে মুখস্থ করতাম। ঘরের ভেতরে একলা আপনমনে সেই সংলাপ ঠিক তেমনি করে উচ্চারণ করতাম।

ধরা পড়ে গেলাম একদিন।

'চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা', কথাটা আমার ক্ষেত্রে মোটেই

খাটল না। দিদির কাছে একদিন ধরা পড়ে গেলাম।

দিদি জিজ্ঞাসা করল, রোজ কোথায় যাস রে?

যদি সত্যি বলি সেই মুহূর্তে দিদি আমার পক্ষে দাঁড়াবে কিনা বোঝা যাচ্ছিল না। সে যদি বাবা কিংবা মাকে বলে দেয় সেই ভয়ে বললাম, সে একটা ভারী মজার জায়গায় যাই—

দিদি চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, হুঁ, আমি সব জানি।

রাগের অভিব্যক্তিতে মিথ্যেকে তবুও আমি সত্যি করার চেষ্টা করলাম। দিদিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, জিভ ভেংচিয়ে বললাম, এই কলা জানিস!

এবার দিদি সত্যিকার রেগে গেল। মুখটা আষাঢ়ে মেঘের মত গম্ভীর করে বলল, তুই রোজ জ্যাঠামশাইদের ক্লাবে যাস—

আমি পাল্টা জবাব দিলাম, যাই তো বেশ করি, তোর কি! কথাটা রাগের সুরেই বলে নিজেরই খারাপ লাগতে লাগল। দিদি মুখ কাঁচুমাচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এমন ভাবে চলে গেল মনে হ'ল সে আমার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আমি নিজেকে সহজ করে নিলাম। নিতান্ত অপরাধীর মত এগিয়ে গেলাম। সোজা গেলাম দিদির কাছে। বললাম, দিদি রাগ করলি, আর কখনও তোর মুখে মুখে তর্ক করব না—

দিদি একটু খুশি হ'ল। আবার আগের মতই হাসতে হাসতে সহজ করে জিজ্ঞাসা করল, ওখানে যাস কেন রে?

উত্তর দিলাম, যাত্রা শিখতে—

মনে আছে। বেশ মনে আছে, দিদিকে দলে টানবার জন্যে তাকে আব্দারের সুরে বলেছিলাম, আমি ওদের মত থিয়েটার করব দিদি, তুই বাবা-মাকে বলবি না তো?

পুতুলদি কথাটা তক্ষুণি মেনে নিল। হাসতে হাসতে বলল, আচ্ছা বলবো না।

দিদির কথাতে আমার উৎসাহ যেন দ্বিগুণ বাড়ল। খুশিতে আমি যেন আটখানা হয়ে গেলাম। উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে দিদিকে বললাম, দেখবি আমি কেমন থিয়েটার শিখেছি? বলেই অভিনয় শুরু করে দিলাম। আমি অঙ্গভঙ্গি যতটা না করি তার চাইতে সংলাপ বলি ভাল। এ সব আমার স্পষ্ট মনে আছে।

দিদি দেখছিল। দেখতে দেখতে হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল। দিদির এই হাসি অহেতুক বলে মনে হ'ল আমার। মেজাজটা সেই মুহূর্তে আবার গরম হয়ে গেল। আবার উত্তেজিত হলাম। দিদির হাসির কিছু

তারতম্য হ'ল না।' বলল, ধুত্! তোর হচ্ছেই না, যাত্রা কি কেউ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে করে বুঝি? যাত্রা করতে হয় ঘুরে ঘুরে—বুঝলি হাঁদারাম?

দিদি বারকতক জ্যাঠামশাইদের যাত্রা দেখেছিল। কাজেই দিদির কথাটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলল। সে যে মিথ্যে বলছে না তা মনে হ'ল।

আবার নিজেকে সহজ করলাম! একেবারে ভালমানুষের মত নিজেকে সংযত করে দিদির কথা মেনে নিলাম।

এর দিনকতক পর আবার ধরা পড়ে গেলাম।

ধরা পড়ে গেলাম স্বজন সমাজের বাইরে। এবার একেবারে জ্যাঠামশাইয়ের চোখে ধরা পড়লাম। ধরা পড়ে ভীষণ ভয় করছিল। ভয় করছিল যদি জ্যাঠামশাই আমাকে তিরস্কার করেন! কিন্তু হ'ল ঠিক তার উল্টো। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে সস্নেহে বললেন, কি রে, বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, থিয়েটার শিখতে চাস বুঝি?

জ্যাঠামশাই যে কথাটা অত সহজ করে বলবেন তা বুঝতে পারিনি। মাথা চুলকোতে থাকলাম। তারপর চট করে বলেই ফেললাম, হ্যাঁ—

আয় আয়, বলে তিনি আমাকে ভিতরে যাবার অনুমতি দিলেন।

জ্যাঠামশাইকে আমি জানতাম। ভাল করে জানতাম কেমন মানুষ তিনি। সাদা মন তাঁর। নিতান্ত পরিষ্কার মনের মানুষ। কারও মধ্যে সংস্কৃতি-বোধ আছে জানতে পারলেই তিনি তাকে ভালবাসতেন। উৎসাহ দিতেন। অত্যন্ত আমুদে মানুষ ছিলেন আমার জ্যাঠামশাই। তিনি বলতেন, দুঃখ-কষ্ট তো আছেই, যতক্ষণ আমোদ-আহ্লাদে থাকা যায় ততই ভাল।

জ্যাঠামশাইয়ের কাছ থেকে ক্লাব ঘরে ঢোকার অনুমতি পেয়ে সেদিন একরাশ আনন্দে ভরে গিয়েছিলাম। খুশিতে টলমল করে উঠেছিলাম।

কথাটা গিয়ে বললাম দিদিকে। আমার আশা পূর্ণ হয়েছে জেনে দিদিও খুশি হ'ল। সে যেন আমার যাত্রা-শেখার মধ্যে একটা আনন্দ খুঁজে পেল। চোখ পাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলল, তুই যাত্রা করবি, বেশ মজা হবে, না রে?

সেদিন আমরা দুজনে মহাখুশি।

একটার পর একটা দিন কাটছিল।

আমিও বাবা-মায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে যাত্রার ক্লাবে যাচ্ছিলাম নিয়মিত।

ঈশ্বরের খেয়াল বোঝা ভার। তিনি আমাদের যেমন চালান আমরা

তেমনি চলি। তাঁর বিধান এড়িয়ে চলবার ক্ষমতা কোথায় পাব!

মৃত্যু মহান। মৃত্যু সুন্দর। আবার সেই মৃত্যুকে বড় ভয়ঙ্কর বলতে ইচ্ছে করে। অবচেতন মনে হয়তো বলিও। অকালমৃত্যুকে ভয়ঙ্কর ছাড়া আর কি বলবো?

সেই কৈশোরেই মৃত্যুর এক ভয়ঙ্কর রূপ আমি দেখেছিলাম। সেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ছবি আমি আজও মাঝে মাঝেই স্পষ্ট দেখতে পাই। পুতুলদির আকস্মিক হারিয়ে যাওয়া আমার অন্তরের অন্তস্থলে একটা দগদগে ক্ষত রেখে গিয়েছে। একটা যন্ত্রণা! দিদিকে অকালে হারাবার যন্ত্রণা আজও মাঝে মাঝে আমাকে কাতর করে তোলে। একদিন ঘরে ফিরে এসে স্বাভাবিক স্বরে দিদিকে ডাকলাম, দিদি—দিদি—এই পুতুলদি—

অন্য দিনের মত দিদি ডাক শুনলে না। চট করে ছুটে এল না সে। ভাবলাম দিদি হয়তো বাড়িতে নেই। বেড়াতে গিয়েছে বোধহয় কারও সঙ্গে। ভীষণ রাগ হ'ল। অভিমানী হয়ে উঠল মনটা। প্রতিজ্ঞা করলাম দিদি ফিরে আসার আগেই ঘুমিয়ে পড়ব। ডাকলেও কথা বলব না।

দেখলাম মা নীচে আসছেন। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হলাম। ভয়ও পেলাম। গম্ভীর মুখ।

এগিয়ে গেলাম মায়ের কাছে। আঁচলটা ধরে বললাম, দিদি কোথায় মা? কণ্ঠস্বর উঁচু করে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

মা একটা আঙুলে ঠোঁট চাপা দিয়ে ইশারায় বললেন, চুপ কর। তোমার দিদি ওঘরে শুয়ে আছে, জ্বর। টাইফয়েড।

আমার বুকের ভিতরটা সেই মুহূর্তে কেঁপে উঠল। আস্তে আস্তে দিদির ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। নিথর নিস্তব্ধ গোটা বাড়িটা। সবাই কেমন যেন ভারাক্রান্ত। ডাক্তারবাবু মুখ গম্ভীর করে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মনটা তখন অস্থির। দিদির কথাই তখন ভাবছিলাম। দিদি শুয়ে আছে, আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম। একদিনের জ্বরেই ক্ষীণ হয়ে গেছে পুতুলদি। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। নিস্তেজ দৃষ্টি। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখটা। ফর্সা শরীরটা ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে গেছে। যেন কত রক্তশূন্য। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দিদিকে দেখছিলাম। দেখছিলাম আর আমার কান্না পাচ্ছিল। ভাবছিলাম ওর কাছে যাই। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, এমন হ'ল কেন রে তোর?

দিদি আমাকে দুর্বল একখানা হাত তুলে ডাকল। কাছে গেলাম। দিদি আস্তে আস্তে বলল, কাউকে বলিনি তুই যাত্রা শিখছিস। যাত্রা শেষ, বেশ

মজা হবে। আমি ভাল হয়ে উঠলে কেমন শিখলি দেখাবি, কেমন?

আমার বুকের মধ্যে হু-হু করে উঠল! আমি ওর ঘরের বাইরে এসে বসলাম। একরাশ ভাবনার মধ্যে ডুবে গেলাম। পুতুলদির জ্বর নিয়ে ভাবনা। পুতুলদি ভাল হয়ে উঠবে বলছে, কথাটা মনে পড়তে একটু সতেজ হলাম।

কিন্তু দিদি ভাল হ'ল না। সে চলে গেল। মানুষ মরে গেলে কোথায় যায় জানতাম। স্বর্গে যায়। স্বর্গে গিয়ে নারায়ণের ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়ায়। ফুল তোলে। আবার যখন ইচ্ছে হয় ফিরে আসে। আমার দিদি কিন্তু ফিরে এল না।

মায়ের সে কি কান্না। মা কাঁদছিলেন। বাবার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

সবাই কাঁদছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য, ওঁদের কিছুতেই বোঝাতে পারছিলাম না সেদিন, দিদি নারায়ণের ফুলের বাগানে ফুল তুলতে গেছে! আবার ফিরে আসবে। বোঝাতে না পেরে আমিও কেঁদে ফেলেছিলাম।

আজও মাঝে মাঝে দিদির জন্য আমার মনটা কাঁদে।

অবসর সময়ে আকাশের দিকে তাকাই। ঐ মুক্ত নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে দিদিকে দেখবার চেষ্টা করি। কতবার ভেবেছি ঐ তারার মধ্যে দিদির মুখটা বুঝি উঁকি দিচ্ছে। আর মাঝে মাঝে যেন শুনতে পাই পুতুলদি যেন বলছে, তুই এখনও খাসনি, আমি যাব কেন রে?

আরও শুনতে পাই পুতুলদি যেন বলছে, যাত্রা শেষ, বেশ মজা হবে!

আমি আজও মজা করছি। ভাবছি, কই দিদি তো সেই মজার অংশীদার হতে এল না!

ক'টা দিন চুপচাপ। যাত্রা শিখতে যেতে ইচ্ছে করত না। রাতে ঘুম আসত'না। কেমন যেন শিথিল হয়ে পড়েছিলাম।

এমনি করে আরও ক'টা দিন কাটল। তারপর আবার পালিয়ে সুহৃদ সমাজে যেতে লাগলাম। আমাকে পাহারা দেবার মত তখন আর কেউ নেই।

একদিন মা বুঝতে পারলেন আমি লেখাপড়ায় মন বসাতে পারছি না। বইয়ে মন বসাতে মা আমার অনেক চেষ্টা করলেন।

বই খাতা নিয়ে বসতাম। কিন্তু যখনই পড়তে বসতাম তখনই চোখের সামনে যেন ভেসে উঠত থিয়েটারের চরিত্রগুলি। রাজা-রাণী-মন্ত্রী!

অবচেতন মনে খাতার পাতায় রাজার ছবি আঁকতাম। মা যেন আমাকে নিয়ে বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। একদিন দেখলাম মা বাবাকে কি যেন বলছেন চুপি চুপি।

ব্যস্ত মানুষ আমার বাবা। সকাল থেকে শুধু ঘুরতেন অর্থ চিন্তায়। ক্লান্ত

অবসন্ন হয়ে বাড়ি ফিরতেন অনেক রাতে। সেদিনও ঠিক তেমনি করেই বাড়ি ফিরলেন। ঘরে ফিরেই আমাকে ডাকলেন, শোনো, তোমার দিকে দৃষ্টি দিতে পারি না বলে ভেবো না তুমি অভিভাবক-শূন্য। লেখাপড়া ভাল করে করছ না শুনছি। যাত্রা-থিয়েটার করো মানা করি না, তা বলে লেখাপড়া নিয়মিত না করলে আমি তোমাকে ভীষণ বকব।

পরদিন থেকেই আমি আটকে গেলাম। কঠিন শাসনের শৃঙ্খলে আমাকে আটকানো হ'ল। আমার বাবা সাতকড়িবাবুই আমাকে আটকালেন।

মা আমাকে বেশ সকালেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে বললেন।

আগের দিন রাতেই একটু একটু কানাঘুষো শুনতে পাচ্ছিলাম। কথাটা যে নেহাৎ খারাপ লাগছিল তা নয়। স্কুলে যাব। বই-খাতা নিয়ে স্কুলে যাব ভাবতেও ভাল লাগছিল। যথারীতি খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রস্তুত হলাম। বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম পথে। বেরুবার সময়ে দু'হাত জোড় করে বাবার অনুকরণে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করলাম।

পথ চলতে চলতে বাবা একটাও কথা বলছিলেন না। আমি বাবার হাত ধরে মহাখুশিতে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। বাবা হঠাৎ মুখ খুললেন। বললেন, মন দিয়ে লেখাপড়া করবি, মাথা থেকে ঐ থিয়েটারের ভূত নামিয়ে ভাল করে পড়াশোনা করবি। বড় হবার পর যা খুশি তাই করিস, বারণ করব না—

ভালমানুষের মত মাথা কাত করে সম্মতি জানালাম। বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন চক্রবেড়িয়া।

আমাদের ভবানীপুরের বাড়ি থেকে খুব বেশী দূরে নয় চক্রবেড়িয়া স্কুল।

যথাসময়ে আমি স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম।

পরদিন থেকে স্কুলে যাবার ব্যাপারটা আমাকে আর একটা নতুন আনন্দ এনে দিল। যথারীতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আমি পিঠে বইয়ের ব্যাগ চাপিয়ে স্কুলে যেতে শুরু করে দিলাম।

কিন্তু মাত্র ক'টা দিন। তারপর আবার আমার মন গিয়ে পড়ল যাত্রায়। অবশ্য লেখাপড়া চালানোর মধ্যেই ওই যাত্রার নেশায় আমি ভরপুর।

মা-বাবা ভাবলেন আমাকে ভর্তি করে দিয়ে স্বস্তি পেয়েছেন। এদিকে আমি কিন্তু ঐ নেশাটা কাটিয়ে উঠতে পারছি না। লেখাপড়ার চাইতে থিয়েটার আর যাত্রার প্রতি ঝোঁক তখন আমার বেশী।

বই নিয়েও আমি নিয়মিত বসতাম। এ কথা সত্যি, যতটুকু পড়তাম তাতে কোন ফাঁকি ছিল না।

Acc. No. 1594

কোন ব্যাপারে ফাঁকি জিনিসটাকে আমি সেই বয়স থেকেই ঘৃণা করতাম। বই নিয়ে বসলেও আমি খাওয়া-দাওয়া ভুলতাম। আবার যাত্রার রিহার্সাল দেখতে গেলেও বাড়ি ফেরার কথা ভুলে যেতাম। একদিকে লেখাপড়া অন্যদিকে সুহৃদ সমাজের যাত্রার রিহার্সালে যাওয়া তখন সমানে চলছে।

তখন আমাদের পাড়াটা এতটা জাঁকজমক ছিল না।

কয়েকটা বাড়ি নিয়ে একটা অভিজাত পাড়া। গিরিশ মুখার্জী রোড।

ওদিকে মুখার্জী বাড়ি, এদিকে ঘোষ বাড়ি, মাঝখানে আমাদের চাটুজ্জে বাড়ি। আমাদের বাড়ির ডানদিকে একটু দূরে লেডিজ পার্ক। এই সব নিয়ে আমাদের তখনকার পাড়া। আর ছিল এখানে ওখানে ইতস্ততঃ ছড়ানো ঘন ঝোপঝাড়। পরিত্যক্ত জলাভূমি। দু'একটা মাঠ।

লেডিজ পার্ক যাকে বলছি তখন সেটা ছিল একটা ফাঁকা মাঠ। আমাদের বাড়ির সামনেও তখন একটা মাঠ ছিল, এখন অবশ্য সেখানে বাড়ি হয়ে গেছে অনেক। ৩৮নং গিরিশ মুখার্জী রোড। সেই মাঠেও সুহৃদ সমাজের অনেক নাটক হয়েছে একদিন। হিন্দুর বারো মাসে তেরো পার্বণ। নানা উৎসব। সেই সব উৎসবেও নাটক হত।

আসলে আমাদের বাড়ির এবং পাড়ার অনেকেই ছিলেন ভীষণ নাটুকে পাগলা। সুতরাং নাটকের প্রতি লোভ বা ঝোঁক কোনটাকে কিছুতেই এড়াতে পারতুম না।

একটু বড় হয়ে সমবয়সী পাড়ার কতকগুলি বন্ধু নিয়ে আমরাও মাঝে-মধ্যে নাটক করতাম।

এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে শাড়ি, বিছানার চাদর ইত্যাদি জোগাড় করে সেফ্‌টিপিন্ দিয়ে ঝুলিয়ে উইংস, স্ক্রীন তৈরি করে নাটক করতাম। কাগজ দিয়ে মুকুট হ'ত। রাংতা দিয়ে তলোয়ার। আর পাউডার দিয়ে মেকআপ করতাম।

কিছুদিনের মধ্যেই আমি আর আমার কয়েকজন বন্ধু, বিশেষ করে দিলীপ মুখার্জী (মুখার্জী বাড়ির ছেলে) একত্রিত হয়ে সেই বিছানার চাদরের মঞ্চের সংস্কার করলাম।

কয়েকজনের সামনে সেবারই প্রকাশ্যে থিয়েটার করলাম আমরা। নাটক ছিল কবিগুরুর 'মুকুট'। পাড়ায় ছোট্ট মঞ্চ তৈরি করে অভিনয় করেছিলাম।

প্রকাশ্যে 'মুকুট' নিয়েই আমার হাতেখড়ি।

যে ক্লাবের মাধ্যমে আমরা 'মুকুট' আসরস্থ করেছিলাম তার নাম দিয়েছিলাম 'লুনার ক্লাব'।

এর রকে-তার রকে, এ-বাড়ি ও-বাড়ির ছাদে নাটকের রিহার্সাল দিতাম আমরা। আমাদের তখন একটা ঘরও ছিল না। একটা ঘরের জন্য আমরা তখন মরিয়া। এমন সময় মুখার্জী বাড়ির গিন্নী অর্থাৎ দিলীপের মা, আমাদের মাসিমা, একদিন আমাদের সস্নেহে কাছে ডাকলেন। তারপর তাঁরই বাড়িতে তিনি একটা জায়গা করে দিলেন ক্লাবের জন্য। তখন থেকে আমরা রিহার্সাল দিতে শুরু করেছিলাম সেখানে :

থাক সে সব কথা।

দিনগুলো কাটছিল বেশ।

স্কুলেও সবার কাছে আমি ইতিমধ্যে অনেকটা পরিচিত হয়ে পড়েছি।

কয়েকজন মাস্টারমশাই আমাকে খুব ভালবাসতেন। কেন ভালবাসতেন জানি না। কেউ কাউকে অহেতুক ভালবাসতে জানে না।

আমি অন্য অনেক ছেলের মত স্কুলে গিয়ে কারও সঙ্গে কোন মনোমালিন্য করতাম না। নিজেকে একটু স্বতন্ত্র রাখবার চেষ্টা করতাম।

একদিন স্কুলে গিয়ে শুনতে পেলাম, বার্ষিক উৎসব হবে আমাদের স্কুলে।

সেই মুহূর্তে আমার মনে আনন্দের দোলা লাগল।

গোটা স্কুলে, প্রতি ক্লাশে আসন্ন উৎসব নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। উৎসবে কি কি অনুষ্ঠান হবে তাই নিয়ে আলোচনা। কানে এল নাটক হবে।

নাটকে অভিনয় করবে ওপরের ক্লাশের ছাত্ররা। সবাই আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। নাটকের কথা শুনেই আমি আনন্দে মেতে উঠলাম, কিন্তু যখন শুনলাম আমাদের সুযোগ নেই তখন আমি ভীষণ মুষড়ে পড়লাম।

একটা অস্বস্তি আমাকে ভর করলো। আমার কোন কিছুই আর ভাল লাগতো না। বই নিয়ে বসতাম কিন্তু পড়ায় মন বসতো না। খুব আশা ছিল নাটকে নিশ্চয়ই আমাদের চান্স দেওয়া হবে। হ'ল না। আশাহত হলাম। বড়দের ওপর রাগ হ'ল মনে মনে।

মনে হ'ল সব ক্লাশ থেকে দু'একজনকে নিয়েও তো নাটক করা যেত!

পরদিন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে স্কুলে গেলাম। স্কুলে ঢুকেই দেখলাম ব্ল্যাক

বোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা আছে 'গয়াসুর' নাটক হবে স্থির হয়েছে।

মনটা সেই মুহূর্তে আরও খারাপ হয়ে গেল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ক্লাশে গিয়ে বসলাম। ক্লাশে গিয়ে শুনলাম ছোট গয়াসুরের ভূমিকা নিয়ে ভীষণ বিপদে পড়েছেন নাটকের কর্মকর্তারা।

কে করবে? কাউকে দিয়েই তো চলছে না।

একটি ছেলেকে এইমাত্র ট্রায়াল দেওয়া হয়েছে, সেও কৃতকার্য হতে পারল না। তা হলে উপায়?

আমাকে তবু ওঁরা ডাকছেন না। অস্বস্তি আমার ক্রমশঃ বেড়ে চলল। তবু সাহস করে 'আমি পারব স্যার' কথাটা বলতে পারছি না। বইয়ের পাতায় চোখ রেখে বসে আছি। এমন সময় স্বয়ং হেডমাস্টার মশাই!

হেডমাস্টার মশাই সরাসরি আমাদের ক্লাশে এলেন। উঠে দাঁড়ালাম! সবাই ভাবছি পড়ার ব্যাপারে কিছু হয়তো বলতে চান। আমরা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলাম। রাসভারী স্বরে বললেন, তোমরা বোসো—

আমরা সবাই একসঙ্গে বসলাম। বাঁকা চোখে দেখলাম হেডমাস্টার মশাই আমারই দিকে এগিয়ে আসছেন। আমার কাছে এসে বেশ শান্ত স্বরে তিনি বললেন, কি করছ?

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, পড়ছি স্যার—

বেশ! কথাটা উচ্চারণ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। গোটা ক্লাশটার উপরে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, তোমাদের ক্লাশে কি এমন কেউ আছ যে ঐ ছোট গয়াসুর-এর রোলটা ভাল করতে পারো?

হেডমাস্টার মশাইয়ের কথাটা আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ করে তুলল। সবাই চুপচাপ। গোটা ক্লাশটা মুহূর্তে যেন বোবা হয়ে গেছে। নিস্তব্ধ। একটা পিন পড়লে শব্দ শোনা যাবে, ঠিক এমনি ধরনের নিস্তব্ধতা। আমার বুকের মধ্যে দপ দপ করছিল। আর নিজেকে সংযত করতে পারলাম না।

উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, আমি পারব স্যার—

হেডমাস্টার মশাই যেন খুশি হলেন। ছুটির পর আমাকে দেখা করতে বলে আমার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ক্লাশ থেকে।

তারপর থেকে আর আমি পড়ায় মন বসাতে পারলাম না।

কখন ছুটি হবে। কানটা শুধু পড়ে রইল দপ্তরীর ঘন্টার উপরে।

ছুটি হ'ল। যথাসময়ে হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে গেলাম। আমার ক্লাশের বন্ধুরা অনেকেই কৌতূহল নিয়ে ছুটির পরেও থেকে গেল।

আমি কেমন পাঠ করি তাই দেখবার কৌতূহল। ট্রায়াল দেওয়া হ'ল।

আমি প্রথমবারেই উৎরে গেলাম। বড়দের আর মাস্টারমশাইদের কাছে আমি সেই মুহূর্ত থেকে অসম্ভব রকমের প্রিয়পাত্র হয়ে গেলাম।

খবরটা বাড়িতে দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। কতক্ষণে বাড়িতে গিয়ে খবরটা দেব সেই ভাবনা তখন। বাড়িতে গিয়ে সব বললাম। সবাই শুনলেন। কিন্তু খুব একটা খুশি হতে দেখলাম না কাউকে।

যথারীতি থিয়েটারের দিন এল। আমার তো বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে! এই প্রথম সাধারণ দর্শক আর বাড়ির অভিভাবকদের সামনে অভিনয় করতে আসা। কারা যেন আমাকে মেক-আপ নিতে ডাকলেন।

মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে গেলাম মেক-আপ নিতে। মাঝে মাঝে একটু দুর্বল হয়ে যে পড়ছিলাম না তা নয়। উইংসের পাশ দিয়ে অডিটোরিয়ামে দৃষ্টি ফেললাম। অগণিত দর্শকমণ্ডলী। আলো-ঝলমলে আসর। চারদিকে কোলাহল। মাঝে মাঝে ভয় পাচ্ছি। আবার শক্ত করছি মনটা।

থিয়েটার শুরু হ'ল। আমি ছোট গয়াসুরের ভূমিকায় অভিনয় করলাম। অভিনয় শেষে সবাই ভিতরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। ভাল অভিনয় করেছি বলে সবাই আন্তরিক ভালবাসলেন।

ছুটো মেডেল দিলেন মাস্টারমশাইরা। প্রথম অভিনয় রজনীতে আমি পুরস্কৃত হলাম। আনন্দে ভরে গেল আমার ভেতরটা।

মেক-আপ তোলার অবকাশ আমার নেই। মেডেল ছুটো হাতে নিয়ে ছুটলাম বাড়ির দিকে। বাড়িতে এসে মাকে প্রণাম করলাম। বললাম, মা এই ছাখ, থিয়েটার করে আমি মেডেল পেয়েছি। কথাটা সবারই কানে গিয়েছিল। আমার জয়ে খুশি হয়েছিলেন সেদিন জ্যাঠামশাই বাবা সবাই।

সেই থিয়েটারের কথা মনে পড়লে এখনও আমার হাসি পায়। বড় গয়াসুরের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন তাঁর নামটা ঠিক মনে করতে পারছিনে। তাঁর লাফালাফিতে বাঁশের কয়েকটা খুঁটির ওপরে বাঁধা স্টেজ ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। সেই ভাঙা স্টেজ আবার মেরামত করেই অভিনয় হয়েছিল সেদিন।

চক্রবেড়িয়া স্কুলে ক্লাশ সেভেন পর্যন্ত পড়ে আবার স্কুল পাল্টাবার পালা। এই স্কুলে তখন এই পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা। ১৯৪০ সালে বাবা আমাকে ভর্তি করে দিলেন সাউথ সুবার্বন হাইস্কুলে। ক্লাশ এইটে ভর্তি হলাম। এই স্কুল খুব নামী

এবং অভিজাত স্কুল। একদিন এখান থেকেই পাশ করে বেরিয়েছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ আরও অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি। এই স্কুলে আমার সঙ্গে লালুও পড়ত। লালু অর্থাৎ ডাক্তার লালমোহন মুখার্জী। এখানে পড়ছি আর খেলাধুলো সমানে চালিয়ে যাচ্ছি। সেই সংগে মাঝে মাঝে আমি কবিতা লিখতাম, ছোট গল্পও লিখেছিলাম দু' একটা, ছবিও আঁকতাম। ছবি আঁকাটা আমার হবি ছিল একদিন। একদিন যা করতাম আজ তার কিছুই করতে পারি না সেটা আমার কম দুঃখ নয়। যা হোক, আমার দু'একটা লেখা বোধহয় আমাদের ক্লাবের ম্যাগাজিনেও ছাপা হয়েছিল।

আমরা যখন চক্রবেড়িয়াতে পড়ি তখন আমাদের বাবা-জ্যাঠামশাইদের যেমন সুহৃদ সমাজ নামে ক্লাব ছিল, আমাদেরও তেমনি একটা ক্লাব তৈরি হয়েছিল, তার নাম লুনার ক্লাব। আমাদের এই ক্লাব পরবর্তীকালে দক্ষিণ কলকাতার মধ্যে একটা সেরা ক্লাবে পরিণত হয়েছিল। বোধহয় ১৯৩৮ সালে হবে আমাদের ক্লাব থেকে ম্যাগাজিন বেরুল একটা। হাতে লেখা ম্যাগাজিন, তার নাম ছিল লুনার। সেই '৩৮ থেকে '৪২ সাল পর্যন্ত আমাদের সেই ম্যাগাজিন ছিল। '৪২-এর আন্দোলনের সময় সব ভেঙ্গে যায়। লাইব্রেরী তছনছ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে একটু বিস্তারিত বলা দরকার!

আমাদের সব গঠনমূলক কাজে তখন ভুনতিদা ছিলেন পথপ্রদর্শক। এই ভুনতিদার উৎসাহে বলা যেতে পারে আমরা সবাই যা কিছু ভাল কাজ ছিল তা করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হতাম। তিনি আমাদের ভাল কাজে মদত দিতেন। ভুনতিদার আসল নাম কিরণময় চ্যাটার্জী। তা ছাড়া লচুদা অর্থাৎ ডাঃ দিলীপকুমার মুখার্জী বেশীর ভাগ গাইড দিতেন আমাদের। ক্লাব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতেন তারকনাথ চ্যাটার্জী, গোলকনাথ চ্যাটার্জী। এঁরা আমার দাদা! ভুনতিদা ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য ছিলেন। তাঁকে পুলিশ মাঝে মাঝে ধরবার জন্য মরিয়া হয়ে যেত। আমাদের ক্লাব-লাইব্রেরী তছনছ করে যেত। শেষ পর্যন্ত '৪২ আন্দোলনে তিনি গ্রেফতার হলেন, ফলে আমাদের পত্রিকাও বন্ধ হয়ে গেল।

যা হোক সেই '৩৮ সালে আমরা পড়ছি, ক্লাবের খেলাধুলা-ম্যাগাজিন নিয়ে আছি তার মধ্যে আবার ভর্তি হলাম ভবানীপুর সুইমিং এ্যাসোসিয়েশনে। তখন লালু, আমি আরও বন্ধুরা রোজ পদ্মপুকুরে গিয়ে সাঁতার শিখতাম। ঐ '৪২ সালেই ভবানীপুর সুইমিং ক্লাব বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হবার কারণ, যুদ্ধের সময়ে পদ্মপুকুর ওয়াটার ট্যাঙ্ক হয়ে যায়। সেই জল কাউকে ব্যবহার করতে

দেওয়া হতো না। পুলিশ মোতায়েন ছিল। এই ক'বছরে আমি ১০০ ইয়ার্ড-এ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলাম। শুধু আমাদের এখানে নয়—আমাদের সুইমিং ক্লাবের হয়ে যখন বাইরে যেতাম তখনও ট্রফি এনেছি! আমি যখন জল থেকে উঠে আসতাম তখন নাকি আমাকে জনি ওয়াশিমুলারের মত দেখাত। বুক থেকে কোমর পর্যন্ত এমনকি আমার জলে ভেজা মুখটাও নাকি তাঁর মত ছিল, সবাই বলত! আমি অবশ্য নিজেও সেই কিংবদন্তী সাঁতারুর অনুরাগী ছিলাম।

সেই সাঁতারের সংগে আবার কুস্তি। এ সব শুনলে হয়তো অনেকেরই বিশ্বাস হবে না! তা না হবারই কথা, কারণ ইদানীংকালের ছেলেরা দশ-এগার বছর বয়সে এক সংগে এতগুলো কাজ করতে পারে না—তাদের স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র মমত্ববোধ নেই। আমাদের ছিল। আমাদের মানসিক গঠনও তেমনি ছিল, যেমন ছিল আমাদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া। আমি ইন্দিরা সিনেমার পিছনে যে বিখ্যাত ননীবাবুর আখড়া ছিল সেখানে গিয়ে নিয়মিত কুস্তি শিখতাম। ননী ঘোষ ছিলেন বিখ্যাত কুস্তিগীর। লালুদের এই কুস্তি ভাল লাগত না। আমি কিন্তু কুস্তিকে ভাল বাসতাম। রোজ ভোরে উঠে আখড়ায় চলে যেতাম, কুস্তি শেখার পর ভোম্বলদার কাছে লাঠি খেলা শিখতাম। ভোম্বলদার মত দুঃসাহসিক লোক আমার আর নজরে পড়েনি। তিনি একাই দশজনের সংগে লড়ে জিততে পারতেন। প্রয়োজন হলে দোতলা থেকে নীচে লাফ দিয়ে পড়তে পারতেন। যেমন ছিল তাঁর স্বাস্থ্য তেমনি ছিল তাঁর বুক! ভোম্বলদার আসল নাম ছিল সুকুমার গুপ্ত। আমাকে লাঠি খেলা-কুস্তিতে ভোম্বলদা অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

এই বয়সে সিগারেট খাওয়ার কথা বন্ধুদের মুখে এলে আমি রীতিমত ভীত হতাম। যদি সিগারেট টানছি কেউ দেখে ফেলে তা হলে বাড়িতে ঢোকা বন্ধ হয়ে যাবে সেই ভয় ছিল, তা ছাড়া তখন সাঁতার কাটছি, কুস্তি লড়ছি, লাঠি খেলা শিখছি সুতরাং সিগারেট টানা অপরাধ সেটা জানতাম। তবুও একদিন লালু আর আমি সিগারেট টেনেছিলাম। বেশ মনে আছে, বিজলী সিনেমায় আমরা ক'জন বন্ধু, তার মধ্যে লালু আছে, 'ঠিকাদার' ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। জ্যোৎস্না গুপ্তা ও দুর্গাদাসের ছবি। তখন ক্যাপস্টান ম্যাগনাম্ নামে সিগারেট ছিল। তার একটা কিনে একজন ধরিয়ে আমাকে দিয়েছিল, আমি বার কতক টান দিয়ে আর একজনকে দিয়েছিলাম। তখন আমরা এই রীতে প্রথায় সিগারেট টানায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঠিকাদার দেখে বেরিয়ে এসেও দেখি মুখে গন্ধ। বেশ বুঝতে পারলাম মুখে গন্ধ আছে। সর্বনাশ, এবার বাড়ি ঢুকবো কেমন করে! হঠাৎ বুদ্ধি এল,

যদি কিছু খাই গন্ধ চলে যাবে। আমি, লালু ঢুকলাম শ্রীহরি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে। কিছু খেয়েছিলাম গন্ধ ঢাকার জন্যে। তারপর পরস্পর গন্ধ শোঁকাশুঁকি করে দেখলাম গন্ধ যায়নি। বন্ধুর বাড়ি গিয়ে মুখে ওডিকোলন মেখেছিলাম, বোধহয় সামান্য খেয়েও ছিলাম! এই হলো আমাদের প্রথম সিগারেট টানার স্মৃতি!

এরপর যখন সাউথ সুবার্বনে পড়ছি তখন সেটা ১৯৭১ সাল, আমরা নিজেরাই একটা ব্যায়ামাগার তৈরি করে ফেললাম। লুনার ব্যায়ামাগার। ভোম্বলদা বললেন, শুধু ব্যায়ামাগার হলেই হবে না, সেই সংগে ফুটবল খেলার ব্যবস্থাও করতে হবে—

তাই হলো। তখন আমরা একদিকে ভোম্বলদার কাছে নিজেদের ক্লাবে ব্যায়াম শিখছি—অন্যদিকে চুটিয়ে ফুটবল খেলছি। আমি হাফ-এ খেলতাম। মিতাম চ্যাটার্জী, রঞ্জিত সিন্‌হা, বিমল বসু, মনি গাঙ্গুলী এরা পরবর্তীকালে ফার্স্ট ডিভিশনে খেলেছিল! শুধু ফুটবল না—এক একটা সিজ্‌নে এক এক খেলা নিয়ে আমরা মাঠে নামতাম। ভলি, ক্রিকেট সব খেলতাম সাউদার্ন পার্ক অর্থাৎ লেডীজ পার্কে। আমি বরাবরই মোহনবাগানের সাপোর্টার ছিলাম।

পরবর্তীকালে ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশান অব বেঙ্গল আমাকে লাইফ মেম্বার করে নিয়েছিল। এবং আমি বডি ফিট রাখার জন্তে ১৯৫৯ সালে South Club-এ নিয়মিত টেনিস খেলতাম!

যখন চক্রবেড়িয়া স্কুলে পড়ি তখন থেকেই থিয়েটার রর ঝোঁক যে কী প্রবল ছিল তা আগে বলেছি। কোথাও থিয়েটার হবে শুনলে আমার মনের ভিতরটা কেমন উদ্বেল হয়ে উঠত! হঠাৎ একদিন শুনলাম সুহৃদ সমাজে নাটক হবে। নাটক স্থির হয়ে গেছে। নতুন নাটক। নাম—'ব্রজের কানাই'।

এ ক্ষেত্রে আমার স্কুলের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বলরামের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্ত একজন সুদর্শন এবং ভাল পার্ট বলতে পারে এমন এক কিশোরের প্রয়োজন হয়েছিল সুহৃদ সমাজের বড়দের! কথাটা কানে যেতে পড়া মাথায় উঠল। আনচান করে উঠল আমার ভিতরকার মানুষটা। যথারীতি জ্যাঠামশায়ের পাশে ঘুর ঘুর করতে থাকলাম। যদি আমাকে দেখে ওঁদের প্রয়োজনের কথা মনে পড়ে। মাঝে মাঝে লুকিয়ে সুহৃদ সমাজের আনাচে কানাচে ঘুরতে থাকলাম। যদি কারও নজরে পড়ি তেমনি আশা মনে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। সৌভাগ্যবশতঃ একদিন সত্যি সত্যি ওঁদের নজরে পড়লাম। ব্রজের কানাই নাটকে বলরামের ভূমিকায় রূপদান করার সুযোগ পেলাম।

ফণী রায় ছিলেন তখনকার দিনের প্রখ্যাত অভিনেতা। আরও বড় হবার সংগে সংগে ফণী রায়ের খ্যাতি সম্বন্ধে আরও বেশী শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠেছিলাম। সেই ফণীবাবু তখন যুবক সমাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

যথা সময়ে শুনতে পেলাম সেই স্বনামধন্য অভিনেতা ফণী রায়ের সঙ্গেই আমাকে অভিনয় করতে হবে। সেদিন যে কী আনন্দ হয়েছিল তা আজ আর বলে বোঝাতে পারব না।

বলরামের পার্ট পেয়ে স্নানখাওয়া তখন আমি ভুলতে বসেছি।

'ব্রজের কানাই' মঞ্চস্থ হ'ল।

অভিনয়ের দিন সকাল থেকে সবারই মনে খুশি খুশি ভাব। অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত সেই সন্ধ্যে এল।

ঘরে ঘরে আলো জ্বলল। আলোতে আনন্দে মন আমার ঝলমল করে উঠল। পাড়ায় যেন কোন উৎসবের মেলা বসেছে। এ পাড়ার ও পাড়ার লোকেরা এসে জমেছে আসর ঘিরে। হৈ-হুল্লোড় হট্টগোল। সময়মত মেক্-আপ নিতে বসলাম। চুমকি বসানো ভেলভেটের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হ'ল আমাকে। গয়না পরানো হ'ল আমার বাহুতে, কণ্ঠে। মাথায় মুকুট। কাঁধে লাঙল। কপালে শ্বেত-চন্দনের টিপ।

কারা যেন আমাকে সস্নেহে ধরে নিয়ে গেল আয়নার সামনে। আয়নায় আমি আমার ছবি দেখতে পেলাম। নিজের সেই মূর্তি দেখে নিজেই বিস্মিত হলাম।

বলরামকে স্বচক্ষে কখনো দেখিনি তো। ক্যালেণ্ডারে দেখেছি, অন্য আরও ছবিতে দেখেছি। কিন্তু এ যেন আসল বলরাম দর্শন। খুব ভাল লাগছিল দেখতে। খুশিতে টলমল করে উঠছিলাম।

বন্ধুরা বলল, কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে। কেবল বন্ধুরাই নয়, প্রত্যেকেই একই কথা বলছিল। সত্যিই যেন মুহূর্তে আমি পাল্টে গিয়েছিলাম। সুন্দর হয়ে গিয়েছিলাম।

বাঁশি বাজল। বাদ্যযন্ত্র বাজল। শুরু হয়ে গেল নাটক।

আমি জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করে নেমে পড়লাম পাদপ্রদীপের আলোয়।

নাটক শেষ হ'ল।

সবাই আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ফণী রায়ও আমাকে আশীর্বাদ করলেন।

ব্রজের কানাই ছিল ফণীবাবুর লেখা, পরিচালনাও তাঁর।

সে কত ভালবাসা। সেইদিন থেকে থিয়েটারের নেশা আমাকে যেন পাকাপোক্ত ভাবে পেয়ে বসল।

অবশ্য পড়াশোনাও সমানে চলছে।

এ সব ১৯৩৯ সালের কথা। এই সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার পৈতে হয়। বেশ ধুমধাম না হলেও আড়ম্বরের সঙ্গেই আমার উপনয়ন অনুষ্ঠান সমাধা হয়েছিল।

গোটা দেশটাই যেন থমথমে এ সময়।

মা বাবা সবাই তখন ভীষণ চিন্তান্বিত। সবাই ভারাক্রান্ত!

দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার জন্য সবাই কেমন যেন ভীত-সন্ত্রস্ত।

আমার বয়স তখন বেড়েছে। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্ঞানও সীমিত নেই। আমিও দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার কথা ভাবছি। সারা দেশ জুড়ে আন্দোলনের জোয়ার আসছে।

এই জোয়ার আরো একবার এসেছিল। আমার যখন চার বছর বয়স। তখনকার সেই আন্দোলনের ছবি আমি এই মুহূর্তে যেন কল্পনার চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

এখন আমি বড় হয়েছি। সেই জোয়ারের গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ছুটে আসছে। আমার মনের উপরেও একটা চাপ সৃষ্টি করছে।

'নবন আন্দলনে'র পর আবার প্রস্তুতি চলেছে সংগ্রামের জন্য।

আমাদের চারিদিকে তখন বাঘা বাঘা মানুষেরা। যাঁদের রণহুঙ্কারে আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। যাঁদের উদ্দেশে আজও আমরা প্রণাম জানাই।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী, মাতঙ্গিনী হাজরা—আরও বহু জননেতা ও জননেত্রী তখন জীবিত।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ভারতকে স্বাধীনতার সিংহদ্বারে পৌঁছে দেবার জন্য ওঁদের মিলিত সংগ্রামে আকাশ-বাতাস মুখরিত।

তখন১৯৩৯ সাল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ইউরোপে। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ব্রিটিশ সরকারের কাছে স্পষ্টভাবে জানতে চাইলেন কেন এই যুদ্ধ!

তাঁরা বজ্রকণ্ঠে দাবী জানালেন—ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার ব্রিটিশকে মেনে নিতেই হবে। ব্রিটিশ সরকার সেই দাবী অগ্রাহ্য করল। এদিকে কংগ্রেসও তার প্রতিজ্ঞাতে অটল।

ভারতের সাতটা প্রদেশের মন্ত্রিত্ব সেই মুহূর্তে ছেড়ে দিল কংগ্রেস এবং ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সমস্ত সম্পর্ক মুছে ফেলল।

ওদিকে শুরু হয়ে গেল জাপানের সঙ্গে ব্রিটিশের মরণপণ সংগ্রাম।

চারিদিকে সংগ্রামের তপ্ত বাতাস। সেই তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে কখন যে আমি কৈশোর থেকে যৌবনের সোপানে এসে দাঁড়ালাম আজ আর তা সঠিক বলতে পারি না।

১৯৩৯ সাল চলে গেল। এল ১৯৪০।

একটা করে বছর কাটে আর আমার বয়সের সঙ্গে মনের পরিধিও বাড়তে থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল ভারতবর্ষ।

এল ১৯৪১ সাল। ঐতিহাসিক ৭ই আগস্ট। বাংলা ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮। দিনটি ছিল রাখী পূর্ণিমা। সৌভ্রাতৃত্বের নিদর্শন স্বরূপ হাতে হাতে রাখীবন্ধনের দিন, মিলনের দিন।

বাংলা তথা ভারতের আকাশের ধ্রুবতারাটি যেন সহসা খসে গেল। আমরা আমাদের একান্ত আপনার কবিকে হারালাম। বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রকে এক অসহায় অবস্থার মধ্যে রেখে বাংলার সাহিত্যের সিংহাসন থেকে চলে গেলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খবরটা কানে আসতে আমি সেদিন যেন মুহূর্তে মূক হয়ে গেলাম। আমিও ছুটে গিয়ে দাঁড়ালাম লক্ষ লক্ষ মানুষের শোক মিছিলে।

একদিকে কবি-বিয়োগের শোক, অন্যদিকে দেশের নিদারুণ সংকটময় মুহূর্ত। আমরা সাধারণ মানুষগুলো তখন টলমল করছি।

এল ঐতিহাসিক '৪২।

আমি তখন ষোল বছরের যুবক। আমার যুবক মনও তখন পরাধীনতার বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে মুক্তির স্বাদ পেতে চাইছে। ক্রমশঃ রাজনৈতিক আবহাওয়া ভারী হয়ে যেতে লাগল। যুদ্ধ তখন চারিদিকে। জাপান অতর্কিতে আঘাত হানল ভারতের বুকে। যুদ্ধের উন্মত্ততায় যেন ভারতকে জোর করে মাতিয়ে দেওয়া হ'ল। চার্চিল ভারতের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে যে প্রস্তাব রাখলেন, সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করল না কংগ্রেস।

ভারতের ইতিহাসের পাতায় ৮ই আগস্ট তারিখটি ঝলমল করে উঠল।

দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষিত হল 'ভারত ছাড়' !

কবিকে হারাবার দুঃসহ ব্যথা নিয়েই গোটা দেশ জুড়ে শুরু হয়ে গেল অসহযোগ আন্দোলন। বন্দী হলেন মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট জননেতা। সরকারের মূঢ় দমননীতির জন্ম হ'ল। সারা দেশময় বিক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। খবর পেলাম তমলুকে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন অশীতিপর বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা।

একদিকে মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগকারী মানুষের ওপরে পুলিশের নির্মম অত্যাচার, বেয়নেটের খোঁচা আর বন্দুকের গুলি আগস্ট বিপ্লবকে রক্তাক্ত করে দিতে থাকল, অন্যদিকে নেতৃত্বহীন জনসাধারণ বাঁচার ও ভারতকে বাঁচাবার প্রতিজ্ঞা বুকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মুখে।

এদিকে-ওদিকে বিক্ষিপ্ত আন্দোলন। মাঠে-মাঠে সভাসমিতি।

আঘাতের পর আঘাতে সরকারকে বিপন্ন-বিপর্যস্ত করে তুলল তারা।

এই সময় আমরাও আন্দোলনে মেতে গেলাম। আমরা মাঝে মাঝেই প্রভাত ফেরী করে গোটা ভবানীপুর ঘুরে আসতাম। আমাদের হাতে থাকত ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। আমি সেই মিছিলের নায়ক ছিলাম। দেশাত্মবোধক গান গাইতাম আমরা।

সেই সব গানের সুর দিতাম আমি। গানগুলোও আমি রচনা করতাম।

ইতিমধ্যে আমি চক্রবেড়িয়া স্কুল ছেড়ে নতুন করে ভর্তি হয়েছি সাউথ সুবার্বন স্কুলে। অনেকগুলো দিন এখানে কেটেও গেছে।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে স্কুল যাই।

থিয়েটারের নেশা তখনও তেমনিই আছে। মাঝে মাঝে প্রভাত ফেরী বার করি। দেশের রাজনৈতিক খবর নিই খবরের কাগজের পৃষ্ঠা থেকে।

এমন সময় পড়ার চাপ এল। প্রয়োজনের তাগিদে প্রস্তুত হতে লাগলাম ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে আসতে থাকল। আমি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে চলেছি।

১৯৪২ সালের সেই দুর্যোগপূর্ণ রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যেই অবশেষে পরীক্ষা দিলাম। তারপর আশাতীত সাফল্যের সঙ্গে পাশও করলাম। আশান্বিত হলেন বাড়ির সবাই। কিন্তু এসব কথা পরে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর মাস তিনেক ছুটি। এই সময়টাতে বড় বিশ্রী লাগতে লাগল। সময় যেন আর কাটতে চায় না।

মনে পড়ে। বেশ মনে পড়ে এ সব কিছুরই আগে থিয়েটারে আমার আসক্তি দেখে আমার এক মাস্টারমশাই আমাকে বেশ উৎসাহ দিতেন।

তিনি বলতেন, পাবলিক স্টেজের অভিনয় দেখেছ ?

তখন পাবলিক স্টেজের থিয়েটার দেখতে যাব এমন দুঃসাহস আমার ছিল না। যদি বাবা দেখতে পান! যদি সবাই জানতে পারেন।

এ সব কথা ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার অনেক আগের কথা।

মাস্টারমশাইয়ের উৎসাহে সেই ভয়টা এক সময়ে কাটিয়ে উঠলাম। যেতে শুরু করলাম থিয়েটার দেখতে। এই সময় বড় বড় অনেক কম্বিনেশন নাইট হ'ত। বাঘা বাঘা শিল্পীরা তখন আমার চারদিকে।

রঙমহলে একবার 'কেদার রায়' নাটকের কম্বিনেশন নাটক ছিল। গেলাম সেই 'কেদার রায়' দেখতে। এই আমার প্রথম পাবলিক স্টেজে প্রথম নাটক দেখা। বড়বাবু অর্থাৎ নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রমুখ অভিনেতাদের তখন নিদারুণ প্রতাপ।

তারপর থেকেই প্রায়ই নাটক দেখতে যেতাম। এই সময় বিদেশী ছবিও খুব দেখতাম। বাংলা ছবি একটিও বোধ হয় বাদ যেত না।

আমি প্রায় প্রত্যেকরই অভিনয় দেখতাম, আর কেন জানি না, সহজ অভিনয় দেখার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মাত। বার বারই মনে হ'ত, আমরা সবার সঙ্গে যেমন করে কথা বলি, উত্তেজনার সময় আমাদের মুখ-চোখের ভাব যেমন হয়, ভয় পেলে বাস্তবে আমরা যেমন ভয়ের অভিব্যক্তি দিয়ে থাকি, অভিনয় করতে গেলে তবে কেন তেমন বাস্তব হতে পারব না ? সেই সহজ বাস্তব অভিনয় দেখার প্রবল একটা ইচ্ছে আমাকে যেন কাতর করে তুলত।

একবার 'সিরাজদ্দৌলা' দেখতে গিয়েছিলাম। সেবার স্বনামধন্য নট বাণী-বিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ী অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 'সিরাজদ্দৌলা' দেখে যখন বাসে করে বাড়ি ফিরছি তখন আমি সেই সিরাজকে নিয়ে জটিল ভাবনায় জড়িয়ে পড়েছি। আমার মনে তখন একটা প্রশ্ন—যা দেখে এলাম সেখানে বাস্তবতার ছোঁয়া কতটুকু ? আসল সিরাজ কি ঐ ভাবে হাঁটতেন ? ঐ ভাবে কথা বলতেন ? ঐ ভাবে উত্তেজনা প্রকাশ করতেন ?

এই ভাবে আমার আত্মপ্রস্তুতি চলতে থাকল। পরবর্তীকালে আমি অনেক বারই সিরাজ অভিনয় করেছি। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরও আমরা নিয়মিত অভিনয় করতাম।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর ঐ তিন মাস ছুটির অবকাশে বাড়িতে বসে গল্প করতাম। আপন মনে থিয়েটারের সংলাপ বলতাম। গান গাইতাম। আর হারমোনিয়াম নিয়ে গলা সাধতাম। এর মধ্যে কখন যে আবার রূপালী পর্দায় অভিনয় করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম তা ঠিক জানি না।

সিনেমায় আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা তখন প্রবল আমার। সিনেমা দেখতাম বলেই সিনেমার প্রভাব আমার উপরে বিস্তারলাভ করেছিল। সিনেমার শিল্পীদের অভিনয় দেখে ভাবতাম, কত বড় ওরা! রুপালী পর্দায় অভিনয় করে, গান গায়!

যত সিনেমা দেখি ততই অসংযমী হয়ে পড়ি। আকাঙ্ক্ষা যেন বেড়েই চলেছে। আমি তখন ভিতরে ভিতরে অস্থির।

শুনেছিলাম গান জানলেই নাকি সহজেই সিনেমায় সুযোগ পাওয়া যায়।

আজকের মত সিনেমা-শিল্প তখন এতটা উন্নত ছিল না।

এখন যেমন অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের দিয়ে গান 'পিকচারাইজ' করার সময় সেই অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কাছে বারে বারে টেপ চালানো হয়, তখন অনেক ক্ষেত্রে টেপের পরিবর্তে কণ্ঠশিল্পী স্বয়ং বসে গান গাইতেন। যিনি পর্দায় সেই গান গেয়ে অভিনয় করবেন তিনি সেই গান গাইতেন আর ঠোঁট মিলিয়ে ক্যামেরায় ছবি উঠতো। আশ্চর্য, এই পদ্ধতিতে 'পিকচারাইজ' করলে ছবি এতটুকুও জার্ক করত না। এই পদ্ধতিতেই তখনকার দিনে প্রায় প্রত্যেক পরিচালকই কাজ করতেন। আর সেই কারণেই অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অধিকাংশই গান জানতেন। সঙ্গীত-চর্চা করতেন।

Acc No 1544

আমি তাই গান শেখবার জন্ত মরিয়া হয়ে গেলাম।

কানন দেবী, কে. এল. সায়গল, পাহাড়ী সান্যাল, রবীন মজুমদার, অসিত-বরণের সঙ্গীতপ্রতিভা, গায়কী ঢং, মিষ্টি গলা আমাকে যেন গান শেখার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করতে লাগল।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম গান শিখবই। কিন্তু কে শেখাবে আমাকে? কার কাছে যাব গান শিখতে? এই ভাবনায় আমি নিদারুণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। হঠাৎ মনে পড়ল নিদানবাবুর কথা। কণ্ঠশিল্পী ও সঙ্গীতশিক্ষক হিসেবে নিদানবাবুর তখন নামডাক অনেক। নিদান ব্যানার্জী।

নামটা মনে পড়তেই নিজেকে মনের দিক থেকে প্রস্তুত করে ফেললাম। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে একদিন একেবারে সরাসরি হাজির হলাম নিদানবাবুর কাছে। পৌঁছেই, কিন্তু কেমন যেন একটা সংকোচ বোধ করতে থাকলাম আমি। অহেতুক একটা ভয়-ভয় ভাব।

নিদানবাবু সহজভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? কি চাই?

নির্দ্বিধায় আমি বললাম, আমি গান গাইব—

বোধ করি আমার এই স্পষ্ট উক্তিতে নিদানবাবু খুশি হলেন। হাসতে হাসতে বললেন, বেশ তো, গান গাইবে—তবে গান গাইতে হলে গান শিখতে

হয়—সাধনা করতে হয়—

আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, আমি গান শিখতে চাই, আমি আপনার কাছেই গান শিখব বলে এসেছি—শেখাবেন আমাকে?

নিদানবাবু এবার যেন আরও খুশি। খুশিতে ওঁর মুখটা চকচক করে উঠল। রাজী হলেন আমাকে গান শেখাতে। আমাকে নিজের পাশে বসালেন। তারপর বললেন, একখানা গান শোনাও তো আমাকে—

আমার শুনে শুনে শেখা কিছু গান থেকে একটা গান শোনালাম। এবার বুঝলাম খুব একটা খুশি হতে পারেননি তিনি। তবে আমাকে নিরুৎসাহ করলেন না। সাহস দিলেন। বললেন, ঠিকমত গলা সাধতে পারলে গান তোমার গলায় বেশ ভালই উঠবে।

আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম। প্রতিদিন গলা সাধা এবং গানের সাধনা করার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

অবশেষে একটা শুভদিন দেখে নিদানবাবু আমাকে তালিম দিতে শুরু করলেন। নিদানবাবুর কাছে আমি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখতে লাগলাম।

তালিমের পাশাপাশি সকাল-সন্ধ্যায় আমার গলাসাধাও সমানে চলতে থাকল। একদিকে গায়ক অন্যদিকে অভিনেতা হবার স্বপ্ন দেখছি আমি। আস্তে আস্তে ছুটি ফুরিয়ে গেল। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বেরুল। আমি পাশ করলাম। ভাল ভাবেই পাশ করলাম ম্যাট্রিকুলেশান। ১৯৪২ সালে আমি সেকেণ্ড ডিভিশানে ম্যাট্রিক পাশ করলাম। মার্ক ভীষণ ভাল। সংস্কৃততে লেটার পেয়েছিলাম। অঙ্কে ভাল মার্ক ছিল। আমাকে যিনি পড়াতেন সেই ধীরেনবাবু আমার সংস্কৃত মার্ক দেখে বুকের ভিতরে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করেছিলেন। বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত না করেই বলা যায় আমরা সংস্কৃতের প্রতি একটু বেশীমাত্রায় ঝোঁক ছিল। কেন ছিল তা বলতে পারি না।

আমার পাশের খবরে যতটা খুশি হলেন মা-বাবা, আমি ঠিক ততখানি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার অবকাশ পেলাম না। কারণ, আমার সারা মনে তখন অভিনয় আর গানের প্রভাব। একটা বিশ্রী অস্বস্তি। ধ্যান-জ্ঞান শুধু অভিনয় আর গান। সেই সঙ্গে সংসারের অভাব অনটনের ছবিটাও আমার মনকে মাঝে-মাঝে ভারাক্রান্ত করে তুলতে থাকল। সবাই জানতে চায় আমি এবার কি নিয়ে কোন কলেজে ভর্তি হবো! আমার মনে হলো একটা চাকরি, যেমন তেমন একটা চাকরি যদি পেতাম তা হলে রাতে পড়তাম দিনে চাকরি করতাম। সবাই চান আমি কেরাণী হই। চাকরীর সন্ধান বাড়ির সবাই করতে থাকলেন। আমি ১৯৪৩ সালে ডালহাউসীতে গভর্ণমেন্ট কমার্শিয়াল

কলেজে নাইট-এ ভর্তি হলাম। এই কলেজ পড়াকালীন এখানেও দু'বার আমরা থিয়েটার করেছিলাম। একবার হয়েছিল 'কালিন্দী', সেই নাটক আমি মিষ্টার মুখার্জীর রোলে অভিনয় করেছিলেন। আর একবার হয় 'সিরাজদ্দৌলা', সেই নাটকে আমি হয়েছিলাম গোলাম হোসেন। তখন সবাই আমার অভিনয় দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন।

রাতে ভবানীপুর থেকে ডালহাউসীতে কলেজে যাই আর দিনে একবার নিদানবাবুর কাছে আর একবার সিনেমা জগতের সঙ্গে অনেক জানা-অজানা মানুষের কাছে, কিংবা থিয়েটার ক্লাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী মশাই তখন নাট্যজগতের মধ্যগগনে। বড়বাবু অর্থাৎ নাট্যাচার্য শিশিরকুমার বলতে তখন আমরা সবাই দিনে অন্তত: একবার প্রণাম করেছি। যেখানে শিশিরকুমারের নাটক, আমিও সেখানে। আমি তাঁর নাটকের নিয়মিত দর্শক হয়ে গেছি। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি নাটক-শিল্পকে ভালবাসার দুর্নিবার আকাঙ্খায় যেন মরিয়া হয়ে গেছি।

ঠিক করলাম আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিতভাবে নিয়মিত অভিনয় করব। বেশ জ াঁকিয়ে অ্যামেচার থিয়েটার শুরু করব আমরা। কিন্তু বিপদ দেখা দিল ঘর নিয়ে। রিহার্সাল দেবার ঘর পাই কোথায়? সবই হ'ল, নাটক পেলাম, মেয়েদের পেলাম (টাকা দিতে হ'ত), অবশেষে সেই ঘরও পেলাম। পেলাম একবারে নর্থ ক্যালকাটায়। শ্যামবাজারে।

বর্তমান দর্পণা সিনেমার পাশে যে বঙ্গীয় কলালয়, সেটা তদানীন্তনকালে ওখানেই ছিল। কুলবাগানওলা বাড়ি। বঙ্গীয় কলালয়ে বেশ অনেকগুলো ঘর ছিল। তার এক একটি ঘরে এক একটি ক্লাব। ভাড়া দেওয়া হ'ত ঘরগুলো। আর সেই এক একটি ঘরে তখন একাধিক প্রতাপশালী অভিনেতা আসতেন রিহার্সাল দিতে। এক একটা ঘর থেকে ভেসে আসত তখন আমাদের পরিচিত এক এক-জনের চেনা কণ্ঠস্বর। ঠাকুরদাস মিত্র- টিত্রও তখন বেশ জ াঁদরেল অভিনেতা। তাঁরাও আসতেন।

আমরা সেই বাড়িরই একটা ঘর পেয়ে গেলাম। রোজই যেতাম রিহার্সাল দিতে ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজার। 'ভোলামাস্টার', 'কঙ্কাবতীর ঘাট', ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'কানাগলি', বিধায়কদার অর্থাৎ বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাইতো' প্রভৃতি নাটক ওখানে রিহার্সাল দিয়েই আমরা বিভিন্ন মঞ্চে অভিনয়ও করেছিলাম।

আগেই বলেছি, ধরা-বাঁধা ছকে অথবা সাজানো কণ্ঠে অভিনয় করার ইচ্ছে আমার কোনদিনই ছিল না। আমি তাই নিজস্ব ধারায় সহজ অভিনয় করতাম

আমরা যেমন করে কথা বলি, রাগ করি, ঠিক তেমনি সহজ অভিনয়। অভিনয় নয়, ভাবেই চরিত্র রূপায়ণ। আর এই সহজ ভাবে অভিনয় করে যাবার একটা আকাঙ্ক্ষা সেই সঙ্গে বেঁচে ছিল।

তবুও আমাকে কলেজের পড়া চালিয়ে যেতে হলো।

কেরাণীবৃত্তির উপযোগী শিক্ষা নিতে থাকলাম। কিন্তু মনের মধ্যে একটা চাপা ব্যথা। কোন ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ সুযোগ না পাবার যন্ত্রণা। কি করব? মনের চাপা যন্ত্রণা নিয়েই আমি নিয়মিত কলেজে যেতে থাকলাম। অবসর সময়ে বন্ধুদের আসরে গান শোনাতে থাকলাম। বন্ধুমহলে অল্পদিনের মধ্যে গায়ক হিসাবে সুনাম করে ফেলেছি। এ-পাড়া ও-পাড়ার থিয়েটার ক্লাবে গিয়েও নিজেকে শুধু বাঁচিয়ে চলতে থাকলাম।

এল ১৯৪৩।

ব্রহ্মদেশ জাপানের হাতে চলে যাবার পর ভারতীয় বাহিনীর যে সব সৈন্য বন্দী হয়েছিল সেই সব বন্দীদের নিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' তৈরি করলেন। নিজের তৈরি ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সাহায্যে সুভাষ বসু কোহিমায় স্বাধীন ভারতের পতাকা তুললেন। আগেই বলেছি, আমরা প্রভাত ফেরী বার করতাম। আমি ছিলাম সেই মিছিলের নায়ক। ১৯৪৫ সালে নেতাজীর জন্মদিনে একবার প্রভাত ফেরী বার করেছিলাম। সেদিন যে গানটি গেয়েছিলাম আমরা, তার রচয়িতা ও সুরকারও ছিলাম আমি।

গানটি ছিল—

সুভাষেরই জন্মদিনে গাইব নতুন গান
সেই সুরেতে জাগবে মানুষ
জাগবে নতুন প্রাণ।

এই সময়ে আই. এন. এ. ফাণ্ডের জন্যও আমরা পিছিয়ে থাকিনি। কেমন করে সেই ফাণ্ডের জন্য অর্থসংগ্রহ করা যায় তখন সেই ছিল আমাদের একমাত্র ভাবনা। অবশেষে আমাদের লুনার ক্লাব থেকে আমরা 'আনন্দমঠ' নাটক আসরস্থ করলাম। চ্যারিটি শো। ৩৯, গিরিশ মুখার্জী রোড অর্থাৎ গিরিশ মুখার্জীর বাড়িতে সেই নাটক মঞ্চস্থ করে প্রায় সতেরশ' টাকা সংগ্রহ করে

আমরা তুলে দিয়েছিলাম সতীশচন্দ্র বসুর হাতে। এমনি করে আমি আমার দেশকে ভালবাসার চেষ্টা করেছিলাম মাত্র।

আমাদের একমাত্র সহায় তখন নেতাজী। আমরা তখন নতুন আশার বাণীতে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছি। এই সময় আমাদের সংসারের নিদারুণ পঙ্গু অবস্থা। আর এই অবস্থার জন্য আমি মাঝে মাঝে নিজেকে ধিক্কার দিতাম। বাড়ির প্রত্যেকের ওপরে আমার একটা চাপা ক্ষোভ জন্মাতে থাকল। সবাইকে আমি যেন ভুল বুঝতে শুরু করলাম। মনে হ'ল ওঁরা আমার শিল্পী-মনকে কোথায় উৎসাহ দেবেন তা নয় পরন্তু সবই আমার কাছ থেকে আর্থিক সহযোগিতা চাইছেন। মনে হ'ল সংসারে কেউ আমাকে, আমার ভিতরকার মানুষটাকে ঠিক বুঝতে চাইছেন না। আমার তখন নিদারুণ মানসিক অবস্থা।

১৯৪৫ সালে আমি পাশ করলাম। তখন বি.কম. বলা হতো না বলা হতো বি.কম. ষ্ট্যাণ্ডার্ড। সুতরাং বলা যেতে পারে আমি বি.কম. পাশ করলাম যথারীতি। আমার পাশ করার ব্যাপারে সেদিন বাবা-মা খুশিতে ঝলমল করে উঠেছিলেন। পরক্ষণেই তাঁদের মুখের দিকে চোখ রেখে স্পষ্ট বুঝেছিলাম তাঁরা আমার ওপর অনেক নির্ভরশীল। অর্থাৎ আমি যদি পাশ করার সংবাদের চাইতে একটা চাকরি পাবার সংবাদ দিতাম তা হলে ভালই হতো! আমি মনে মনে কামনা করেছিলাম, একটা চাকরি পেলে ওঁদের মুখে হাসি ফোটাতে পারি।

শেষ পর্যন্ত সংসারের চাপ এসে পড়লই। ভাল করে চেয়ে দেখলাম বাবার ক্লান্ত মুখের দিকে। আমাদের অথর্ব সংসারের দিকে। বাড়ির বড় ছেলের কর্তব্য আমাকে তো করতেই হবে। ভাবলাম গরীব ঘরে জন্ম নিয়ে অভিনেতা-গায়ক হবার স্বপ্ন দেখা বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অগত্যা চাকরি চাই! যেমন করেই হোক—একটা যেমন-তেমন চাকরি!

অর্থচিন্তায় আমি রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়লাম। কলেজে পড়া আর বেশীদূর এগুল না।

আমি তখন শুধু একটা চাকরির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। একটা যে কোন চাকরির সন্ধানে আমি যেন মরিয়া। একদিকে স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে না পারার যন্ত্রণা, অন্যদিকে একটা চাকরির সন্ধানে আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম।

বাবার পরিশ্রমী মুখটা আমি যেন সব সময় দেখতে পাই। রাতে ভাল করে

ঘুমুতে পারি না। মায়ের মলিন মুখ যেন আমাকে আরও বেশী কাতর করে তুলছিল। আমাদের বাড়ির সবাই কেমন যেন মনমরা।

শেষ পর্যন্ত একটা চাকরির খবর এল।

খবরটা একেবারে খাঁটি হয়েই এল। খবরটা নিয়ে এলেন আমার মেজমামা।

মেজমামাকে আমরা গৌরীমামা বলে ডাকতাম। মেজমামার আসল নাম হ'ল গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। পরিচিত এক মহলে অনেক ধরাধরি করে তিনি আমার জন্য ওই চাকরিটা একেবারে পাকাপাকি করে আমাকে খবর দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপলিকেশন করলাম। তারপর ইন্টারভ্যু। তারপর চাকরি করার ডাকও এল। যথাসময়ে অতি কষ্টে হাজার ছয়েক টাকাও সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসাবে জমা দিলাম। কারণ চাকরিটা আমার ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে। পোর্ট কমিশনার্স অফিসে আমার চাকরি। মাসিক ছ'শো পঁচাত্তর টাকা মাইনের সাধারণ কেরাণী হয়ে গেলাম আমি। আমার বসবার চেয়ার সেই ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে।

রোজ অফিসে যাই। কাজ করি। পাঁচটা বাজলেই চলে আসি ট্রাম-স্টপেজে। পেটে তখন খিদের জ্বালা।

সবাই টিফিন খায়, আর আমি ঠিক সেই সময়ে নিজের চেয়ারে বসে থাকি। হয়তো টেবিলের উপর দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে স্বপ্নের জাল বুনি।

বাড়ি না আসা পর্যন্ত পেটে কিছু পড়ত না। বাড়ি এলে মা আমাকে খাবার এগিয়ে দেন। আমি জলখাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিই। তারপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আলো জ্বলে। ঘরে ঘরে মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনি, আমি কান পেতে শুনি। এরপর ঘরে আর মন বসে না। বেরিয়ে পড়ি ক্লাবের উদ্দেশে। শুরু করি কোন নাটকের রিহার্সাল অথবা নির্জলা আড্ডা।

ক্রমেই উৎসাহ যেন স্তিমিত হয়ে যেতে লাগল। ভাল লাগে না। কিছু ভাল লাগে না। অবসর সময়ে শুধু বাড়িতেই থাকি।

এমনি ভাবে একদিন বাড়িতে আছি। ছুটির দিন। হঠাৎ নজর পড়ল মেয়েটির দিকে। মেয়েটিকে দেখে আমার যুবক মনে এক শিহরণ খেলে গেল।

ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলাম তাকে। আমার জ্যাঠতুতো বোন অন্নপূর্ণার সঙ্গে হাসতে হাসতে আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে মেয়েটি। বড় মিষ্টি তার হাসি। সুশ্রী।

বলতে লজ্জা সেই মুহূর্তে বড় ভাল লাগল মেয়েটিকে।

এ যেন প্রথম দর্শনেই প্রেমের ব্যাপার! ভাবলাম ভয় কিসের? অন্নপূর্ণাকে-

ডেকে মেয়েটির পরিচয় জানি। পরিচিত হই। নিজেকে সেই মুহূর্তে অনেকটা প্রস্তুত করলাম। কিন্তু ওদের কাছে এগিয়ে যাবার আগেই মেয়েটি আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। দেখলাম অন্নপূর্ণা ফিরে আসছে।

বোধ হয় বান্ধবীকে খানিকদূর এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল। আমি একটু মুষড়ে পড়লাম। আবার মনে হ'ল অন্নপূর্ণাকে ডেকে ওর পরিচয় জানি। হ'ল না। অনেক চেষ্টা করেও জিজ্ঞাসা করা হ'ল না। বার বার প্রচণ্ড চেষ্টা করেও পারলাম না। একরাশ লজ্জা যেন আমার কণ্ঠরোধ করতে লাগল।

এরপর মাত্র ক'টা দিন। অনেক চেষ্টা করেও মেয়েটিকে যেন কিছুতেই ভুলতে পারলাম না।

অফিস ছুটি হলে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরি। বাড়ি ফিরবার জন্ম যেন ব্যাকুল থাকি। বাড়ি ফিরে এসেই সবার অলক্ষ্যে একবার গোটা বাড়িটা ভাল করে দেখি। দেখি সে এসেছে কিনা। আশাহত হই। আজ না আসুক কাল নিশ্চয়ই সে আসবে এমন একটা আশার জন্ম হতে লাগল আমার মনে। বাড়িতে নতুন কোন কণ্ঠ কানে এলেই সজাগ হয়ে যেতাম, ঐ বুঝি মেয়েটি এসেছে। এইভাবে কখন যে আমি তাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম তা আমি নিজেও জানতাম না।

তার প্রতীক্ষায় আছি। এমন সময় একদিন মেয়েটি এল আবার আমাদের বাড়িতে। মনে হ'ল অন্নপূর্ণাকে সে পৌঁছে দিতে এসেছে। সেদিন ঠিক সেই সময়ে আমিও বাড়িতে। নিজের ঘরে।

নিজের ঘর থেকেই সেদিন আবার একবার মেয়েটিকে দেখলাম। দু'চোখ ভরে দেখলাম। যত দেখি, মনে হয় যেন কতদিনের দেখা। নিজেকে আর সংযমী করে রাখতে পারলাম না। চুপি চুপি অন্নপূর্ণাকে আমি ডাকলাম।

প্রশ্নবোধক দৃষ্টি মেলে সে আমার কাছে এল। তারপর অনেকটা সাহসে ভর করে জিজ্ঞাসা করলাম, তোকে কে পৌঁছে দিয়ে গেল রে?

অন্নপূর্ণার চোখে-মুখে দুষ্টুমির ছাপ। সে পাল্টা প্রশ্ন করল, কে বল দিকিনি?

ভীষণ রাগ হ'ল আমার। বললাম, আমি জানলে কি আর তোকে জিজ্ঞাসা করতুম, ঐ যে এখুনি এসেছিল তোর সঙ্গে—

অন্নপূর্ণার মুখে ঠিক তেমনি দুষ্টুমির হাসি। মুখের ওপরে একটা হাত চাপা দিয়ে সে মুচকি হাসতে হাসতে বলল,—ও তো গৌরী—

আমার কাছে তখন ঐটুকু 'গৌরী'ই যথেষ্ট নয়। ওর সম্পূর্ণ পরিচয়টা

জানবার জন্য আমি তখন রীতিমত ব্যাকুল। মনে মনে অন্নপূর্ণার ওপর ভীষণ রাগ হলেও গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললাম, তা গৌরী কে বলবি তো?

অন্নপূর্ণা বলল, গৌরীরাণী গাঙ্গুলী—এ্যাষ্টন আর ল্যান্সডাউন রোডের মুখে থাকে—

ল্যান্সডাউন রোডের অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। ধনী পরিবারের সন্তান। রাজবালা গানের স্কুলে অন্নপূর্ণার সঙ্গে গৌরীর পরিচয়।

আমি সব কথা শুনে খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। গৌরী গান ভালবাসে জেনে আমি যেন আরও রোমাঞ্চিত হলাম। তারপর থেকে গৌরীর সঙ্গে ভাল করে আলাপ করব বলে আমার ভিতরটা উদ্বেলিত হতে থাকল। দেরি যেন আর সয় না। সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ভাবলাম এবার যদি গৌরী আসে আমি তাকে গান শোনাব। ভিতরকার মানুষটা অস্বাভাবিক ভাবে ছেলেমানুষ হয়ে পড়েছে তখন। আমি বুঝেও যেন বুঝতে পারছি না। প্রহর গুণে চলেছি।

আমার মনে তখন রাতের জ্যোৎস্না, আর রাতের আকাশে তখন ভোরের আলো। গোটা রাত ধরেই গৌরীকে ভাবা। ভেবেই চলেছি।

সেদিন বোধ হয় ছিল আমার ছুটির দিন। বাড়িতে আছি। হঠাৎ গৌরীর কণ্ঠস্বর আমার কানে এল।

গৌরী এসেছে। নিজেকে শক্ত করে ওর সঙ্গে আজ ভাল করে আলাপ করব বলে প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। হঠাৎ মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। তাড়াতাড়ি হারমোনিয়াম টেনে আমি গান গাইতে শুরু করলাম। ভাবখানা এমন যেন সত্যিই আমি সঙ্গীত সাধনায় রত। অবশ্য দরদ দিয়েই গান গাইছিলাম। গান গাইছি, কিন্তু দৃষ্টি পড়ে রইল আমার দরজার ওপরে। আশা, আমার গান শোনবার জন্য গৌরী নিশ্চয়ই দরজার কাছ-বরাবর আসবে।

আমি গান গেয়েই চলেছি। একটার পর একটা গান। অনেকগুলো গানই আমি তখন গেয়ে ফেলেছি। তবুও কই, গৌরী তো এল না!

অত্যন্ত রাগ হ'ল। ভাবলাম ধুৎ, হারমোনিয়াম তুলে রাখি। মনে হ'ল, এই মোহ ত্যাগ করা দরকার। ভাবলাম বড়লোকের দেমাকী মেয়ে সে। হয়তো আমাকে উপেক্ষা করাই তার বিলাস। ভাবলাম ওকে ভুলে যাওয়াই ভাল। মনে রেখে লাভ কি তাকে। কিছুতেই আমার মনের দর্পণে তার প্রতিচ্ছবি ভাসতে দেব না প্রতিজ্ঞা করে বসলাম।

হ'ল না। কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। গৌরীর মুখটা ঠিক ঘুরে ঘুরে যেন আমার মনের পর্দায় এসে দাঁড়াতে লাগল।

গৌরীকে বাড়ির বাইরে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে অন্নপূর্ণা আমার কাছে এসে দাঁড়াল। যতটা পারলাম গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললাম, কি চাই ?

কথাটা এমন ভাবে বললাম যেন সব ব্যাপারটার জন্ত অন্নপূর্ণাই দোষী

সেও আকস্মিক এই পরিবর্তনে অনেকটা দমে গেল। সেই মুহূর্তে সমস্ত উৎসাহ যেন তার হারিয়ে গেল। তবুও যতটা সম্ভব সে নিজেকে সহজ করে বলল, দাদা—গৌরী বললে, তোর দাদার গানের গলাটা তো বেশ। ও তোমার সঙ্গে দেখা করবে, আলাপ করবে বলেছে।

আমি সেই কথা শোনা থেকে যেন কেমন হয়ে গেলাম। গৌরী আমার গানের তারিফ করেছে শুনে আমি সেই মুহূর্তে আনন্দে খুশিতে টলমল করে উঠলাম। আমি যেন একটু বেশীমাত্রায় ব্যাকুল হয়ে পড়লাম।

সেই ব্যাকুলতা নিয়েই আমি আছি। গৌরী তবু এল না।

একদিকে সিনেমার নায়ক হবার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে গৌরীকে পাবার ব্যাকুলতা আমাকে তখন রীতিমত অস্থির করে তুলেছে। অনেক কষ্টে মনকে সান্ত্বনা দিই। সান্ত্বনা দিলাম এই ভেবে গৌরী ধনীর দুলালী, তাকে আশা করা দুরাশা মাত্র। তাই আমি গৌরীকে ভুলবার চেষ্টা করলাম। তবুও হ'ল না। পারলাম না। অনেক চেষ্টা করেও আমার মনের ওপর থেকে গৌরীকে সরিয়ে রাখতে পারলাম না। ওকে ভোলবার জন্ত, আমি আমার শিল্পী হবার স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার জন্ত আবার নতুন করে অভিযান শুরু করে দিলাম।

ভাবলাম ঘরে বসে থাকলে তো আর কেউ বাড়ি বয়ে এসে সুযোগ দেবে না।

সুযোগ পেতে হলে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে পথে। যেমন করে হোক সুযোগ পেতে হবে আমাকে। সুযোগ যদি সহজে নাও আসে তা হলেও আমি আমার সঙ্কল্প থেকে এতটুকুও সরে আসব না।

বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে পড়লাম স্টুডিওপাড়ার উদ্দেশে। ভবানীপুর থেকে টালিগঞ্জ আর টালিগঞ্জ থেকে সাউথ সিঁথি রোড। অফিস করি আর বাকি সময়টা স্টুডিওর দরজায় দরজায় ঘুরি।

অনেক দিন আবার অফিস ফাঁকি দিয়েই বেরিয়ে পড়ি স্টুডিওপাড়ার দিকে।

যে ফাঁকি জিনিসটাকে আমি ছেলেবেলা থেকে ঘৃণা করতাম অফিসের বেলায় সেই ফাঁকি দিতে শুরু করলাম আমি।

আমার শিল্পীসত্তাকে সজীব করে তোলবার জন্ত, শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্ত কেরাণী জীবনে এই ফাঁকির শুরু। আমি তখন মরিয়া হয়ে গেছি।

প্রযোজক-পরিচালকদের সঙ্গে দেখা হওয়া তো দূরের কথা স্টুডিওর গেট পর্যন্ত পার হতে পারি না!

সেখানে যে আমার প্রবেশ নিষেধ। তবুও আমি ছাড়বার পাত্র নই।

একদিকে স্টুডিওর দরজায় ধর্ণা দেওয়া, অন্যদিকে বিভিন্ন জায়গায় বিচিত্রানুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য ধর্ণা দেওয়া আমার নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়াল।

তখন অবশ্য গানের টিউশনি আমি করতাম না। তবে বেশ মনে আছে কালীঘাটের একটা বাড়িতে দিনকতক দুটি মেয়েকে গান শিখিয়েছি। মেয়ে দুটির নাম কিছুতেই মনে করতে পারছি না। কিছুদিন চক্রবেড়িয়া (সাউথ) 'মনোরমা' স্কুলে গান শিখিয়েছিলাম। টাকাও পেতাম।

আমার মনের তখনকার সেই অস্বস্তিকর অবস্থায় এই গান শেখাতে যাওয়া ছিল একটা রিলিফ।

আর সেই 'রিলিফ' মনে মনে চাইতামও। যখনই শুনতাম কেউ কোথাও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন তখনই সেখানে একটা সুযোগ পাবার জন্য ছুটে যেতাম। কাকুতি-মিনতি জানিয়ে বলতাম, যখন সুবিধে হয় তখন আমাকে গান গাইবার সুযোগ দেবেন, আমি অপেক্ষা করব, তবুও দয়া করে আমার নামটা আপনাদের তালিকায় রাখুন—

অনেক সময় অবচেতন মনে হয়তো সেই সব বিচিত্রানুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে ফেলেছি। বলে ফেলেছি, বিশ্বাস করুন, অনেক অচ্ছা অচ্ছা গাইয়েদের চাইতেও ভাল গাইব আমি, আমার গান যদি আপনাদের ভাল না লাগে তা হলে উঠিয়ে দেবেন। এমনি ধরনের কত অনুরোধ করেছি আমি।

কেউ কেউ সে সুযোগ দিতেন না তা নয়। আবার অনেকে অনুষ্ঠানে আমাকে গাইতে দেবেন বলে বসিয়ে রেখেও শেষপর্যন্ত সুযোগ না দিয়ে অপমান করেছেন। মনে পড়ে। আজ স্পষ্ট মনে পড়ে—সব গণ্যমান্য কণ্ঠশিল্পীরা পর পর প্রোগ্রাম সেরে চলে যেতেন, আর আমি গান শোনাবার একরাশ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নেপথ্যে প্রতীক্ষা করতাম। এসব আমার তখন অপমান বলে মনে হত। আজ মনে হয় সেটাই ছিল আমার প্রতি তাদের শুভেচ্ছা—অনুপ্রেরণা। এই সব ভেবেই সেদিন নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম। তখন ভাবতাম, নতুনের জীবনে এ সব ঘটনা ঘটেই, তাতে আর ব্যথিত হলে চলে না। ভেঙে পড়া উচিত নয়। নিরাশ হওয়া অন্যায়।

আমি নিরাশ হতাম না, কিছু মনে করতাম না। আমার মন বলে বস্তুটা তখন মরতে বসেছে। এই পতনের পর পতনের আঘাতে ভারাক্রান্ত নিজেকে

শহরের কোলাহল থেকে সরিয়ে নিয়ে একদিন চলে গিয়েছিলাম শহরের বাইরে। অনেক দূরে। হাঁটতে হাঁটতে ভাবনার জাল বুনতে বুনতে চলে গিয়েছিলাম একেবারে গঙ্গাতীরে। বসে আছি। বসে আছি স্রোতস্বিনী গঙ্গার বুকে দৃষ্টি রেখে। সামনে বড় বড় জাহাজের পর জাহাজ ভাসছে। মাথার ওপরকার বিরাট নীল আকাশটা যেন আমাকে দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসছে।

আমি দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছি। একটার পর একটা ঘটনা মনের পর্দায় আসছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। দিদি, সংসারের অনটন, গৌরী, আমার স্বপ্ন এই সবেরই পুনরাবৃত্তি।

আবার গৌরীকে বড় বেশী করে মনে পড়ল। ওকে দেখতে ইচ্ছে করল আমার। সে ইচ্ছে অনেক চেষ্টা করেও দমন করতে পারছিলাম না বাড়ি ফিরে এলাম! সারারাত প্রায় গৌরীকে ভাবলাম আমি।

পরদিন স্কুল বসবার অনেক আগেই ওর স্কুলের কাছে চলে এলাম ওকে দেখব বলে। সোজা এসে দাঁড়ালাম রমেশ মিত্র গার্লস স্কুলের কাছে। গৌরীকে দেখতে পাওয়া যাবে অথচ নির্জন—এমন একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। যথাসময়ে গৌরী এল। দূর থেকে ওকে দেখে এক তীব্র অনুভূতি খেলে গেল আমার মধ্যে।

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম গৌরীর সঙ্গে তাদের দারোয়ান। গৌরীর বডি গার্ড। ওর কাছে যাবার মত সাহস নেই আমার। লোকটির ওপর আমার ভীষণ রাগ হল। দূরে দাঁড়িয়েই আমি অস্থির হয়ে পড়ছি। গৌরী আমাকে দেখতে পেয়েছিল। চোখের ইশারায় কথা বলেছিল। ওর সেদিনকার সেই দু'চোখের ভাষা মুহূর্তে যে কেমন করে বুঝে ফেলেছিলাম আজ আর তা ব্যাখ্যা করতে পারব না। চোখের ভাষায় গৌরী আমাকে ছুটির সময় আসতে বলেছিল বুঝলাম। আবার এলাম। গৌরীর ছুটি হবার বেশ খানিকক্ষণ আগেই আবার এসে দাঁড়ালাম স্কুলের সামনে।

ক্লাশে বসে গৌরী আমার কথা ভেবেছিল নিশ্চয়ই, গভীরভাবে সে আমাকে কল্পনা করেছিল বোধ হয়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সে আমাকে ভালবেসেছিল ঠিক, তাকে আমি যেমন করে ভালবেসেছিলাম।

ছুটির পর সেই বডি গার্ডের চোখ এড়িয়ে গৌরী আমার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ছোট্ট করে চাপা স্বরে বলে গেল, তুমি বাড়ি যাও, আমি দেখা করব তোমাদের বাড়িতে।

আমি হারলাম না। জিতলাম।

কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় যখন কেউ জিতে যায়, ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনের যা অবস্থা হয় আমারও ঠিক তেমনি হ'ল। আমি রীতিমত খুশিতে টলমল করে উঠলাম।

আমার এতটা খুশী হবার কারণ গৌরীর অকস্মাৎ আমাকে তুমি সম্বোধন।

অবিশ্বাস্য এই সম্বোধনে আমি যেন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেলাম। সব কাজেই যেন আমার উৎসাহ বেড়ে গেল। সেদিন সেই খুশির আমেজ নিয়েই আমি সরাসরি চলে এলাম আমাদের পাড়ার ক্লাবে।

এ সেই আমার সুহৃদ সমাজ নয়। এ সেই আমার যাত্রা শেখার প্রথম আঙ্গিনা নয়। এ আমাদের নিজেদের গড়া শখের থিয়েটার ক্লাব। আমাদের লুনার ক্লাব।

ইতিমধ্যে আমি আমাদের গড়া এই লুনার ক্লাবের পক্ষ থেকে অনেক অভিনয় করেছিলাম।

শৌখিন অভিনেতা হিসাবে তখন ভবানীপুর এলাকায় আমার নামডাকও হয়েছিল। দু'চারজন লোক আমার সঙ্গে কথা বলতেন ডেকে। কথা বলতেন আমার থিয়েটার প্রসঙ্গে। ছোটরা আঙুল দিয়ে দেখাত। আমি তখন কর্ণার্জুনের 'কৃষ্ণ,' সাজাহানের 'দিলদার,' দুই পুরুষের 'নুশোভন,' চরিত্রে অভিনয় করে ওদের কাছে রীতিমত পরিচিত হয়ে পড়েছি।

ওরা যখন রীতিমত কৌতূহলী হয়ে আমাকে দেখত, তখন যেন গর্বে আমার বুক ফুলে উঠত। তখনই আমার মনে পড়ত আমার রূপালী পর্দার অভিনেতাদের। পাড়ার ওদের কাছে আমি খ্যাতিমান, আমার কাছে তেমনি তখনকার সিনেমার অভিনেতারা শ্রদ্ধার পাত্র। মনে মনে ভাবতাম কবে যে আমি ওদের মত সিনেমার পর্দায় অভিনয় করব! ভাবনা আমার জটিল থেকে জটিলতর হ'তে লাগল।

আমার বড়মামার মত মানুষ আমি কখনও দেখিনি। সাদাসিধে সহজ একটি মানুষ। খাঁটি একজন সন্ন্যাসী যেন। একরাশ অশান্তির পোকা যখন আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে ঠিক তখনই মনে হ'ত যাই বড় মামার কাছে। বড় মামার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। বেশী কথা বলতেন না।

হুট্‌ করে কারও সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী যখন করে বসতেন তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যেত। মাঝে মাঝে ভাবতাম বড় মামার কাছে গিয়ে হাতটা দেখাই। কিন্তু আমাকে আর যেতে হ'ল না। একদিন সকালে ভবানীপুরের বাড়ির ভিতরকার একফালি আঙ্গিনায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফুলের গাছ পুঁতছিলাম। আমার মনের ভেতরে নানা কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল। তখন আমি

চাকরি করছি। সেই চাকরি-জীবনের কথাও ভাবছিলাম। এমন সময় আমাদের বাড়ীতে এলেন বড়মামা।

আমার বড় মামার নাম ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আপন মনে কাজ করছি, এমন সময় আমার পিছনে দাঁড়িয়ে বড়মামা বললেন, কি ভাবছিস রে?

মামার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম। পিছনে ফিরে বড়মামার দিকে তাকিয়ে হাসলাম, ম্লান হাসি।

কি জানি কেন কি ভেবে বড়মামা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হুড়মুড় করে বলে বসলেন—দেখ, এই মুহূর্তে তুই যা ভাবছিস আমি বলে দিলুম তুই ঠিক তাই পাবি। ও চাকরি তোর গেল বলে, অত ভবছিস কেন?

তারপর মাকে ডেকে বললেন, তোর ছেলে চাকরি করবে ভাবছিস? করবে না, চাকরিটা ও ছেড়ে দিল বলে—

তখন বড়মামার এই কথাটাকে আমার কিন্তু অশুভ বলেই মনে হয়েছিল। চাকরি চলে যাবে, কথাটা যেন ভাবতেই পারছিলাম না। বড়মামা যেন আমাকে আর এক নতুন ভাবনার আবর্তে ফেলে দিলেন।

বড়মামা যখন যা উক্তি করতেন পরক্ষণে আর তা মনে রাখতে পারতেন না। যখন আমি প্রতিষ্ঠা পেলাম আমার এই জগতে, যখন চাকরিটা সত্যিই আমি ছাড়তে বাধ্য হলাম, তখন একবার বড়মামাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই প্রসঙ্গে। তখন তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, তাই নাকি? এমন কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলুম নাকি আমি? তা হবে।

আমাদের বাড়ির নীচের তলায় থাকতেন গণেশদা।

অমায়িক এক ভদ্রলোক। মাঝে মাঝে সিরিয়াস। অত্যন্ত সিরিয়াস মানুষ। সিরিয়াস তিনি তাঁর নাট্যকে জীবনে। তখন বেতার বাড়ি ছিল গার্স্টিন প্লেসে। সেই বেতার বাড়ির নাটকের নিয়মিত অভিনেতা ছিলেন গণেশদা। গণেশ ব্যানার্জি। পুরোদস্তুর একজন নাট্যকে লোক। পাড়াতে আমাদের যে শৌখীন দল ছিল শুধু সেখানে নয়, পাড়ায় অন্যত্রও যদি নাটক করতেন তখনই গণেশদাকে ডাকা হ'ত। মাঝে মধ্যে গণেশদা আমাদের সঙ্গেও অভিনয় করতেন। যেদিন রিহার্সাল থাকত না সেদিন গণেশদা আমাদের ক্লাবে গিয়ে জাঁকিয়ে বসতেন। খোস মেজাজে গল্প করার স্বভাব ছিল তাঁর। তখনকার দিনের বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে গল্প করতেন। আমিও গণেশদার পাশে বসে সেই সব গল্প শুনতাম, হজম করতাম।

সেই সময়ে মাঝে মাঝেই গণেশদার কাছে আসতেন ভোলাবাবু। ভোলা

আড্ডা। এই নামটা তখন আমি প্রায়ই শুনতাম। প্রযোজক ভোলাবাবু গণেশদার বন্ধু হিসেবেই আসতেন। যেদিন ভোলাবাবুর সঙ্গে আলাপ সেদিন থেকে তাঁকে যেন আমি একজন বিশেষ মানুষ হিসেবে ধরেই নিয়েছিলুম। শুনলাম, 'মায়াডোর' নামে একটা হিন্দী ছবি তৈরি করবেন ভোলাবাবু। কথাটা কানে যেতেই মনের আশাকে ব্যক্ত করার জন্য আমি শুধু অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। অথচ কথাটা কিছুতেই গণেশদাকে খুলে বলতে পারছিলাম না। নিজের মনের সঙ্গে নিজেই যেন যুদ্ধ করে চলেছি।

এমন সময় গণেশদা একদিন ক্লাবে এলেন। একে একে সকলেই ক্লাবে এল। দেখতে দেখতে ক্লাব জমজমাট হয়ে গেল। গণেশদা সবাইকে শুনিয়ে বেশ দম্ভের সঙ্গে বললেন, শোন একটা গুড নিউজ—

আমরা তো প্রত্যেকেই উদ্‌গ্রীব। গণেশদাও যেন কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে আমাদের খেলাতে লাগলেন।

আমরা বললাম, কি হ'ল গণেশদা, বলুন গুড নিউজটা কি?

গণেশদা হাঁটু নাচিয়ে, কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য বজায় রেখে, দু'চারবার গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, শোন তোমরা, আমি সিনেমায় নামছি; আজ সব কথা পাকাপাকি হয়ে গেল—তারপর সবিস্তারে বললেন গণেশ ব্যানার্জি।

ভোলা আড্ডোর 'মায়াডোর' ছবিতে একটা ছোট রোল পেয়েছেন গণেশদা। খবরটা শুনেই আমি কেমন যেন মুষড়ে গেলাম। সেদিন আর রিহার্সালে যেন কিছুতেই মন বসাতে পারছিলাম না। নিজেকে যেন কিছুতেই সহজ সংযত করতে পারছিলাম না। অবশেষে এক সময়ে চুপি চুপি গণেশদাকে বলেই ফেললাম গণেশদা, একটা কথা বলব?

গণেশদা তখন যেন অন্য এক ভাবরাজ্যে বিচরণ করছেন। মহাখুশি তিনি। বেশ উৎফুল্লিত ভাবেই বললেন, বল কি বলবি—

আমি দ্বিধাজড়িত স্বরে বললাম, তুমি সিনেমায় নেমেছ, আমার একটা চান্স হবে না? একটু চেষ্টা করে দেখ না গণেশদা—

গণেশদা তখন অন্য ভাবরাজ্যের মানুষ। গণেশদার চোখে-মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম। কি ভাবলেন জানি না। সেই আগের মত খুশি খুশি মন নিয়েই বললেন, তুই পার্ট করবি? চেষ্টা করলেই হবে কিনা জানি না, তবে তুই যখন বলছিস একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। তুই এক কাজ কর, কালই তুই ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে চলে আয়, আমি থাকব, দেখি কি করা যায়—

তারপর থেকে পোর্ট কমিশনার্সের চাকরিতে ফাঁকির মাত্রা বেড়ে গেল। একদিকে তালি দিতে গেলে অন্যদিকে ছিঁড়ে যাওয়া গোছের অবস্থা তখন

আমার। তবুও 'যায় যাবে প্রাণ যাক না কেন যদি হরি পাই' ভেবেই পরদিন আবার অফিস কামাই করলাম। সোজা চলে এলাম ট্রাম-স্টপেজে। ট্রাম থেকে প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের মুখে নেমে এক নতুন আশায় ভরা মন নিয়ে এগিয়ে গেলাম। এলাম ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে। এখন যেখানে নতুন সিনেমা হাউস 'নবীনা', সেই জায়গাটায় ছিল ভারতলক্ষ্মী স্টুডিও।

গেটের কাছে আসতেই দারোয়ান বাধা দিল। আমি সব কথা ওকে বুঝিয়ে বললাম। সে তখন দয়া করে আমাকে স্টুডিওতে ঢোকার অনুমতি দিল। আমি দুরু দুরু বুকে ভিতরে ঢুকে গেলাম। থাক সে কথা।

গণেশদা আমাকে সিনেমায় নামার সুযোগ দেবেন জানতে পেরে আমি আনন্দের আতিশয্যে ছুটে গেলাম মায়ের কাছে। মাকে খবরটা দেওয়া দরকার। প্রণাম করলাম মাকে। অসময়ে প্রণাম।

মা বিস্ময়-ভরা চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। আমি বললাম, মা, আমি সিনেমায় অভিনয় করব, তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর মা—

মা আমাকে আশীর্বাদ করলেন।

সেই মুহূর্তে গৌরীর কথা আমার বড় বেশী করে মনে পড়তে লাগল। মনে হ'ল এ ব্যাপারে গৌরীর কাছ থেকেও অনুমতি নেওয়া দরকার। আমি অনেক ভেবে পরদিনই আবার গেলাম রমেশ মিত্র গার্লস স্কুলের সামনে। গৌরীর সঙ্গে দেখা হতে সে আগের মতই চুপি চুপি বলল, তুমি বাড়ি যাও, আমি তোমাদের বাড়িতে আজ যাব—

তখন আর বেশী কথা হ'ল না। আমি ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। অপেক্ষায় রইলাম গৌরী আসবে। আমার দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

গৌরী সেদিন কথা রেখেছিল। সোজা চলে এসেছিল আমার কাছে। কাছে এসে লজ্জাবনত মুখে দাঁড়াল।

আমি আস্তে করে বললাম, গৌরী তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে—

গৌরী বলল, বল—

আমার প্রতি তার কতখানি আন্তরিকতা তা শুধু এইটুকু 'বল', 'তুমি' সম্বোধনের মধ্যে প্রকাশ পেল।

বললাম, আমি সিনেমায় নামছি, তোমার মত কি গৌরী ?

বড় বড় ছটো চোখ আমার চোখের ওপর রেখে বলল, বেশ তো, এতে আবার আমার মতামত কি ?

সেই মুহূর্তে কোন লজ্জা আমাকে ভর করেনি। কোন সঙ্কোচ বোধ করিনি। আবার বললাম, গৌরী বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে ভালবাসি, আর

ভালবাসি বলেই তোমার মতামত আমার একান্ত দরকার—

গৌরী হাসল। প্রাণখোলা মিষ্টি হাসি। সে হাসি উচ্ছ্বাসের হাসি নয়। হাসতে হাসতে বলল, তুমি সিনেমায় নামলে আমি খুশী হব বেশী—

তখনই আবার আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠল বড়মামার মুখটা। মনে পড়ল তাঁর আশীর্বাণী। একটু একটু করে যেন সত্য হয়ে যাচ্ছে আমার বড় মামার উক্তি। আমার স্বপ্ন যেন সার্থক হতে চলেছে।

তারপরই আমি ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওর নতুন আঙ্গিনায় এসে হাজির হলাম। কথার খেলাপ কখনই করেন না গণেশদা। আগেই বলেছি, অত্যন্ত সিরিয়াস টাইপের মানুষ তিনি। আমার স্টুডিওতে যাবার আগেই ভোলা-বাবুকে বলে বোধ করি সব ব্যবস্থাই পাকা করে রেখেছিলেন তিনি। আমি স্টুডিওতে ঢুকতেই গণেশদার সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি আমাকে নিয়ে ফ্লোরে ঢুকলেন। এ যেন আমার অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার এক নতুন অভিযান শুরু হয়ে গেল। এ যেন আমার নতুন তীর্থদর্শন। এই আমার প্রথম ফ্লোরে ঢোকার দিন। আমার সারা মনে নতুন আনন্দের জোয়ার বইছে।

গণেশদার সঙ্গে নির্ভয়ে ফ্লোরে গেলাম। একটা হলঘরের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ ঝকঝকে বাড়ি। সেদিন এ সব ছিল আমার চোখে বিস্ময়। বাড়িটা আর তাকে ঘিরে অনেকগুলি মানুষের কর্মচঞ্চলতা আমাকে অভিভূত করল। এ বাড়িটা একটা বিয়েবাড়ি তা বোঝা গেল। বিয়েবাড়ির সেট্। আমি সাগ্রহে সব দেখছিলাম। ওদিকে গণেশদা ঘুরছেন-ফিরছেন আর আমাকে অভয় দিয়ে চলেছেন। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটল।

এমন সময় সেই ছবির ডিরেক্টর আমার কাছে এলেন। গণেশদা পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার সঙ্গে। তিনি আমার আপাদমস্তক একবার ভাল করে দেখলেন। তারপর গণেশদার উদ্দেশে বললেন, চলবে বলেই তো মনে হচ্ছে।

আমার বুকের মধ্যে তখন এক অজানা অনুভূতির কাঁপুনি শুরু হয়ে গিয়েছে। একটা দুর্বলতা আমাকে যেন ভর করেছে। পরিচালক মশাই কণ্ঠস্বর উঁচু করে কাকে যেন বললেন, একে নিয়ে যাও মেক-আপ রুমে।

আমার অবস্থা তখন হাড়িকাঠের বলির পাঁঠার মত। আমি একবার গণেশদার দিকে আর একবার পরিচালক মশাইয়ের দিকে তাকালাম। নিতান্ত অসহায় ভাবে আমার তাকানো। তারপর পরিচালকের নির্দেশমত চলে গেলাম মেক-আপ রুমে।

সব মনে আছে আমার। স্পষ্ট মনে পড়ছে মেক-আপ রুমে নিয়ে গিয়ে বর সাজিয়ে দেওয়া হল আমাকে। নতুন বর। আমি সাজা বর হয়ে আবার

ফিরে এলাম ফ্লোরে। পরিচালক মশাই আমাকে দৃশ্যটা বুঝিয়ে দিতে এগিয়ে এলেন। বেশ গম্ভীর স্বরে বললেন, তুমি বিয়ে করতে এসেছ। তোমাকে মেরে ভাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভাল করে বুঝে নাও, কেমন ?

মনোযোগ সহকারে, গভীর মনোনিবেশে আমি বুঝে নিলাম। বুঝলাম আমাকে মেরে ভাগিয়ে দেওয়া হবে। শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, ওরা আমাকে খুব জোরে মারবে না তো ?

কথা শুনে সকলে সমস্বরে হেসে উঠলেন। আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। পরিচালক মশাই হাসতে হাসতেই বললেন, না না, এটা বাস্তব নয়, একে বলে সিনেমার মার।

আমি যথারীতি শুটিং স্পটে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে ঘিরে আলো ঝলমল করে উঠল। ক্যামেরা প্রস্তুত হ'ল। আমি সেই দৃশ্যে পরিচালকের নির্দেশ মতই কাজ করলাম। সেই দিনই আমার আশৈশব কালের স্বপ্ন যেন বাস্তবের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। সেই আমার প্রথম সিনেমায় অভিনয় করা।

কাজটা একদিনেই শেষ হয়ে গেল না। পর পর পাঁচদিন আমাকে শুটিং-এ আসতে হ'ল। আর এই ক'টা দিন আমি আমার মাস মাইনের অফিসটা নির্দ্বিধায় কামাই করে ফেললাম।

মনে আছে দৈনিক পাঁচ সিকি পারিশ্রমিক নিয়ে আমি সিনেমার অভিনেতা বনে গেলাম। একষ্ট্রার মর্যাদাসম্পন্ন একজন অভিনেতা। সেদিন সেই ছিল আমার গর্ব। আজও তাই যাঁরা ছবির পর্দায় নামমাত্র অংশগ্রহণ করেন তাঁদের আমি আমার অন্তর দিয়ে ভালবাসি। আমি যেন ওঁদের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাই। আমি যে সিনেমায় নেমেছি সেই কথা জানলাম একমাত্র আমি আর গণেশদা এবং সেই ছবির সঙ্গে জড়িত কলাকুশলীরা।

দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য আমার তা জানি না, সেই হিন্দী 'মায়াডোর' ছবি মুক্তি পায়নি আজও। অথচ 'মায়াডোর' ছবিতে অভিনয় করার পর থেকে আমি প্রতিদিনই একরাশ আশা নিয়ে প্রতীক্ষা করেছি রূপালী পর্দায় নিজেকে দেখব বলে। একদিকে প্রতীক্ষা করে চলেছি 'মায়াডোরে'র মুক্তিলগ্নের জন্যে অন্যদিকে আবার আগের আমি বনে গেছি।

এই ছবিতে অংশ নেবার বা সুযোগ পাবার পর থেকে আমার নেশা যেন আরও বেড়ে গেল। মাথার ভিতরে শুধু ঐ একই চিন্তা। আমি যেন সিনেমা-অভিনেতা হবার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষায় মরিয়া হয়ে গেলাম। এ যেন নিভে যাবার আগে দপ করে আবার জ্বলে ওঠা। এ যেন হারিয়ে যাবার আগে নিজেকে শেষবারের মত একবার দেখে নেওয়া।

সিনেমা জগতে আর আমার কাজ নেই। কাজ আছে শুধু পোর্ট কমিশনার্সের অফিসে। আবার শুরু করে দিলাম আমি আমার সেই পুরোনো দশটা-পাঁচটা। সেই বাড়ি-চাকরি-ক্লাব, আবার বাড়ি—আবার চাকরি—আবার—আমি যেন চক্রাকারে শুধু ঘুরে চলেছি। ভাল লাগে না। কোন কাজেই যেন মন বসাতে পারি না। তখন আর এক নতুন চিন্তা আমার। চিন্তা সেই 'মায়াডোর' নিয়ে। কবে মুক্তি পাবে! কবে রূপালী পর্দায় আমি আমাকে দেখতে পাব শুধু সেই চিন্তার একঘেয়েমি। আমার শুধু অপেক্ষা করে থাকা। একটা অস্বস্তির অবস্থা। একরাশ অশান্তির পোকা যেন আমার মাথাটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

ঠিক এমন সময় একদিন মার্দান পার্কে পাশ দিয়ে বল খেলে ফিরছি হঠাৎ একেবারে সামনাসামনি ধীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা।

থিয়েটার, সিনেমা, যাত্রায় ড্রেস সাপ্লাই করেন ধীরেনবাবু। আমি থিয়েটার করি বলেই তাঁর সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয় ছিল। দেখা হতেই ধীরেনবাবু সরাসরি আমাকে প্রশ্ন করলেন, এই যে, কেমন আছ?

বিরক্তিসূচক অভিব্যক্তি নিয়েই বলেছিলাম, আছি ভালই।

কথাটা বলে ধীরেনবাবুকে উপেক্ষা করেই চলে আসছিলাম, হঠাৎ আমার মনে হ'ল ধীরেনবাবুকে একবার টোকা মেরে দেখলে কেমন হয়। ভাবলাম ওঁর তো সিনেমা মহলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

কথাটা আর আমাকে বলতে হ'ল না। আমার মুখে ভাষা ফোটার আগেই ধীরেনবাবু বললেন, শোন, তুমি সিনেমায় অভিনয় করবে?

এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি! কথাটা শুনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়ে গেলাম। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে বললাম, কি বই?

ধীরেনবাবু হাঁটতে শুরু করলেন। আমিও তাঁর পাশে পাশে চলতে লাগলাম। ধীরেনবাবু চলতে চলতেই বললেন, ছবিটার নাম 'দৃষ্টিদান'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দৃষ্টিদান'। এস. বি. প্রোডাকসন্সের ছবি। পার্টটা ছোট, যদি রাজী থাক তো বল—

সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হলাম! আবার সেই একচান্স। বললাম, নিশ্চয়ই করব, আপনি দয়া করে একটু ভালভাবে চেষ্টা করবেন তো?

ধীরেনবাবু সহাস্যে আমাকে দেখা করতে বলে চলে গেলেন। আমি বেশ খুশি-খুশি ভাব নিয়েই বাড়ী ফিরলাম।

দেশের রাজনৈতিক তপ্ত আবহাওয়ার ভেতর দিয়ে তখনও আমরা এগিয়ে চলেছি। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে আমাদের চারদিকে সন্ত্রাস। পরাধীনতার

নাগপাশ থেকে ভারতকে মুক্ত করবার জন্ম জননেতারা তখন মরিয়া। সবারই মাতৃমুক্তিপণ। অশান্তির শেষ নেই। গোটা শহর জুড়ে আজ বিক্ষোভ, কাল হরতাল। চারিদিকে কেমন যেন একটা চাপা আগুন। আগস্ট মাসে সেই আগুন যেন বাড়তে থাকল। বৃটেনের ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এসেছে, ভারতের স্বায়ত্বশাসনে সাড়া দিয়ে। তাদের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলীম লীগের প্রাদেশিক শাখা কোলকাতা শুধু নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গে হরতাল ডাকল। হরতাল মোটামুটি সার্থক হলো বটে, কিন্তু ষোলই আগস্ট কোলকাতায় দাঙ্গা শুরু হ'ল দুপুর বেলা থেকে। দেখতে দেখতে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক। চারিদিকে শুধু খুন আর খুন। শহরের পথে পথে শুধু মানুষের রক্তের নদী। আকাশে শকুন। গোটা শহরটা স্তব্ধ। আমরা বাড়ি থেকে বেরুতে পারছি না কেউ। সিনেমা-থিয়েটার বন্ধ। আমরা পাড়ার বন্ধুরা এই হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সময় কোমর বেঁধে রিলিফের কাজে নেমে পড়লাম। আমরা অনেক মানুষকে তখন নানাভাবে সাহায্য করেছি।

মাস খানেক পর দাঙ্গা অনেকটা স্তিমিত হলো বটে কিন্তু তবুও আতঙ্ক মুছে গেল না। হিন্দু-মুসলমান কেউ সহজ হতে পারছে না। ১৯৪৬ সাল গেল।

চলে গেল ১৬ই আগস্টের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ইতিহাসের পাতায় রক্তের আলপনা এঁকে রেখে!

১৯৪৭ সাল এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে আর এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে আমার প্রিয় গায়ক সায়গল মারা গেলো! এই সালের ২৬শে মার্চ থেকে আবার হিন্দু-মুসলমানের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা আরম্ভ হলো। চতুর্দিকে শুধু মৃতদেহ। সে এক রোমহর্ষক ব্যাপার। মে' মাসে বেলেঘাটা-তালতলা অঞ্চল মিলিটারী নিয়ে নিল।

এল সেই দিন। কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন হারিয়ে গেল। ৩রা জুন বৃটেন ঘোষণা করল, ভারত আর পাকিস্থানের স্বায়ত্ব শাসনের কথা। ভারত দ্বিখণ্ডিত হলো, আর ২০শে জুন বাংলাও দ্বিখণ্ডিত হলো। ভারতবাসীর সেই চরম দুঃখের দিন, আমরা দু'চোখে দেখলাম। সে এক চরম মানসিক অস্থিরতা-অসুস্থতা আমাদের।

এর মধ্যে আমরা আবার রিলিফ দিলাম। খিচুড়ী রান্না করে আমরা খাওয়াতাম। তার মধ্যে আমার রক্তে আগুন জ্বলত। একদিন একটি গান

লিখলাম আমি। সেই গান আমরা গেয়ে গেয়ে পাড়া পরিক্রমা করলাম। সেই গানের সুরও দিয়েছিলাম আমি। পরে সেই গান অনেক জায়গায় আমাকে শোনাতে হতো।

হিন্দুস্থান মে কেয়া হায় তুমারা
ও বৃটিশ বেচারা
আভি চলি যাও ইংল্যাণ্ড বাজা কর ব্যাণ্ড
মন্দির মসজিদ মে পূজা আরতি
মসজিদ মে শুনো আজান পুকাতি
দিলকে দিলাও দিল হিন্দু মুসলমান
সারি হিন্দুস্থান মে আয়ি তুফান
গরীবোকে ছুখো কি হোগি আসান।*

সেই তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যেই 'মায়ডোর' ছবির শুটিং হয়েছিল বা আগে বলা হয়নি। তারপর এল ১৫ই আগস্ট।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট—এই রক্তবর্ণ তারিখটি আমাদের এনে দিল শান্তি আর স্বস্তি! ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল। আমরা স্বাধীনতা পেলাম।

তবে ১লা সেপ্টেম্বর আবার নতুন করে দাঙ্গা আরম্ভ হলো। স্বাধীনতার পরেও দাঙ্গা। সেই দিনগুলোও কাটিয়ে উঠলাম।

১১ই ডিসেম্বর প্রখ্যাত অভিনেতা দেবী মুখার্জী মারা গেলেন শুনতে পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

এর মধ্যে আমার অভিযান কিন্তু থেমে থাকেনি। আমি যথাসময়ে যথারীতি ধীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি এতটুকু বিলম্ব না করে নীতিনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন।

নীতিনবাবু পরিচালক হিসেবে তখন আমার কাছে খুবই পরিচিত। পরিচিত হবার পর নীতিন বসু আমাকে সুযোগ দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা প্রকাশ করলেন না। 'দৃষ্টিদান' ছবিতে আবার আমি আমার স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার সুযোগ পেলাম।

পোর্ট কমিশনার্সের চাকরিটাই আমার একমাত্র সম্বল জেনেও আমি যেন তার সঙ্গে দিনের পর দিন অন্যায়ের মাত্রা বাড়িয়েই চললাম।

বেশ কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে আমি 'দৃষ্টিদান' ছবিতে শুটিং শুরু করে দিলাম। অসিতবরণ ছিলেন এ ছবির নায়ক। তাঁরই ছোটবেলাকার চরিত্রে আমাকে অভিনয় করার সুযোগ দিলেন নীতিন বসু। মনে আছে সেই ছবির

*উত্তমবাবুর বাল্যবন্ধু ডাঃ লালমোহন মুখার্জীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

AMARBOI.COM

নায়িকা ছিলেন সুনন্দা দেবী। আরও মনে আছে তাঁর ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আজকের নাট্যজগতের স্বনামধন্যা অভিনেত্রী কেতকী দত্ত।

মনে পড়ছে। এক এক করে সব মনে পড়ছে আমার। স্মৃতির অতল গহ্বর থেকে আমি আমার হারানো অতীত-মুক্তা একটা একটা করে বেছে তুলছি।

মনে পড়ে 'দৃষ্টিদান' ছবিতে আমার পারিশ্রমিক ঠিক হয়েছিল সাতাশ টাকার মত। তবে পুরো সাতাশ টাকাও আমি পাইনি। মনে আছে সুযোগের খেসারত দিতে হয়েছিল আমাকে। কমিশন দিতে হয়েছিল আমার পারিশ্রমিক থেকে। সব বাদ দিয়ে সেদিন আমি পেয়েছিলাম সাড়ে তেরো টাকার মত। এতে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ছিল না। আমি তখন পারিশ্রমিকের চাইতে সুযোগ পাবার ব্যাপারটাকে প্রাধান্য দিয়েছি বেশী।

এরপর এল ১৯৪৮ সাল।

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে মারা গেলেন। এদিকে ১৯শে এপ্রিল তারাসুন্দরীর মত নাট্যসম্রাজ্ঞী মারা গেলেন। তারপরই মারা গেলেন ডিসেম্বর মাসে কুসুমকুমারীর মত পুরনো দিনের প্রখ্যাত অভিনেত্রী। এই সব ঘটনা আমার মনকে ভেঙে দিয়েছিল তবুও—

তখন আমরা সহজ জীবনের মধ্যে চলে এসেছি। গোটা ভারতবর্ষ তখন স্বাভাবিক বাতাস উপভোগ করছে। মনের আকাশ তখন মেঘমুক্ত। এমন সময় আমি আমার স্বপ্নের সার্থক রূপ দেখলাম।

'দৃষ্টিদান' মুক্তি পেল। আমি এক মহা আনন্দে ভরে গেলাম। তবুও তারই পাশাপাশি আর এক হতাশার আঘাতে আমি রীতিমত কাতর হয়ে পড়েছি।

কাগজের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন বেরুল 'দৃষ্টিদানে'র। আমি প্রত্যাশা করেছিলাম যে কাগজের পৃষ্ঠায় ছাপার অক্ষরে হয়তো আমি আমার নামটা দেখতে পাব। প্রত্যাশা মিটল না। প্রত্যাশা মিটবার মত কোন কাজ তো আমি করিনি। এই বলে আমি মনকে প্রবোধ দিলাম।

অনেকগুলো বছর কেটে গেল।

আশা-আকাঙ্ক্ষার একটার পর একটা বন্ধুর পথ পেরিয়ে আমিও এগিয়ে যেতে লাগলাম। গৌরী তখন তার ভালবাসা দিয়ে, অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাকে যে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকল, পার হয়ে যেতে লাগলাম একটার পর একটা চড়াই উৎরাই।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা দুজনে দুজনার সঙ্গে দেখা করি, গল্প করি, কত পথের পর পথ চলি। আবার ফিরে আসি। ১৯৪৮ সালের দিনগুলো ঠিক এমনি করেই চলতে লাগল।

'দৃষ্টিদান' তখন চলছে। এমন সময় আমার জীবনে এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগের পূর্বাভাস দেখা দিল। গৌরী আসছে না। আসা বন্ধ করেছে গৌরী।

তার আকস্মিক অন্তর্ধানে আমি যেন সেদিন একটু বেশীমাত্রায় মুষড়ে গিয়েছিলাম। ভেবে রেখেছিলাম গৌরীকে সঙ্গে নিয়ে দুজনে ছবি দেখে আসব। হ'ল না। আশাহত হলাম। দিন তিনেক অপেক্ষা করবার পর ভাবলাম আবার অন্নপূর্ণাকে ডেকে আসল কারণটা কি জেনে নেব। অন্নপূর্ণার দ্বারস্থ হবার আগেই শুনলাম, গৌরী নিতান্ত ছেলেমানুষের মত একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে তার বাড়িতে। সব কিছু শুনে ভীষণ রাগ হ'ল গৌরীর ওপর। এমন করে মনের সত্যকে এত দ্রুত প্রকাশ করতে কে বলেছিল তাকে!

শুনলাম 'দৃষ্টিদান' দেখতে গিয়েই সেই অঘটন ঘটিয়েছে গৌরী। ছবি দেখতে গিয়েছিল ঠাকুরমার সঙ্গে। ছবি তখন চলছিল। ঠাকুরমা ঠাট্টার সুরে বলেছিলেন ছবির পর্দায় কয়েকজন শিল্পীকে দেখিয়ে, হ্যাঁ রে, দেখ তো ওদের মধ্যে তোর কাউকে মনে ধরে কিনা, কাকে তোর পছন্দ—

এ যেন কেঁচো খুঁড়তে সাপ! অবশ্য আসলে যা বেরিয়ে পড়ল তা সাপ নয়, সত্য। তার গায়ে খোঁচা দিলে সে তো ফোঁস করে উঠবেই। গৌরীও সত্য। গৌরী সরল। তাকে প্রকাশ করলে ক্ষতি কি? এই ভাব নিয়ে ঠাকুমার ঠাট্টার জবাবে রূপালী পর্দার বুকে আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল গৌরী।

ঠাকুরমা ভাবলেন ঠাট্টার জবাবে ঠাট্টা। তিনি রীতিমত বিস্মিত। এত ছেলে থাকতে ঐ রোগাটে ছেলেটা! ব্যাপারটা যাচাই করবার জন্য তিনি আবার বলেছিলেন, ও মা! ওই রোগা ফিনফিনে ছেলেটাকে তোর মনে ধরল কি রে!

সেই মুহূর্তে সে কথার প্রত্যুত্তরে গৌরী কি বলেছিল আমি জানি না। তবে পরক্ষণে ঠাকুমা গৌরীর সেই ইঙ্গিতকে নিছক ঠাট্টা বলে ধরে নিতে পারেননি। পরদিন থেকে তাই তিনি গৌরীকে সব সময় নজরে নজরে রেখেছিলেন।

সত্যি তো! মেয়ে তো মিথ্যে বলেনি দেখছি! তা না হলে একটা বায়োস্কোপ-করা ছেলেকে নিয়ে এত ভাবনা কেন! মেয়ের এত মাতামাতিই বা কিসের! ঠাকুমার বড় আদুরে এই নাতনী, তবুও তিনি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বংশমর্যাদা অস্বীকার করতে পারলেন না। গৌরীর মনের ইচ্ছে তিনি বাড়ির সকলের কাছে একসময় প্রকাশ করে দিলেন। স্পষ্ট ভাষায় বললেন, দেখ বাছা, তোমাদের মেয়ের মতিগতি খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না।

তারপর সব কথা তিনি খুলে বলেছিলেন। এরপর থেকে অভিভাবকরা রীতিমত সজাগ হলেন। বাড়ির বাইরে যাবার পথ গৌরীর বন্ধ হয়ে গেল।

আমার সঙ্গে দেখা না করার এই হ'ল প্রধান কারণ। সে কারণ অবশ্য আমি অনেক পরে জেনেছিলাম।

অনেক ভেবেচিন্তে অন্নপূর্ণাকে একদিন ডেকে বললাম, তোর সেই গৌরীর কি হ'ল রে! যা না ভাই, একটু খবরটা এনে দে—

অন্নপূর্ণা যেন সত্যিই অন্নপূর্ণা। মুখ খুললেই—তথাস্তু। রাজী হয়ে গেল সে। আমাকে প্রতিশ্রুতি দিল গৌরীর খবর সে এনে দেবে। প্রতীক্ষায় রইলাম।

কথা রাখল অন্নপূর্ণা। গৌরীর বাড়ি থেকে ফিরে এসে সে সব কথা আমাকে খুলে বলল। একটু আগেই যে ঘটনা আমি শোনালাম সে সব ঘটনা আমার ঐ বোনের মুখ থেকে শোনা।

অগত্যা ধরে নিলাম গৌরীর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না।

ভীষণ উৎকণ্ঠার মধ্যে আমার দিন কাটছিল। সে যে কী তীব্র জ্বালা তা লিখে বোঝাতে পারব না। প্রকাশ্যে কারও সামনে চোখের জল ফেলিনি বটে তবে ভেতরে ভেতরে কাঁদতে আর বাকি রেখেছিলাম কোথায়!

এখন মনে হয় কত ছেলেমানুষ ছিলাম সেদিন আমি।

যত দিন যায় ততই মনের জ্বালা যেন আমার তীব্রতর হতে থাকে। বিছানায় শুয়ে যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি তখন গৌরীর ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখটা যেন আমি আমার চোখের সামনে দেখতে পাই। মনে হয় আমার কাছে ছুটে আসবার জন্য সেও যেন ঠিক আমারই মত কাতর হয়ে পড়েছে।

গৌরীকে ঘিরে আমি নানা স্বপ্ন দেখে চলেছি। কখনো মনের পর্দায় দেখেছি সে আমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে দূরে—অনেক দূরে—আর আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার নাগাল পাচ্ছি না।

এদিকে অফিসের কাজেও মন বসাতে পারছি না। তার উপরে আমার অভিনয় করার যে আগ্রহ, যে উৎসাহ, তাও যেন স্তিমিত হয়ে পড়ছে। অফিস থেকে সরাসরি বাড়ি ফেরার চেষ্টা যেটা ছিল, তাও যেন আর থাকছে না।

এই ভাবেই দিন এগিয়ে চলে। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কেরানী-জীবন অতিবাহিত করি। দিন কাটাই।

১৯৫৮ সালের প্রায় মাঝামাঝি আবার একটা সুযোগ পেলাম।

নবেন্দুসুন্দর পরিচালিত 'কামনা' ছবিতে কাজ করেছিলাম। যে কথা বলা হয়নি তা হলো এই, এই কামনা ছবিতে আমি প্রথম নায়ক আর আমার প্রথম নায়িকা (তিনিও প্রথম নায়িকা) ছবিদি। ছবি রায়। আমি প্রথম থেকেই ছবি রায়কে ছবিদি বলতাম। তিনি আমার চেয়ে বয়সে ছোট কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সিনিয়ার। তাই দিদি বলতাম তো বটেই, তবে প্রায় সকলকেই

আমি প্রধানত একটা সম্মান দেবার চেষ্টা করতাম। একদিন এই ছবির শুটিং চলাকালীন আবার একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম আমি। আমার মনটা সেদিন অপমানে কেঁদে উঠেছিল। সে যে কত বড় দুঃখ সেদিন পেয়েছিলাম তার একমাত্র সাক্ষী ছবিদি আর শেতলদার বিবেক।

আমি ইন্দ্রপুরীতে কামনার শুটিং করছি এক ফ্লোরে, অন্য ফ্লোরে দেবী চৌধুরানীর শুটিং করছিলেন শেতলদা অর্থাৎ প্রদীপকুমার। আমি তখন সম্পূর্ণ নতুন। শেতলদা তখন পুরনো।

আমি একদিন আমার ফ্লোর থেকে বেরিয়ে পাশের ফ্লোরে গেছি। সহজসরল মন আর একরাশ কৌতূহল নিয়ে গেছি। আমি নতুন গেছি পুরাতনের কাজ দেখতে। সামনে দেখি শেতলদা। এই শেতলদার সঙ্গে দু'একবার এ্যামেচার থিয়েটার করেছিলাম—সেই সূত্রে বললাম—শেতলদা কেমন আছেন?

তিনি উত্তর দিলেন না। বার বার জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বললেন, তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না, সেই মুহূর্তে লজ্জায় অপমানে আমি যেন মরমে মরে গেলাম। ফিরে এলাম সেটে। আমাকে গম্ভীর দেখে ছবিদি বার বার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম।

ছবিদি সেদিন আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—এতে দুঃখ পেতে নেই। কিছু কিছু মানুষ আছে তারা আঘাত করে। কিছু কিছু মানুষ আছে—একটু বড় হলে, নাম করলে, পয়সা হলে অতীত ভুলে যায়। আপনজনদেরও চিনতে পারে না। তুমি বড় হলে যদি আমাদের ভুলে না যাও তাই দেখ। আমি কাউকে ভুলিনি আজও। যা হোক এই ছবি রিলিজ হবার আগেই মর্যাদা ছবিতে কাজ করার সুযোগ এল। তবুও মন শান্ত হয় না।

আমি যেন তৃপ্ত হতে পারি না কিছুতেই।

১৯৫০ সালের গোড়ার দিকের একদিন সকালের ঘটনা।

অবসন্ন মন নিয়ে সেদিন আমি বাড়িতেই আছি। একলা ঘরে সেদিন কি যেন একটা বই পড়ছি। এমন সময় বুড়ো অর্থাৎ আমার ভাই তরুণ এল। তারপর সরাসরি আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি রে, আমাকে কিছু বলবি?

—দাদা, তুই একবার নীচে যা, রাজেনবাবু বসে আছেন, তোকে ডাকছেন। বলল বুড়ো।

—তুই যা, বল গিয়ে আমি আসছি। তাচ্ছিল্যভরেই কথাটা বললাম।

রাজেনবাবু আমাকে ডাকছেন এই খবরটা তখন আমাকে উৎসাহিত করতে পারেনি। নিতান্ত অনিচ্ছাভরেই আমি নীচে নেমে এলাম। বৈঠকখানা

ঘরে বসেছিলেন রাজেনবাবু, আমাদের আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে।

রাজেনবাবু শুধু আমার বাবার বন্ধু নন, ছবির একজন পরিচালকও বটে। বৈঠকখানায় ঢুকেই আমি নমস্কার করলাম।

রাজেনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, কেমন আছ?

ইতিমধ্যে আমি অনেকটা সহজ হয়েছি। নিজেকে অনেকটা মানিয়ে নিয়েছি। সহজভাবে বললাম, ভালই আছি।

আমি বিশেষ আগ্রহ নিয়ে ওঁর পাশে বসলাম।

রাজেনবাবু বললেন, 'ওরে যাত্রী' নামে একটা ছবি করছি, সেই ছবির ব্যাপারেই এসেছি, তুমি একটা রোলে কাজ করবে?

আমি ভিতরে ভিতরে ভীষণ খুশি হলাম। হাসলাম। অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়েই বললাম, নিশ্চয়ই করব, চান্স দেবেন আমাকে?

রাজেনবাবু কথা দিলেন। আমাকে দেখা করতে বলে চলে গেলেন সেদিন।

নতুন ছবিতে সুযোগ পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে আমি একদিকে যেমন উচ্ছ্বসিত, অন্যদিকে তেমনি অনেকদিন গৌরীকে না দেখার চাপা বেদনায় কাতর। বারবার মনে হতে লাগল, এই সময় তাকে যদি কাছে পেতাম বেশ হত। কিন্তু উপায় নেই। মনের দুঃখ মনে চেপে নির্দিষ্ট দিনে ও নির্ধারিত সময়ে মা-বাবাকে প্রণাম করে হাজির হলাম স্টুডিওতে।

ভবানীপুর পূর্ণ থিয়েটারের সামনে থেকে ট্রাম ধরে সোজা চলে এলাম টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোতে। বাঁদিকে বাঁক নিলেই ইন্দ্রপুরী স্টুডিও। আমি সরাসরি ঢুকে গেলাম ইন্দ্রপুরীতে। আমি স্টুডিওতে ঢুকতেই স্বয়ং রাজেন চৌধুরী আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ভূতনাথবাবুর কাছে। ভূতনাথবাবুই ছিলেন 'ওরে যাত্রী' ছবির প্রযোজক। তিনি আমাকে কাছে ডেকে দু'চারটে কথা বললেন। কাকে ডেকে যেন বললেন, ওকে মেক-আপ রুমে নিয়ে যাও—

আমাকে কি মেক-আপ নিতে হবে তাও বলে দিলেন রাজেনবাবু। তারপর একটি লোক আমাকে মেক-আপ রুমের দিকে নিয়ে যেতে এল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। এলাম মেক-আপ রুমে। অনেকক্ষণ আমাকে বসে থাকতে হ'ল। চুপচাপ ঠাঁয় মুখে হাত দিয়ে বসে রইলাম। সবাই ব্যস্ত। প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকে কত আপন। সবাই সবাইকার সুখ-সুবিধে দেখছে। কিন্তু আমার খবর নিচ্ছে না কেউ। কেউ কেউ যেন একটা অদ্ভুত জীব দেখার মত আমাকে দেখে চলে যাচ্ছে। আমাকে আমল দিচ্ছে না কেউ। আমি শুধু নীরবে বসে আছি।

অনেকক্ষণ এই রকম এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে আমাকে কাটাচ্ছে

হ'ল। যখন রীতিমত হাঁপিয়ে উঠেছি তখন আমার ডাক পড়ল মেক-আপ নেবার। মেক-আপ নিলাম। দেখতে দেখতে আমি পুরোদস্তুর একজন ডাক্তার বনে গেলাম। আমাকে ডাক্তার সাজিয়ে দেওয়া হ'ল। গলায় স্টেথেস্কোপ ঝুলিয়ে আমি মেক-আপ রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। এলাম স্টুডিও ফ্লোরে।

কেউ আমার সঙ্গে কথাটিও বলছে না। আমি নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ফ্লোরের একপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। কথা বলার সঙ্গী নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি শুধু স্বপ্নের জাল বুনছিলাম। এমন সময় একজন সহকারী পরিচালক আমার কাছে এলেন। তার একটু পরেই এলেন রাজেনবাবু। আমাকে কাছে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন কি করতে হবে আমাকে।

শুনলাম প্রভা দেবীর বিপরীতে অভিনয় করতে হবে আমাকে। তখন প্রভা দেবীর অভিনেত্রী হিসেবে খুব নামডাক। কেতকী দত্তের মা। প্রভা দেবীর নামটা আমার অনেক শোনা। সেই প্রভা দেবী অভিনেত্রী-নায়িকা। আমি ডাক্তার, তাঁকে দেখতে গেছি। স্টেথেস্কোপ দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করতে হবে, এই হ'ল আমার চরিত্র।

গভীর মনোযোগ সহকারে ব্যাপারটা বুঝে নিলাম। অনেকক্ষণ ধরে দৃশ্য আর চরিত্রটা নিয়ে নিজের মনে মনে ছবি আঁকলাম।

শুটিং জোনে আলো প্রস্তুত হ'ল। দাঁড়িয়ে দেখলাম। অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম কলাকুশলীদের। কী কঠিন পরিশ্রম তাঁরা করে চলেছেন। দৃশ্য প্রস্তুত। যথাসময়ে আমাকে ডাকা হ'ল। সহকারী পরিচালক এগিয়ে এলেন। তিনি আমাকে রিহার্সাল দেওয়ালেন। আমার সারা মন জুড়ে তখন সেই কাজ। আমি গভীরভাবে চিন্তিত। এমন সময় আমাকে উদ্দেশ করে কে যেন বলে উঠলেন, রাজেনদা, এ কলির ভীমকে কোথা থেকে পেলেন? পায়ে পাথর বেঁধে না রাখলে ঝড়ে উড়ে যাবে—

আর একজন তাঁর সেই মন্তব্যে ইন্ধন দিলেন, একেবারে নতুন আলু আমদানি হয়েছে গাঁ থেকে—

এমনি কত বাঁকা-বিকৃত উক্তি তাঁরা বর্ষণ করলেন আমাকে উদ্দেশ করে।

কথাগুলো বড় বিশ্রী লাগছিল। এক একটা মন্তব্যের এক একটা বিষাক্ত তীর মেরে ওরা যেন আমার মনটাকে ক্ষতবিক্ষত করতে বদ্ধপরিকর। নিজেকে শক্ত করলাম। কোন দিকে দৃকপাত করলাম না। কোন কথায় কর্ণপাত করলাম না। মনে পড়ল সেই চিরপরিচিত তিনটি বাঁদরের কথা। একজনের এক হাতে কান চাপা, অন্যজনের এক হাতে মুখ চাপা আর একটি বাঁদরের একহাতে দু' চোখ বন্ধ করে রাখা। ভাবলাম তা না হলে উপায় নেই। 'কিন্তু

শুনব না', 'কিছু বলব না', 'কিছু দেখব না'। আমি তাই আমার সমস্ত মন ঢেলে দিলাম সেই সহকারী পরিচালকের নির্দেশ বুঝে নেবার তাগিদে। বার বার অবচেতন মনে আমার দু' চোখের ছুটো মণি এদিকে ওদিকে গিয়ে পড়তে লাগল তবুও। দেখলাম দীপকবাবুকে।

দীপক মুখার্জী ছিলেন এ-ছবির নায়ক। দেখছিলাম প্রভা দেবীকেও।

তখন সিনেমা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দেখার আমার যে একটা আগ্রহ ছিল একথা স্বীকার করে রাখাই ভাল। বিশেষ করে প্রভা দেবীকে আমি দেখছিলাম সেদিন। সেদিন প্রভা দেবী একটি উজ্জ্বল নামই বটে। এই ছবির সহকারী পরিচালক প্রভা দেবীকেও দৃশ্যটা বুঝিয়ে দিলেন। যথাসময়ে প্রয়োজন মত আলো জ্বলল।

আমি অভিনয় করতে শুরু করলাম। ফাইন্যাল টেকিং-এর আগে মনিটারের জন্য প্রস্তুত হয়েছি। স্টেথেস্কোপ প্রভা দেবীর বুকে ঠেকেছে কি ঠেকেনি এমন সময় তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্বরে বললেন, বলি এ ছেলে অভিনয় করবে কি, এর তো এখন থেকেই হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এ তো ভয়ে কাঁপছে!

প্রভা দেবীর এই ঠাট্টায় আমার ছুটো কান রোধহয় লাল হয়ে গিয়েছিল লজ্জায়। আমার ভেতরকার মানুষটা ভীষণ আহত হয়েছিল। তবুও মাথা নীচু করে আমি সেই সব কটাক্ষ উক্তি হজম করেছিলাম। তা ছাড়া তখন আমার অন্য কোন পথ ছিল না। মনে করলাম এটা ত আমার কর্মস্থল। এখানে আমি কাজ করতে এসেছি, সুতরাং আমার সব ভাবনা কাজ নিয়েই হওয়া উচিত। সেন্টিমেন্ট বলে যে বস্তু আছে তা মন থেকে মুছে ফেলা দরকার, তা না হলে কাজ দেখা যাবে কি করে!

নানা অপমানের কত ভিতরে চেপে রেখেই আমি নিজেকে সহজ করবার চেষ্টা করলাম।

তবে সত্যি কথা বলতে কি প্রভা দেবীর এই উক্তির পর আমি বেশ খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। কারণ ছেলেবেলায় দেখা প্রভাদেবীর সেই অবিস্মরণীয় 'সীতা' তখনও আমার সারা মনে বেঁচে ছিল। আজও আছে। বার বার চেষ্টা করেও বেশ মনের মত কাজ করতে পারলাম না। আমাকে দিয়ে আর সেদিন কাজ করালেন না রাজেনবাবু।

একরাশ ব্যথা নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম সেদিন।

পরদিন যথাসময়ে আবার ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে হাজির হলাম। বুকভরা একরাশ আশা। মনের জোর সম্বল করে আবার স্টুডিওর আঙিনায় এসে দাঁড়ালাম। মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম যে কারও কোন বিরূপ মন্তব্যে কান

দেব না। বিচলিত হব না।

আশ্চর্য ! এই দিনেও তাঁরা থামলেন না।

হঠাৎ কে যেন বলে উঠলেন, হিয়ার কামস্‌ নিউ দুর্গাদাস—

আবার কেউ কেউ বললেন, দুর্গাদাস! না না, তার চাইতে বল ছবি বিশ্বাস। ও ছবির মতই হবে একদিন দেখে বুঝতে পারছ না ?

এমনি ধরনের কত শ্লেষ উক্তিতে আমার নতুন স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা মনটা যে ভেতরে ভেতরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তা তারা বুঝতেও পারছিল না।

তবুও আমি নীরব ছিলাম।

আমার হঠাৎ কেমন যেন মনে হ'ল যে, এই সব বাজে লোকদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা দরকার। তবে ওদের হাতে রাখতে পারলে ওদের মুখ আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। মনে হ'ল,প্রতিষ্ঠা পেতে হলে, নিদেন এই জগতে টি'কে থাকতে হলে প্রথমেই এই বিষাক্ত বীজের মূল উৎপাটন প্রয়োজন। কারও ভাল করার ক্ষমতা এদের নেই, মন্দ করতেই শুধু এদের জন্ম।

ভাবলাম, কি করে ওদের হাত করা যায়! মিষ্টি ব্যবহারে, না চা আর সিগারেটে! আমি অবশেষে ওদের চা সিগারেট খাওয়াতে শুরু করলাম। অবাঞ্ছিতের দল অবশেষে আমার কব্জার মধ্যে এল।

সেই ছবিতে কাজও করলাম আমার সমস্ত ক্ষমতা উজাড় করে দিয়ে।

ছবি শেষ হ'ল। এই ছবিতে আমি আশাতীত পারিশ্রমিক পেলাম। ভূতনাথবাবু আমার কাজের মর্যাদা দিলেন।

সর্বসাকুল্যে পেলাম আমি সম্ভবত সাতশো টাকা।

এই ছবি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫১ সালে।

এ সব ঘটনার আগে আরও ছুটো বছর আমি পেছনে রেখে এগিয়ে এসেছি। দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ভরা সেই ছুটো বছর।

এই বছর ছুটো আমাকে যেমন কাঁদিয়েছে অন্যদিকে তেমনি সাহসও জুগিয়েছে অনেক। বাঁচার পথ দেখিয়েছে। একদিকে নিরাশার অন্ধকার গহ্বরে আমাকে যেমন নিক্ষেপ করেছে, অন্যদিকে আশার চরমতম সোপানে পৌঁছে দিয়েছে। আমার মনে হয়েছিল গৌরীকে আশা করা অন্যায়। তাই তাকে আমি ভোলবার চেষ্টা করে চলছিলাম একদিকে, অন্যদিকে ভোলবার চেষ্টা করেও পারছিলাম না বলে নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম।

এমন সময় একদিন গৌরীই আমার গোটা জীবনের রঙ যেন পালটে দিল।

আমি তখন একদিকে 'ওরে যাত্রী' ছবিতে কাজ করে চলেছি, অন্যদিকে

দশটা-পাঁচটার কেরানী-জীবনের মধ্যে থেকে নিজেকে তুলিয়ে রেখেছি। গতানুগতিক জীবনযাত্রা।

নিজেকে পূর্ণ প্রকাশের আগেযেন অনেকটা নিঃশেষ করে ফেলেছি। স্তিমিত মন নিয়ে আমি এগিয়ে চলেছি মাত্র। বিক্ষিপ্ত আমার চলমান জীবনযাত্রা।

ঠিক এমন সময় আমি শুনতে পেলাম গৌরী তাদের বাড়িতে এক অঘটন ঘটিয়ে ফেলেছে।

কোন এক পাত্রের সঙ্গে গৌরীর বিয়ে। পাত্র দেখে গৌরীর অভিভাবকরা একেবারে মনস্থিরই করে ফেলেছেন। সব ব্যবস্থাপাকাপাকি। গৌরী কিন্তু বেঁকে বসেছে। ঠিক করেছে সে কিছুতেই ওই পাত্রকে বিয়ে করবে না।

কথাটা কানে আসতে আমি যেন কেমন বিব্রত বোধ করতে থাকলাম। একটা অস্বস্তির পোকা যেন আমার মাথার ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছিল।

এই অবস্থায় একদিন আমি বাড়িতে আছি। সেই সময় রীতিমত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল গৌরী আমাদের বাড়িতে। উদ্‌ভ্রান্ত সে। চোখে মুখে একটা বিষাদের ছাপ। ওকে খুব অসহায় মনে হচ্ছিল আমার। এই ভাবে আসতে দেখে সেদিন আমি বিস্ময়ের আতিশয্যে চমকে উঠেছিলাম।

তারপর সব কথা সে আমাকে খুলে বলেছিল। আমার হাত দু'খানা শক্ত করে চেপে ধরে ছলছল চোখে বলেছিল গৌরী, এই তো সুযোগ, কথা দাও, এবার তুমি আমাকে তোমার মত করে আনতে পারবে!

কি করে আনবো! কেমন করে তা সম্ভব এই মুহূর্তে! তা ভাববার অবকাশ আমার ছিল না। তৎক্ষণাৎ আমিও দৃঢ় স্বরে বলেছিলাম, গৌরী এই মুহূর্তে আমার মত করে তোমাকে আনতে আমি প্রস্তুত।

গৌরী তারপর আর একটা কথাও বলার সুযোগ দেয়নি। কথা বলার কোন অবকাশও তখন আমার ছিল না। গৌরী হঠাৎ কেমনযেন উত্তেজিত হয়ে গেল। দৃপ্ত স্বরে বলল, ওঠ, চল আমার সঙ্গে—

গৌরী তারপর আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলল সরাসরি ওদের বাড়িতে।

আমার তখন রীতিমত টলমল অবস্থা। একটা দুরন্ত সংকটময় ক্ষণে আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি।

নিজেকে ঠিকমত প্রস্তুত করে সরাসরি হাজির হলাম গৌরীর বাবার সামনে। হয় উত্থান নতুবা পতন এমন একটা দৃঢ় মনোবল নিয়ে আমি তাঁকে সব কথাই খুলে বললাম। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হলেন। রাজী হলেন গৌরীর বাবা।

সেই মুহূর্তে আমার জীবনের ওপর থেকে এক নতুন দিনের বাতাস যেন

খেলা করে গেল। আনন্দ-খুশীতে দু'জনেই যেন ভরে গেলাম। বাড়ি ফিরে এসে এবার আমার বাবা মাকে রাজী করাবার পালা। ওঁরা রাজী হলেন।

অনেক দূর ব্যবধানে ছুটো বাড়ি! ছুটো বাড়ির ছুটো মনে এক নতুন আশার দোলা! ছুটো মন যেন সর্বক্ষণ পাশাপাশি। আমি তখন অসম্ভব রকমের হাল্কা। সব কাজেই যেন আমি সহজেই মন বসাতে পারছি। আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি হতে থাকল।

ঠিক এমন সময় শুনলাম 'কামনা' নামে একটা ছবি তৈরি হবে। অল্প খরচের ছবি।

নবেন্দুসুন্দর ব্যানার্জী হলেন ছবির পরিচালক। নবেন্দুবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন। একরাশ আনন্দ নিয়ে আমি দেখা করতে গেলাম যথাসময়ে।

সুযোগ পেলাম 'কামনা' ছবিতে অভিনয় করবার। চরমতম সুযোগ। মনে হ'ল সুপ্রসন্ন হয়েছেন বোধ হয় ভাগ্যদেবতা।

সেদিন আবার সেই মুহূর্তে আমি যেন আমার মনের পর্দায় দেখতে পেলাম মামাকে। বড়মামার সেই বাণী যেন আমাকে আবার অনুপ্রাণিত করল।

নবেন্দুবাবু আমাকে ছবির নায়ক চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ দিলেন। স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার আর এক নতুন সোপানে এসে দাঁড়ালাম।

ছবির কাজ শুরু হ'ল। আমার পারিশ্রমিক ঠিক হ'ল এক হাজার পাঁচশ টাকা। ইতিমধ্যে গৌরী আমার হয়েছে। একান্ত আমারই। সে কথায় পরে আসছি।

অফিস পালিয়ে, অফিস ছুটি নিয়ে আমি 'কামনা' ছবির কাজ শেষ করলাম। আমার ভিতরকার মানুষটা তখন মহা আনন্দে-খুশীতে ভরপুর। আমি যেন আমার অনেক স্বপ্নে-ভরা তরীখানা অনেক ঢেউ পেছনে রেখে একটু একটু করে তীরের দিকে নিয়ে চলেছি। আমি যেন আমারসেই ছোট্ট আশার তরীতে দাঁড়িয়ে দূর থেকে আমার সাফল্যের মোহনা আবছা দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমাকে ঘিরে যে প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব চলছিল, মনে হ'ল যেন তার গতিবেগ স্তিমিত হয়ে আসছে। আমি যেন বাঁচার আলোর নিশান দেখতে পাচ্ছি।

'কামনা' মুক্তি পেল। মুক্তি পেল ১৯৪৯ সালে।

এই ১৯৪৯ সালেই ভারতীয় চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে

গেল। এই সালে ভারত সরকার ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটি তৈরি করলেন। আবার এই সালেই কাহিনী চিত্রের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করে এগার হাজার ফুট করার ব্যাপারটা পাকা হয়। আর ট্রেলারের দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট হ'ল চারশ ফুট।

এমন সময় আমার স্বপ্নের তরীখানা যেন সহসা অস্বাভাবিক ভাবে দুলে উঠল। আমার মনে তখন ভয়ঙ্কর ভয়! এই এবারই হয়তো আমার ডুবে যাবার—তলিয়ে যাবার লগ্ন সমাগত, সেই আশঙ্কা।

'দৃষ্টিদান' ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়েছিল। মুক্তি পেয়েছিল বটে তবে চরমতম ব্যর্থ হয়েছিল ব্যবসায়িক দিক থেকে। অনেক আশা ছিল 'কামনা'কে নিয়ে। ছবির জনপ্রিয়তা মানেই তো আমার স্থায়িত্ব। হ'ল না। শুনলাম 'কামনা'ও নাকি দর্শকরা নিচ্ছেন না। ছবিটা মার খেয়েছে।

আমি মনে মনে 'কামনা' ছবির সাফল্য কামনা করেছিলাম। বারকতক ঈশ্বরকেও স্মরণ করেছিলাম। আমার স্বার্থপ্রণোদিত সেই কামনা বোধ করি ঈশ্বর উপেক্ষা করলেন।

'কামনা' ফ্লপ করল। ভীষণ মুষড়ে পড়লাম। আমার প্রতিষ্ঠা পাবার লোভ যেন খতম হয়ে যাবার মুখে। একবার আশা আবার নিরাশা, একবার উত্থান পুনরায় পতন যেন আমাকে ক্লান্ত করে তুলল। স্থির করলাম যত ব্যর্থতাই আসুক না কেন, আমি হাসিমুখে তা বরণ করে নেব।'

আবার কেরানীর জীবন শুরু করে দিলাম। আবার অফিস—আবার অফিস থেকে বাড়ি ফেরা।

মাঝে মাঝে শুধু গৌরীর মুখটা আমাকে সজীব করে রাখত।

এসব কথা ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিককার কথা।

বিয়ের তারিখ তখন মোটামুটি ভাবে স্থির হয়ে গেছে। তবুও অনেকগুলো দিন পেরিয়ে তবেই আসবে সেই শুভলগ্ন।

অফিসে কাজ করছি। কি ভাবে যেন আমি সরোজবাবুর কথা শুনলাম তা মনে করতে পারছি না। সরোজ মুখার্জী। শুনলাম সরোজবাবু 'মর্যাদা' নামে একটা ছবি তৈরি করার পরিকল্পনা প্রায় কার্যকরী করে তুলেছেন। খবরটা আমার কানে আসতে আবার কেমন যেন চঞ্চল হয়ে পড়লাম। তখন একমাত্র ভাবনা সরোজবাবুর কাছে কি ভাবে আমার আকাঙ্ক্ষার কথা বলব। শুধু ভাবছি—আমি শুধু ভাবছি। ওদিকে সরোজবাবু ছবির নায়ক স্থির করে ফেলেছেন। নায়ক প্রদীপকুমার।

প্রদীপকুমার ত মোটামুটি ভাবে জনপ্রিয়। প্রতিষ্ঠিত নায়ক।

প্রদীপকুমারকে আমরা শেতলদা বলে ডাকতাম। এক সঙ্গে থিয়েটারও

করেছি। সে কথা আগেই তো বলেছি।

সেই প্রদীপকুমার এই ছবির নায়ক মনোনীত হয়েছেন শুনে আমার উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল। তবুও সরোজবাবুর ছবিতে অভিনয় করার ইচ্ছে একেবারে বর্জন করতে পারলাম না। নাই বা পেলাম নায়কের মর্যাদা!

সুযোগের অপেক্ষায় আছি। ওদিকে শুনতে পাচ্ছি 'মর্যাদা'র প্রাথমিক কাজও এগিয়ে চলেছে। গোয়েন্দার মত আমি দূর থেকে সব খবর নিয়ে চলেছি মাত্র। এমন সময় শুনলাম প্রদীপকুমার অন্ত ছবির কাজে ব্যস্ত থাকার জন্যে জানিয়ে দিয়েছেন যে 'মর্যাদা' ছবিতে তিনি অংশ নিতে পারবেন না।

সুযোগের অপব্যবহার করলাম না। সরাসরি চলে গেলাম সরোজবাবুর কাছে। আমাকে দেখে সরোজবাবু যে মনে মনে খুব খুশি হলেন তা তাঁর মুখের রেখাগুলো দেখে সহজেই অনুমান করতে পারলাম।

আমার মনে তখন নতুন আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ, অন্তদিকে 'কামনা'র ব্যর্থতার গ্লানি।

সরোজবাবু বললেন, এই ছবিতে কাজ দেবার ব্যাপারে আমার কোন অমত নেই, তবে—

সরোজ মুখার্জীর কণ্ঠস্বর দ্বিধাজড়িত। এমন কিছু তিনি বলতে চান যাতে আমি হয়তো অখুশি হতে পারি। সেই চিন্তা করেই তিনি যেন ভেতরকার কথাগুলো স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে পারছেন না। ওঁর মুখে ভাষা ফোটার আগে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, কিছু দ্বিধা করবেন না, আপনি যা বলতে চান বলুন না। সরোজবাবু বললেন, তোমার নামটা পালটাতে হবে, যদি রাজী থাকো বল—আমি তখনই রাজী হয়ে গেলাম।

সরোজ মুখার্জীও আমাকে 'মর্যাদা' ছবির নায়ক স্থির করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। যথাসময়ে আমার নতুন নাম হ'ল—অরূপকুমার। এ যেন আমার নবজন্ম। নাম পরিবর্তন করায় মনটা যে আমার ভারাক্রান্ত হয়নি তা নয়। নিজেকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিলাম। বাড়িতে এসে মাকে আমি সব কথাই খুলে বললাম। বন্ধুরাও সেদিন আমাকে নিরুৎসাহ করেনি।

পোর্ট কমিশনার্সের চাকরিটা আমার তখনও বিদ্যমান। ছুটির পর ছুটি নিয়ে চলেছি। আবার ছুটি নিলাম। নিতান্ত কতকগুলি মিথ্যার উপর ভিত্তি করে এই ছুটি নেওয়া। অফিসের অনেকেই আমার এই ছুটি ও কামাইয়ের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট। আবার অনেক সহকর্মীই আমাকে অনুপ্রাণিত করতেন।

সেই ছুটি নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লাম সাধনার উত্তাল সমুদ্রে। আবার আমার অভিযান শুরু হ'ল।

নির্দিষ্ট দিনে নতুন নামধারী আমি অরূপকুমার হাজির হলাম এম· পি· স্টুডিওতে।

পরবর্তীকালে অনেকের লেখায় পড়েছি এই ছবির নায়িকা ছিলেন মনীষা দেবী, আসলে মনীষা দেবী একটি পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। আর নায়িকা ছিলেন স্মৃতিরেখা বিশ্বাস। এই ছবির প্রযোজক সরোজ মুখার্জী ছিলেন রায়বাহাদুর সত্যেন মুখার্জীর ছেলে। এঁ রা পরিবেশক সংস্থারও মালিক ছিলেন।

এবার দক্ষিণ থেকে একেবারে উত্তরের মধ্য-সীমান্তে। ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় ছাড়িয়ে চিড়িয়ামোড় পিছনে রেখে সাউথ সিঁথি আর বরানগরের সঙ্গমস্থল। বাস থেকে নামলাম।

এম· পি· স্টুডিওর নামটা তখন আমার কাছে স্বর্গপুরীসম। এম· পি· কে ঘিরে আমার মনে তখন এক মধুর 'ইমেজ'। সেই স্টুডিওতে এই আমার প্রথম প্রবেশ। নিয়মকানুন রক্ষা করে সরাসরি আমি স্টুডিওর আঙিনায় গিয়ে দাঁড়ালাম। যথাসময়ে আমি 'মর্যাদা' ছবিতে কাজও শুরু করে দিলাম।

এক নতুন উদ্দীপনা নিয়ে আমি আবার আমার কর্তব্য সম্পাদন করে চললাম নিষ্ঠার সঙ্গে। কাজ করি। বাড়ি যাই। মাঝে মাঝে অফিস করি। আর শুধু গৌরীর কথা ভাবি।

বিয়ের দিন আরও এগিয়ে এসেছে।

'মর্যাদা'র শুটিং করছি এমন সময়ে একদিন স্টুডিওতে আমার কাছে এলেন বিমলবাবু। বিমল ঘোষ। এম· পি· প্রোডাকশন্সে ম্যানেজার বিমলবাবুর নামডাক তখন অনেক। আমিও সেই নামের সঙ্গে পরিচিত।

এম· পি· প্রোডাকশন্সের শিল্পীরা তখন মাস মাইনেতে কাজ করতেন। বাঁধা অনেক শিল্পী তখনই এই কোম্পানীতে। তৎসত্বেও বিমলদা অর্থাৎ বিমল ঘোষ একেবারে সরাসরি আমাকে ডেকে পাঠালেন।

আমি ফ্লোর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এলাম বিমলদার কাছে।

বিমল আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন, তারপর বেশ ধীর কণ্ঠস্বরে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন।

বললেন, পাহাড়ী সান্যালের কাছ থেকে তোমার কথা অনেকবার শুনেছি—

খুশি হলাম। বলা বাহুল্য, পাহাড়ীদা তখন মর্যাদা ছবিতেও কাজ করছেন। সেই ছবির অন্যতম প্রধান শিল্পী তখন পাহাড়ীদা। বেশীদিনের পরিচয় নয়, তবুও পাহাড়ী সান্যালের ভিতরকার মানুষটাকে আমি সেই মুহূর্তে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারলাম না।

বিমলদা প্রশ্ন করলেন, তুমি আমাদের কোম্পানীতে যুক্ত হতে ইচ্ছুক?

নির্দ্বিধায় উত্তর দিলাম, নিশ্চয়ই ইচ্ছুক।

বিমলদা আনন্দিত হলেন। বললেন, তোমার ঠিকানাটা আমাকে দাও, কোম্পানীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আমি তোমাকে খবর দেব, কেমন ?

আমি বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে বিমলবাবুকে আমার ঠিকানাটা জানিয়ে দিলাম। তার কিছুদিনের মধ্যে 'মর্যাদা' ছবির কাজ শেষ হয়ে গেল।

আবার আমার শিল্পী-জীবনের বেকার অবস্থা নিয়ে আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলাম। আবার সেই চাকরি-জীবনের আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া শুরু হয়ে গেল।

'মর্যাদা' অবশেষে মুক্তি পেল ১৯৫০ সালে। অবশ্যই আমার বিয়ের অনেক পরে। এই ছবির মুক্তির পরও আমার সেই আগেরই মত অবস্থা। 'মর্যাদা'র রিলিজিং হাউসের পাশাপাশি অবসর সময়ে ঘুরে বেড়াই। আমার অভিনয় প্রসঙ্গে দর্শকদের মন্তব্য শোনার আগ্রহের চেয়েও দর্শক-সমাগমের মাত্রা দেখাই ছিল সেদিন আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

ছবিটা প্রথম দিকে ভালই চলছিল। হঠাৎ যেন কি দিয়ে কি হয়ে গেল! 'মর্যাদা'র প্রতি দর্শকদের আগ্রহ কমে গেল। এ যেন আমারও অক্ষমতা। ভাগ্য বিড়ম্বনা!

অশান্তির বিষাক্ত পোকাগুলো যেন আমার ভেতরে কিলবিল করছিল। এভাবে একটার পর একটা ছবি যদি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তা হলে যে আমারও ব্যর্থতা! অথচ সেই ব্যর্থতা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনার ক্ষমতা কোথায় ?

দর্শকের আদালতে স্বচ্ছ বিচার তো হবেই।

হ'লও তাই। 'মর্যাদা' ফ্লপ করল।

লজ্জায় আমি যেন মাথা তুলে তাকাতে পারি না কারও দিকে। আমার অভিনয়ের ত্রুটিতে যে ছবিটা এমন হয়েছে তা কেউ বললেন না, তবে এ লজ্জা কেন! আমি জানি লজ্জা পাচ্ছি 'মর্যাদা'র ব্যর্থতাকে ঘিরে।

বন্ধুরা আবার নানা শ্লেষ উক্তিতে আমাকে রীতিমত আঘাত করতে শুরু করল। অনেক স্পষ্ট করেই বলল—তুই ফ্লপ মাস্টার জেনারেল।

অপমানে—অহেতুক অপমানে আমার ভেতরকার মানুষটা ক্ষতবিক্ষত হতে থাকল। আমার পতনের একটা ছবি যেন স্পষ্ট আমি দেখতে পাচ্ছি।

এবার আমার বিয়ের কথাটা সেরেনি। কথায় কথায় দু'বছর এগিয়ে এসেছি। ফিরে যাই দু'বছর পিছনে। ১৯৪৮ সালের ১লা জুন আমার বিয়ে হয়েছিল। সমস্ত রকম শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে মোটামুটি সমারোহের সংগেই হয়েছিল। তারপর শুধু ছবি করে যাওয়া। শুধু কাজ আর কাজ। তারপর এগিয়ে এল আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত ৭ই সেপ্টেম্বর।

১৯৫০ সালের এই তারিখটা যেন দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। এই সেই আমার জীবনের আর এক একান্ত আপনার তারিখ।

এই শুভ দিনের শুভক্ষণে গৌতম এসেছিল এই চাটুজ্জে বাড়ির উত্তরাধিকারী হয়ে।

ছবি ফ্লপ করলে সেদিক থেকে আমার দুশ্চিন্তার যেমন সীমা পরিসীমা ছিল না তেমনি আমি আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যখন রীতিমত সন্দিহান ঠিক সেই সময় আর একটি ঘটনার শুভ সূচনায় আমার মন আনন্দে-খুশিতে ভরে থাকত। তা হলো গৌরী অন্তঃস্বত্বা। গৌরী মা হতে চলেছে, আমার একমাত্র সন্তানের মা।

গৌরীকে আমি, লালু আরও কয়েকজন শিশুমঙ্গল হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এলাম। সারাদিন শুধু ভাবনা। ৬ই সেপ্টেম্বর সারাটা দিন এই দুশ্চিন্তা-ভাবনার মধ্যে কাটল। কি পাব—কে আসছে—ছেলে হবে না মেয়ে, আমাদের সেই নিয়ে জল্পনা। এই সেপ্টেম্বরে আমার জন্ম, এই সেপ্টেম্বরে গৌরীর জন্ম আর এই সেপ্টেম্বরেই আমার সন্তান আসছে! ৭ই সেপ্টেম্বর ভোর রাতে তারা—শচীন লালু খবর নিয়ে এল গৌরীর ছেলে হয়েছে। প্রথম সন্তান ছেলে, সেই আনন্দে আমি সেদিন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। 'মর্যাদা'র ব্যর্থতার জ্বালা আমি ভুলে গেলাম।

আবার নিজেকে সুন্দরভাবে সাজাতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। অফিসের বাঁধাধরা চাকরির পর গৌরী আর নবজাতকের সান্নিধ্য।

বেশ সহজ-সুন্দর আর সাধারণ ভাবেই আমাদের জীবনযাত্রা চলছিল। হাসিতে-খুশিতে আমরা দু'জনকে ভরিয়ে রেখেছিলাম। এমনি করেই একটা বছর কেটে গেল। এর মধ্যে মাঝে মাঝে আমার স্বপ্নকে সার্থক করে না তুলতে পারার যন্ত্রণা যে আমাকে কাতর করে তুলছিল না তা নয়।

আমার আত্মবিশ্বাস ছিল। ছিল আন্তরিক নিষ্ঠা। চরম একাগ্রতা। ছিল একান্ত শ্রদ্ধা। কিন্তু আমার ভাগ্যদেবতা জানি না কেন আমার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। আমি 'মর্যাদা' ছবির পর ধরেই নিয়েছিলাম ফিল্মে আর কেউ আমাকে সুযোগ দেবেন না। ভেবেই নিয়েছিলাম আর কেউ আমাকে আপন করে ডেকে নেবেন না। নিতে চাইবেন না। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমি বেঁচে রইলাম।

কিছুদিন পর আবার অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার উত্থানের হদিশ পেলাম। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম অনেক বন্ধুর পথ পিছনে ফেলে রেখে বন্ধুর পথের আলো দেখতে পাচ্ছি।

সেদিনকার তারিখটা মনে নেই। অফিস থেকে ফিরে একটা চিঠি পেলাম। এম. পি.র কর্ণধার মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন।

চিঠিটা পেয়ে আমি যে কতটা আনন্দে ভরে গিয়েছিলাম তা এখন ভাষায় বোঝাতে পারব না।

মুরলীবাবু স্বয়ং আমাকে চিঠি দেবেন এমন বিশ্বাসের জন্ম হবার মত কোন সুযোগই তো আমি কোথাও রেখে আসিনি। যা হোক, চিঠিটা পড়লাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ আছে চিঠিতে। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি আমাকে তাঁদের ধর্মতলার অফিসে দেখা করতে বলেছেন চিঠিতে।

তৎক্ষণাৎ চিঠির নির্দেশ মেনে নিলাম।

অফিস যাবার নাম করে একেবারে সোজা হাজির হলাম মুরলীধরবাবুর কাছে। নম্র বিনয়ের সঙ্গে নমস্কার জানিয়ে বললাম, আপনি আমাকে ডেকেছেন?

মুরলীবাবু আমাকে বসতে বললেন। সামান্য দু'চারটে কথা। তারপরই তিনি আমাকে এম. পি. প্রোডাকসন্সের, জন্য তিন বছরের অঙ্গীকারে মাস মাইনের স্টাফ আর্টিস্ট হিসাবে গ্রহণ করলেন। প্রথম বছর মাসিক চারশো টাকা আমার পারিশ্রমিক নির্ধারিত হ'ল। তাতেই আমি খুশি। মহাখুশি। চুক্তিপত্রে সই করে সেদিন চলে এলাম। জেনে এলাম আমায় অভিনয়ের পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষা নেবেন সন্তোষদা, অর্থাৎ সন্তোষ সিংহ।

তখনকার দিনে সন্তোষ সিংহ ছিলেন প্রখ্যাত নট। অভিনয় শিক্ষক হিসেবে ছিলেন বলিষ্ঠ। সেই সন্তোষ সিংহের কাছে পরীক্ষা! ব্যাপারটা আমাকে খুবই উৎসাহিত করল।

যথাসময়ে সন্তোষবাবুর দরবারে ধরা দিলাম শিক্ষানবীশ হিসেবে।

তারপর থেকে সন্তোষ দত্তের কাছে তালিম নিতে শুরু করলাম।

কিছুদিন পর এম পি. প্রোডাকসন্সের কর্তৃপক্ষ সন্তোষবাবুর কাছে জানতে চাইলেন নায়ক হিসেবে আমাকে চলবে কি না। সন্তোষবাবুর রায়ের জন্য আমি উদগ্রীব। যথাসময়ে তিনি জানিয়ে দিলেন। তাঁর সুস্থ মতামতে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

আমার মাস মাইনের কথাটা চূড়ান্ত ভাবে স্থির হয়ে গেল।

প্রথম বছর চারশো, দ্বিতীয় বছর ছ'শো, আর তৃতীয় বছরে আমি পাব সাতশো টাকা।

এই সময়ে এম. পি. কর্তৃপক্ষ 'সহযাত্রী' নামে একটি ছবি তৈরি করবেন বলে মনস্থ করেছেন এই খবরটা জানতে পারলাম।

ভেতরে ভেতরে ঐ ছবির হিরো হবার স্বপ্নও দেখছি, এমন সময় জানতে পারলাম এই ছবির নায়ক হিসাবে স্থির করা হয়েছে অসিতবরণকে।

অসিতবরণ তখন প্রতিষ্ঠিত নায়ক। নায়ক হিসেবে তখন তাঁর খ্যাতিও অনেক। অসিতবরণ ছবির নায়ক শুনে মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল। ইচ্ছেটা প্রকাশ করার মত তেমন কোন সুযোগই পাচ্ছিলাম না। আমি তখন অনেকের মত মাস মাইনের আর্টিস্ট ছাড়া তো আর বিশেষ কিছুই নই। তাই সাহস করে বলতে পারিনি কথাটা। এঁদের সঙ্গে এমন ভাবে চুক্তিবদ্ধ যে বাইরের কোন ছবিতে কাজ করব সে উপায়ও নেই! সুতরাং চুপ করে ভেতরে ভেতরে গুমরে থাকা ছাড়া আর কোন পথই আমার খোলা ছিল না।

তখনও আমার পোর্ট কমিশনার্স অফিসের চাকরিটা আছে। অফিসে যাই। বাড়ি আসি।

মাঝে-মধ্যে এম. পি. স্টুডিওতে হাজিরা দিই। এই নিয়ে আছি।

এমন সময় খবর পেলাম, অসিতবাবু আরও কয়েকটি ছবির কাজে ব্যস্ত থাকার জন্যে জানিয়েছেন 'সহযাত্রী'তে কাজ করতে পারবেন না।

নিতান্ত স্বার্থপরের মত আমার মনটা তখন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। অবশেষে ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হলেন। কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত আমাকেই নায়ক হিসাবে মনোনীত করলেন।

এবার রীতিমত পরোক্ষ ভাবে অর্থাৎ সাহসিকতার সঙ্গে অফিসের চাকরিটার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করে দিলাম। আমি তখন আবার আমার স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার স্বপ্নে বিভোর। যায় যাবে যাক চাকরি,—এমনই তখন আমার মনের অবস্থা।

'সহযাত্রী' ছবির পরিচালনার দায়িত্ব ছিল তখন 'অগ্রদূত' গোষ্ঠীর। এই ছবির শুটিং আরম্ভ করার আগে একদিন সরাসরি হাজির হলাম স্টুডিও অফিসে, বিভূতি লাহার কাছে। বিভূতিবাবু অর্থাৎ খোকাদা তখন অফিসেই ছিলেন। এই ছবিতে কাজ করার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন, সাহস যোগালেন।

ভাবলাম পোর্ট কমিশনার্সের চাকরিটা ছেড়ে দেব। ভাবনা যখন একরকম স্থির, ঠিক তখনই বিভূতিবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ। তাঁর ছবির নির্বাচিত নায়ক আমি, তবুও তিনি আমার ভুর্কাগ্যের সিঁড়ি তৈরি হোক তা কোন-মতেই চাননি। একবার বলেছিলাম, এবার আমি চাকরিটা ছেড়ে দেব ভাবছি—

উত্তরে বিভূতি লাহা বলেছিলেন, কয়েকটি ছবিতে পর পর পুরো কাজ না

পাওয়া পর্যন্ত চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত মনস্থির করা বোধ করি উচিত হবে না—

আরও বলেছিলেন, হঠকারিতা দিয়ে নিজেকে কোন মহান ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায় না, এটাই আমার স্থির বিশ্বাস—

তারপর যখন আমি 'সহযাত্রী' ছবির নায়ক নির্বাচিত হলাম এবং কাজ শুরু করলাম, তখন আমার কাজ দেখে কি না জানি না বিভূতিবাবু আমাকে পোর্ট কমিশনার্সের চাকরি ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। ঠিক তখনই চাকরি-জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে আনিনি বটে, তবে চাকরিটাকে যেন আমি ফাউ ভেবে নিলাম। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে 'সহযাত্রী' ছবিতে আমি কাজকরেছিলাম। ভাগ্যের বিড়ম্বনা কেউ কখনো খণ্ডন করতে পারে না। আমিও আবার ভাগ্যকে অস্বীকার করতে পারলাম না।

এই ছবিতে আমার অরূপকুমার নাম ঘুচে গেল। কামনায় ছিলাম উত্তম চ্যাটার্জী। তাও ঘুচে গেল। এবার আমি হলাম উত্তমকুমার। এই নামে ভূষিত করলেন বিমল ঘোষ।

১৯৫১ সালে মুক্তি পেল 'সহযাত্রী'।

তখনকার দিনের বহু খ্যাতনামা শিল্পীদের সংগে নায়িকা হিসাবে প্রখ্যাতা নায়িকা ভারতী দেবী থাকা সত্ত্বেও 'সহযাত্রী'ও আশাতীত সাফল্যলাভ করল না। চলচ্চিত্র জগতের ভাষায় ছবিটি ফ্লপ হ'ল। এবার সত্যিই ব্যর্থতার আঘাতে আমি চূর্ণ-বিচূর্ণ। চোখে যেন রীতিমত অন্ধকার দেখছি।

১৮৫১ সাল আমার জীবনটাকে যেন তছনছ করল। আমি নিজেই নিঃশেষ হয়ে যাবার শেষ সোপানে যেন এসে দাঁড়ালাম। ইতিপূর্বে 'ওরে যাত্রী' নামে যে ছবিটিতে কাজ করেছিলাম সেটিও মুক্তি পেল এই বছরে।

শুধু তাই নয় পশুপতিবাবুর ছবিটিও এই বছরেই মুক্তি পেয়েছিল।

বলা হয়নি, চলচ্চিত্র সাংবাদিক হিসাবে এখন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের নাম অনেকেই জানেন আশাকরি। এই পশুপতিবাবুএকদিন ছিলেন চিত্রপরিচালক। তাঁর 'নষ্টনীড়' ছবিতে আমি অভিনয় করেছিলাম।

সেই ছবির নায়িকা ছিলেন তদানীন্তন কালের স্বনামধন্যা অভিনেত্রী সুনন্দা দেবী।

আমার জীবনের অভিশপ্ত ১৯৫১ সালে কয়েক মাসের ব্যবধানে পর-পর তিনটি ছবি যেন আমার শিল্পচেতনার মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে হাজির হ'ল আমার সামনে। তিনটি ছবিই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যর্থ হ'ল।

আমার এতদিনকার সব স্বপ্ন যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল মুহূর্তে। মনের

দিক থেকে আমি একটু একটু করে শুকিয়ে গেলাম। আমার সব সত্তা যেন আমি হারিয়ে ফেললাম।

এবার স্থির সিদ্ধান্তে এসে গেলাম যে শুধুমাত্র চাকরি ছাড়া আর কিছুই করব না, ভাবব না। আমার ভেতর থেকে যেন হেরে যাবার একটা কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল!

নিজের কাছেই আমি নিজেই প্রশ্ন করি, কেন আমার এই ভাগ্যবিড়ম্বনা! কেন আমার এই ব্যর্থতা! কার অভিশাপ নিয়ে আমার এই অভিযান!

হাতে দু-একখানা ছবি আছে বটে, তবে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। অভিনয়ের ব্যাপারে আমার যে একটা স্বতন্ত্র উৎসাহ ছিল আকাঙ্ক্ষা ছিল, আশা ছিল—সব কেমন যেন থেমে গেছে। আমি ব্যর্থ শিল্পী হিসাবে নিজেকে শুধু মাঝে মাঝে ধিক্কার দিই।

আমার বন্ধুরা আমাকে উৎসাহিত করে। তারা আমাকে সাহস দেয়। তারা আমাকে প্রেরণা যোগায়। অনুপ্রাণিত করে। বলে ফ্লপ করলে তো তোমার দোষ নয়, তুমি এত ভেঙে পড়বে কেন?

নিজের প্রতি বিশ্বাস যেমন আমি হারিয়ে ফেলেছি, তেমনই সিনেমা-জগতের অনেকেই আমার প্রতি যেন বিশ্বাস হারাতে চলেছেন, আমি তা বেশ বুঝতে পারছি। এই ১৯৫১ সালে ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে আবার নতুন এক আইন প্রবর্তিত হলো। আমার তো মনে হয়, এই আইনের প্রয়োজন ছিল ছবির ক্ষেত্রে। তা হলো সেন্সার আইন। ১৯৫১ সালের ১৫ই জানুয়ারী বম্বেতে "কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সার বোর্ড" তৈরি হলো। এসব হলে হবে কি, আমি তখন নিজেকে নিয়ে জটিল ভাবনায় পড়েছি। একটার পর একটা ব্যর্থতা অথচ সংসারের দায়-দায়িত্ব ষোল আনা। আমি তখন শুধু বিবাহিত নই—একটি সন্তানের বাবা। সুতরাং দুশ্চিন্তায় আমি যেন মাথা তুলতে পারছি না।

এই সময়ে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের উজ্জ্বলতম তারাটি খসে গেল। প্রমথেশ বড়ুয়া ছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয়। প্রতি মুহূর্তে যাঁকে মনে মনে স্মরণ করতাম, সেই প্রমথেশ বড়ুয়া মারা গেলেন এই সালের ২৯শে নভেম্বর।

যে মুরলীবাবু একদিন আমাকে সাগ্রহে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সেই তিনিও আর যেন আশা স্থাপন করতে পারছেন না।

মনে পড়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে মনে পড়ে যাচ্ছে সুকুমারবাবুর কথা।

যে মুহূর্তে আমি নিজের কাছে নিজেই দুর্বল হয়ে পড়েছি, ঠিক সেই মুহূর্তে সুকুমার দাশগুপ্ত কি জানি কেন আমার প্রতি সদয় হলেন।

মনে পড়ছে, যে সময়ে আমি পর-পর তিনখানা ছবিই ফ্লপ হবার জন্যে

নিজের ব্যর্থতায় ছট্‌ফট করছি, রীতিমত অস্থির, ঠিক সেই সময় সুকুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'সঞ্জীবনী' ছবির জন্য আমাকে নির্বাচন করলেন।

এই ছবিতেও আমি নায়ক হবার সুযোগ পেলাম।

আমার বিপরীতে নায়িকা নির্বাচিত হলেন সন্ধ্যারাণী।

এই ছবির চুক্তিপত্রে সই করবার পর থেকে আমি যেন আবার একটু একটু করে সহজ হয়ে যেতে লাগলাম। ছবির কাজ তখনও শুরু হয়নি।

সুকুমারবাবু যখন আমাকে নায়ক হিসাবে স্থির করে ফেলেছেন, তখন একদিন মুরলীধরবাবু সুকুমারবাবুকে ডেকে বলেছিলেন, এই চরিত্রে উত্তম কি অভিনয় করতে পারবে? না সুকুমার, তুমি বরং ছবি অথবা ধীরাজকেই নাও—উত্তম তৈরি হলে তখন নিও—

মুরলীবাবুর কণ্ঠে সংশয়। সুকুমারবাবুর কিন্তু দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়!

তিনি সেদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আমরা যদি তৈরি না করি, তৈরি হওয়ার সুযোগ না দিই, তা হলে তৈরি হবে কেমন করে বলুন?

'সঞ্জীবনী'র এই নায়ক মাতাল। একটি দুরূহ মাতাল চরিত্র। মুরলীবাবুর আশঙ্কা এই চরিত্রটিকে নিয়ে। তিনি সর্বোতোভাবে সেই আশঙ্কা প্রকাশও করেছিলেন। সুকুমারবাবু তবুও নিজের দৃঢ়সঙ্কল্পে অবিচল রইলেন। আমাকে একান্ত আপনজনের মত নিজের কাছে ডেকে এনে একদিন ভাল করে চরিত্রটি বোঝালেন। আমি আমার গভীর শ্রদ্ধা এবং একাগ্রতা দিয়ে সেই চরিত্রটা মনের মধ্যে গেঁথে ফেললাম।

কোন কাজেই মন বসাতে পারি না। সব সময় শুধু সেই চরিত্রটা আমি নিজের ভেতর আঁকতে লাগলাম। মনে মনে রিহার্সাল ছাড়া আর কোন কাজই আমার নেই। আমি শুটিং-এর দিনগুলোর জন্য ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হতে লাগলাম।

যথাসময়ে ছবির কাজ শুরু হয়ে গেল। তারপর একসময়ে যথারীতি ছবির সব কাজ সম্পূর্ণও হয়ে গেল। প্রস্তুতি চলতে লাগল ছবি মুক্তির।

আমি যেমন বিস্মিত হলাম, তেমনি হলাম মর্মাহত। তার কারণ, ছবির প্রচারে আমার কোন স্থান নেই। কোন বিজ্ঞাপনেই আমার নামটুকুও পর্যন্ত নেই। বড় বড় বিজ্ঞাপনে একমাত্র শ্লোগান ছাপা হতে লাগল—

"সন্ধ্যারাণীর ভূমিকাভিনয়ে সমৃদ্ধ"

সেদিন একে কর্তৃপক্ষের বড় বেশী পক্ষপাতিত্ব বলেই মনে হয়েছিল আমার।

আমার ভেতরকার মানুষটা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চাইছিল, তথাপি মনকে কোনমতেই দুর্বল হতে দিইনি।

নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম এই ভেবে, অভিনয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেলে বিজ্ঞাপনে আমার কথা, আমার নাম থাকবে নিশ্চয় একদিন।

অবশেষে ছবি মুক্তি পেল।

মুক্তি পেল 'সঞ্জীবনী'। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা তাদের সমালোচনাপৃষ্ঠে লিখলেন নিজেদের বক্তব্য। কোথাও কোন সমালোচনা বেরুলে আমি তন্নতন্ন করে খুঁজতাম নিজেকে, কোথাও সাংবাদিক-সমালোচকেরা অনুগ্রহ করে আমার নামটা বা আমার অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন কিনা। কিন্তু আশাহত হলাম সেখানেও। দৈনিক কাগজগুলো প্রাণ খুলে আমার কথা উল্লেখ করলেন না। যে-কোন কারণেই হোক বরাবরই আমার নামটাকে ওঁরা এড়িয়ে যেতেন। এ সব জানতাম। তবুও সেই সমালোচনার কলমের লাইনের পর লাইন দেখতাম আমি বিশেষ আগ্রহ নিয়ে, আন্তরিকতা নিয়ে।

সৌভাগ্যবশতঃ, আনন্দবাজার পত্রিকা সেই সময়ে আমার প্রসঙ্গে অর্থাৎ 'সঞ্জীবনী'র 'রবির' সম্পর্কে লিখেছিলেন—

"উত্তমকুমার স্থানে স্থানে অভিনয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন"—

মাত্র দেড় অথবা দু'লাইনের খ্যাতি। সেই আমার বড়-পাওয়া।

খবরের কাগজ হাতে নিয়ে আমি খুশির আনন্দে ভরপুর হয়ে যেতাম। সেই প্রশংসাতেই আমি সজীব। আমি যেন সার্থকতার সোপানে এসে দাঁড়িয়েছি। অবচেতন মনে সেই মুহূর্তে আমি আনন্দের আতিশয্যে হয়তো বা চোখের জল ফেলেছিলাম।

যা হোক, আনন্দবাজারের সেই সমালোচনাটুকু সেদিন যে আমাকে কতটা সতেজ করে তুলেছিল তা আজ আর বলে লাভ নেই।

১৯৫২ সাল তখনও শেষ হয়নি। এই 'সঞ্জীবনী' ছবির কাজ তখন চলছে। বেশ খুশি-খুশি মন নিয়েই আমি আমার কাজ শেষ করে চলেছি।

এই সময় নির্মলবাবু থাকতেন শান্তিনিকেতনে।

সিনেমা শিল্পের সঙ্গে যাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, পরিচালক হিসেবে যিনি অনেকগুলি ছবিই তৈরি করেছিলেন সেই নির্মল দে অনেক পরিশ্রম আর সাধনা করেও যখন হেরে গেলেন, তখন সিনেমা শিল্পের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। ওখানে গিয়ে যখন তিনি বসবাস করছেন, যখন তিনি মোটামুটি ভাবে মানসিক সুস্থ, ঠিক তখনই একটা ঘটনা অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে গিয়েছিল। নির্মলবাবু ঠিক অতটা আশা করেননি।

আশা করেননি যে মুরলীধরবাবু তাঁকে তলব দেবেন।

এম. পি. প্রোডাকসন্সের তখন দারুণ প্রতাপ। খুবই খ্যাতি। সেই এম. পি.

থেকে ডাক পেয়ে নির্মলবাবু কিন্তু বেশী উচ্ছ্বসিত হলেন না। নিতান্ত অনিচ্ছা-ভরেই তিনি একসময়ে এলেন মুরলীধর চ্যাটার্জীর কাছে। মুরলীবাবু তাঁকে সসম্মানে বসিয়ে একটা গল্প শোনালেন। একটা জাপানী ছোটগল্প।

নির্মলবাবু গভীর মনোযোগ দিয়ে গল্পটি শুনলেন।

গল্প শুনিয়ে মুরলীধরবাবু বললেন, ধরুন এই গল্পটা, এটাকে ডেভেলপ করে একটা সিনারিও করে ফেলুন, যতটা সম্ভব একটু তাড়াতাড়ি করবেন।

মুরলীধর চ্যাটার্জী যা কথা দেন তা রাখেন। সুতরাং এই কথা শোনার পর নির্মলবাবুর সব ব্যাপারটা বুঝে নিতে দেরি হল না। উত্তরে তিনি বললেন, আমি দিন দশেকের মধ্যে সিনারিও কমপ্লিট করে শোনাব।

কথাটা শেষ করে নির্মলবাবু চলে এলেন। চলে এলেন ভবানীপুরে।

ভবানীপুরে ইন্দুভূষণ দাসের একটা দোকান ছিল। সেই দোকানের উপরে ছিল একটা মেস। নির্মলবাবু সরাসরি চলে এলেন সেই মেসে। তার পর থেকে শুরু হয়ে গেল চিত্রনাট্য রচনা।

যথাসময়ে চিত্রনাট্য শেষ হ'ল। ঠিক দশদিন পর নির্মলবাবু চিত্রনাট্যের ফাইল নিয়ে হাজির হলেন এম. পি. স্টুডিওতে। মুরলীধরবাবুর কাছে।

মুরলীধরবাবু চিত্রনাট্য শুনলেন। খুশি হলেন বেশ। সঙ্গে সঙ্গে চিত্রনাট্যের রূপায়ণ প্রস্তুত। বললেন, নির্মলবাবু, এবার ছবি শুরু করুন—তার আগে কাস্টিং ঠিক করে নিন—

সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেছিলেন, একটা কথা, আমাদের স্টুডিওতে উত্তমকুমার মাইনে করা আর্টিস্ট, তাঁকে আপনি দেখতে পারেন, তবে আমি এ ব্যাপারে আপনাকে ইনসিস্ট করব না, আপনি ইচ্ছে করলে বাইরে থেকেও কাউকে নিতে পারেন।

খাঁটি প্রযোজকের মত উক্তি। একজন খাঁটি প্রডিউসার হিসাবে তিনি সেদিন বিন্দুমাত্র মিথ্যে বলেননি।

এসব কথা যখন শুনি তখন 'সঞ্জীবনী' ছবির কাজ প্রায় সমাপ্ত।

কথাগুলো শুনেছিলাম 'বসু পরিবার' ছবিতে সুযোগ পাবার পর। থাক সে কথা।

নির্মলবাবু কাজে নেমে পড়লেন।

এবার চিত্রনাট্যকে আরও খানিকটা ঝালাই করে নেওয়া দরকার। সুতরাং সে ব্যাপারে নির্মলবাবুকে সাহায্য করতে এলেন কবি শৈলেন রায়। শুরু হ'ল সংলাপ রচনা। কবি শৈলেন রায় আন্তরিক সাহায্য করলেন নির্মলবাবুকে।

সংলাপ রচনা শেষ হ'ল। ওদিকে চিত্রনাট্য ঝালাইয়ের কাজও সমাপ্ত।

সবাই আসর বসালেন। আসরে এলেন মুরলীধর চ্যাটার্জী, বিমল ঘোষ আর স্বয়ং পরিচালক নির্মল দে।

আবার চিত্রনাট্য পড়া হ'ল। রীতিমত আলোচনা হ'ল। আলোচনায় শেষ পর্যন্ত নায়ক নির্বাচিত হলেন অভি ভট্টাচার্য।

একটা বিকল্প হিসাব অবশ্য ধরা হ'ল। যদি অভি ভট্টাচার্যকে না পাওয়া যায় তা হলে নায়ক হিসাবে আহ্বান জানানো হবে অসিতবরণকে।

আমি নেপথ্যে বসে সব খবরই রাখছি।

অভি ভট্টাচার্য তখন বোম্বাইয়ে। আমার চিত্ত দুর্বল হচ্ছে মাঝে মাঝে। আমি মনেপ্রাণে কামনা করে চলেছি ওঁরা যেন একবার আমার কথা দয়া করে ভাবেন। আমার অবস্থায় থাকলে তখন এমন কামনা অনেকেই করতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু হায় রে ভাগ্য! ওঁদের দৃষ্টি যেন কিছুতেই আমার দিকে পড়তে চায় না। আগেই বলেছি, মুরলীবাবুর যে কথা সেই কাজ।

অভি ভট্টাচার্যের কাছে জরুরী টেলিগ্রাম করা হ'ল বোম্বাইয়ের ঠিকানায়। হাতে মাত্র ক'টা দিন। ক'টা দিনের মধ্যেই টেলিগ্রাম ফিরে এল। বোঝা গেল নির্দিষ্ট ঠিকানায় শিল্পী নেই।

যথাসময়ে নির্মলবাবুরা হাজির হলেন অসিতবরণের কাছে।

আমি তখন প্রহর গুনছি। একটা চাপা অস্থিরতা আমার ভিতরে।

অসিতবরণ অনেকগুলো ছবিতে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছেন বলে তিনি রাজী হতে পারলেন না। তারপর কাকে নায়ক নির্বাচন করা যায় সেই চিন্তায় তাঁরা রীতিমত অধীর। অস্থির। অনেক ভেবে অনেক চেষ্টা করেও একজন খাঁটি নায়ক তাঁরা নির্বাচন করতে সক্ষম হলেন না।

এদিকে আমার মানসিক অস্থিরতা ক্রমশই বাড়ছে। অথচ সাহস করে ওঁদের কাছে মনের কথাটা ব্যক্ত করতেও পারছি না।

এমন সময় নির্মলবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি দুরুদুরু বক্ষে দেখা করলাম। মাত্র কয়েকটা কথা। আমার সঙ্গে আলাপ করে নির্মলবাবু যে বেশ খুশি হয়েছিলেন তা তাঁর অভিব্যক্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। তবুও আমার সংশয়, যদি কাজটা না পাই! অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম, কাজটা যদি আমাকে দেন, আমি নিশ্চয় পারব—

শেষপর্যন্ত অনুগ্রহ করে ওঁরা আমাকে সুযোগ দিলেন।

'বসু পরিবার' ছবিতে আমি নায়ক চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। এ যেন চরম জয়ের আনন্দ।

নির্মলবাবু আমাকে যখন চরিত্র বুঝিয়ে দিলেন। যেদিন আমি চিত্রনাট্যের

সুখেনকে জানলাম, ঠিক সেইদিন থেকে নিজেকে সুখেনের আসনে বসিয়ে আমি চলতে শুরু করলাম।

এ কথা হয়তো কেউ বিশ্বাস করবে না, অনেকদিন পর্যন্ত আমি নিজেকে সুখেন ছাড়া আর কিছুই ভাবিনি। অল্পদিনের মধ্যে ছবির কাজ শুরু হয়ে গেল।

ওদিকে আরও একটি ছবিতে আমি তখন কাজ করে চলেছি। ছবির নাম 'কার পাপে'। কালীপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় ছবিটি উঠছিল।

'বস্ত্র পরিবার' ছবিতে কাজ শুরু করলাম। ওদিকে 'কার পাপে' ছবিটি মুক্তি প্রতীক্ষায়।

'বস্ত্র পরিবার' ছবিতে কাজ চলাকালীন বারকতক পোর্ট কমিশনার্সের সেই ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের চেয়ারে গিয়ে যে বসিনি তা নয়। যতক্ষণ সেখানে বসে কাজ করেছি ততক্ষণ আমাকে ঘিরে রেখেছে এই সুখেন।

ছবি শেষ হ'ল একসময়।

এসব ১৯৫২ সালের কথা। যে ১৯৫২ সালকে আমি আমার সমস্ত মন দিয়ে ঘৃণা করতাম সেই ১৯৫২ সালেই আমার ভাগ্যের চাকা সম্পূর্ণ ঘুরে গেল।

এই বছরে মাত্র-কয়েক মাসের ব্যবধানে পর-পর মুক্তি পেল 'সঞ্জীবনী', 'বস্ত্র পরিবার' আর 'কার পাপে'। 'সঞ্জীবনী'র ব্যর্থতা আর 'কার পাপে'র আশানুরূপ জনখ্যাতি না পাওয়া আমাকে যেন এক সুউচ্চ পর্বতচূড়া থেকে গভীর অতলে নিক্ষেপ করতে চাইল। যে মুহূর্তে আমি পতনের কানায় কানায় এসে দাঁড়ালাম, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার একান্ত আপনার 'সুখেন' আমাকে বাঁচিয়ে দিল। চরম খ্যাতি পেল 'বস্ত্র পরিবার'। প্রতিটি দর্শকের মুখে 'বস্ত্র পরিবারে'র খ্যাতি। ছবিটিও অবশেষে হিট করল।

সেই সঙ্গে আমার ব্যর্থতায় ভরা জীবনের ইতিহাসের পাতায় ১৯৫২ সালটি যেন সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে গেল। পত্র-পত্রিকা হ'ল মুখরিত। আমার নামটি বাদ দিয়ে সমালোচনার রেওয়াজ থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কয়েকটি পত্রিকায় আমি সমালোচনার স্তম্ভে স্থান পেলাম। আমার অভিযানের সামনে সাফল্যের যে সিংহদ্বার এতদিন রুদ্ধ ছিল, সহসা যেন সেই সিংহদ্বার হ'ল উন্মুক্ত। আমি যেন আমার বাঁচার আলোর নিশান স্পষ্ট দেখতে পেলাম। দিন যত যায়, 'বস্ত্র পরিবার' ব্যবসায়িক দিক থেকে যেন ততই আলোড়ন তুলতে থাকে। সেই সঙ্গে আমারও সুনাম।

এই ১৯৫২ সালের ২৪শে জানুয়ারী দিল্লীতে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হয়েছিল। এই সালের ৮ই নভেম্বর প্রভাদেবী মারা গেলেন। প্রভাদেবীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে আমি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলাম। অনেক স্মৃতি

মনে পড়ছিল সেদিন।

ইতিমধ্যে আমি কিন্তু চুপ করে থাকিনি। বরাবরই সব কিছু শেখার একটা স্পৃহা আমার ছিল। যখন স্কুলে পড়তাম তখন সাঁতার শিখতাম, ভলিবলও খেলতাম। আসলে বন্ধুবান্ধব আমাকে বলত, তুই একটু স্বাস্থ্যচর্চা কর—, তোর ঘোড়ের দিকটা একটু বাঁকা—কিন্তু অমনি থাকলে হীরো হীরো মানায় না—মেরুদণ্ড সোজা করতে হবে—আর তা করতে হলে এক্সারসাইজ করতে হবে—, আমি তাই করতে লাগলাম। ভলিবল খেললে নাকি ভাল হয়—আমি তাই খেলতাম। এর মধ্যে সিনেমার অভিনয় চলছে। এমন সময় আমার হিন্দী-উর্দু শেখার খুব ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু কার কাছে শিখি? কে শেখাবে আমাকে! খুব ভাবছি, মনে মনে মাষ্টারও খুঁজছি। সেটা ১৯৫০ অথবা ৫১ সালের কথা। একদিন অনুভাকে অর্থাৎ অনুভা গুপ্তাকে বললাম,—কথাটা। অনুভা বলল, এতে এত ভাববার কি আছে—আমি খুব ভাল মাষ্টার দেব—

তারপর একদিন আমি স্টুডিওতে একটা ফ্লোরে কাজ করছি—অনুভা বোধহয় তখন তপন সিংহের 'অঙ্কুশ' ছবিতে কাজ করছিল। ওর সংগে দেখা হলো। একজনের সংগে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, ইনি আমাদের মাষ্টারজী—এঁর কাছে তুমি শেখ। সংগে সংগে রাজী হয়ে গেলাম। মাসিক পঞ্চাশ টাকায় মাষ্টারজী আমাকে উর্দু-হিন্দী শেখাতে রাজী হয়ে গেলেন। সপ্তাহে তিনদিন।

প্রথম থেকেই ভদ্রলোকের ব্যবহারে আমি মুগ্ধ। মাষ্টারজীর আসল নাম জানতে পারলাম। নাম অমানুল হক। ইউ-পি'র ছেলে। খুবই ছেলেবেলায় কোলকাতায় চলে এসেছিলেন। এসেছিলেন কবিতা লিখতে। কোলকাতায় এলে নাকি ভাল করে কবিতা লেখা যাবে, কিন্তু এসে দেখেছিলেন, এই শহর তো কবিতার শহর নয়—এ শহর শুধু ইট-কাঠ-পাথরের শহর। কঠিন বাস্তবের শহর। সেদিন কীভাবে যেন আশ্রয় পেয়েছিলেন অমর মল্লিক আর ভারতী-দেবীর কাছে। মাষ্টারজী বলেছিলেন একদিন—ওঁরাই আমার মা-বাবার মত ছিলেন—ওঁরাই একদিন এই মাষ্টারজীর বিয়ে দিয়েছিলেন একজন হিন্দু-বাঙালী মেয়ের সঙ্গে!…

এই ছবিতেই প্রথমে অভিনয় করতে এলেন সুপ্রিয়া। ডাক নাম বেণু।

সুপ্রিয়া ব্যানার্জী এসেছিলেন আমার ছোট বোনের ভূমিকায় অভিনয় করতে। নবাগতা হিসেবে তিনিও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। মনে পড়ে, মনে পড়ে অনেক স্মৃতিতে ঘেরা আমার হারানো অতীত।

বড় বেশী করে মনে পড়ে আনন্দবাজার পত্রিকার সমালোচনা স্তম্ভ। 'বসু-পরিবারে'র সমালোচনায় আমার প্রসঙ্গে আনন্দবাজারের সেদিনের সমালোচনা

—"সুখেনের ভূমিকায় উত্তমকুমার মনে ধরার মত চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন—"

সেদিন থেকে হ'ল আমার নবজন্ম। আমি আগামীদিনের প্রতীক্ষায় রইলাম। মনে মনে সাধনা করে চললাম। পূজা করে চললাম অভিনয় শিল্পের। অর্ঘ্য সাজালাম আগামীদিনের দর্শকদের জন্ত।

ছবি তখনও চলছে। এদিকে আমি মেন আর পোর্ট কমিশনার্সের চাকরিতে মন বসাতে পারছি না।

সব কথা গৌরীকে খুলে বললাম। বললাম, গৌরী, এভাবে অফিসের কাজে যে আর ফাঁকি দিতে পারি নে—আমি চাকরিটা ছেড়ে দিতে চাই—ভবিষ্যতে যদি হেরে যাই তুমি আঘাত পাবে না তো?

গৌরী বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলেছিল, তোমার ব্যর্থতা—আমার ব্যর্থতা, তোমার সাফল্য—আমার সাফল্য। সুতরাং আঘাতের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। যে চাকরিটা একদিন অনেক চেষ্টা করে পেয়েছিলাম, সেই চাকরি আমি মুহূর্তে ছেড়ে দিলাম। চাকরিটা ছাড়তে গিয়ে সেদিন যে ব্যথা আমি পেয়েছিলাম তা আজ আর বলে কোন লাভ নেই। এটাই চরম সত্য যে আমি আর ফিরে যেতে পারিনি। আমি নিজের মনের কাছে দিন দিন অপরাধী হয়ে যাচ্ছিলাম। পোর্ট কমিশনার্সের চাকরির সঙ্গে আর বিশ্বাসঘাতকতা করা চলে না। চলতে দেওয়া উচিত নয়।

শেষ হয়ে গেল আমার কেরানী জীবন।

বিচিত্র এই ফিল্ম লাইন। 'বসু পরিবারে'র আশাতীত সাফল্যেও আমার ছবির সংখ্যা বাড়ল না। কয়েক মাস নিতান্ত বেকার আর অসহায় জীবনের মধ্যে এসে পড়লাম। কিছু কিছু ছবির কথা হয়, তবে কোন কাজে লাগে না।

নির্মল দে'র অবস্থা তখন পাল্টে গেছে। যে মানুষটি একদিন এই ফিল্ম-জগৎ থেকে একরাশ ব্যর্থতা নিয়ে শান্তিনিকেতনে নিতান্ত একক জীবন কাটাচ্ছিলেন, সেই মানুষটিই 'বসু পরিবারে'র সাফল্যে মাত্র কিছুদিনের মধ্যে পেলেন প্রতিষ্ঠা। অনেক অফার আসা সত্ত্বেও নির্মলদা কিন্তু নিজেকে সহজ করতে পারলেন না। একটা অফারও তিনি গ্রহণ করলেন না। ঠিক করেছিলেন আর ছবি করবেন না।

কিন্তু সব চিন্তাই ব্যর্থ হয়ে গেল। কিছুদিন পর এম· পি· প্রোডাকসন্স আবার ছবি করবেন ঠিক করলেন। এবারও ছবি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলেন নির্মলবাবুরই ওপরে। একটা হাসির ছবি তৈরি করার ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গেল। ছবির নামকরণ হ'ল 'সাড়ে চুয়াত্তর'।

আমি আগের মতই প্রতীক্ষায় রইলাম। এ ছবির নায়ক হিসাবে নির্মলবাবু

যে আমাকেই নির্বাচন করবেন এমন একটা স্থির সিদ্ধান্তে তখন পৌঁছে গেছি। ঠিক সময়মতই নির্মলবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন। যথাসময়ে আমাকেই 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে নির্বাচন করা হ'ল নায়ক হিসাবে।

যথারীতি ছবির প্রাথমিক কাজও এগিয়ে চলল। নায়িকা হিসাবে স্থির হ'ল মালা সিন্‌হার নাম। একদিন নির্মলবাবু আমাকে নিয়ে হাজির হলেন মালা সিন্‌হার বাড়িতে। কোলকাতার ভবানীপুরের জগুবাবুর বাজারের কাছে তখন থাকতেন মালা সিন্‌হা। মালা সিন্‌হা তখন বাংলা ছবির ক্ষেত্রে সুপরিচিত নাম। মালা সিন্‌হা রাজী হলেন না। অনেকগুলি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হবার জন্যই তিনি এই ছবিতে কাজ করতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিলেন। এবার নির্মলবাবুর সামনে নায়িকা বিভ্রাট।

সকলের তখন একই চিন্তা—কাকে নিয়ে কাজ করা হবে! নায়িকা-চিন্তায় সবাই যেন বিব্রত। হঠাৎ একটা নাম মনে পড়ল নির্মলবাবুর। রমা।

সুচিত্রাই রমা। সুচিত্রা সেন। সুচিত্রা সেন ইতিপূর্বে কয়েকটা ছবিতে কাজ করেছেন। দর্শক-মহলে তখন সুচিত্রা সেন ধরতে গেলে নবাগতা। সেই সুচিত্রা সেনকে এই ছবিতে নায়িকা-নির্বাচন করা হ'ল। আমি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যথাসময়ে ছবির কাজ শুরু হ'ল। নিয়মিত শুটিং আরম্ভ হ'ল 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবির।

ইতিমধ্যে আরো দু-তিনখানা ছবিতে আমি কাজ পেয়েছি। তখন ব্যস্ততাও বেড়েছে খানিকটা। বেশ খুশি খুশি মন নিয়ে আমি শুটিং করি।

তখন আমার ছুটো মুখ্য কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়ি থেকে স্টুডিও আর স্টুডিও থেকে বাড়ি। 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবির পাশাপাশি আরও কয়েকটা ছবির মধ্যে একটির নাম 'নবীন যাত্রা'। ইতিমধ্যে নীরেন লাহিড়ীও আমাকে নায়ক নির্বাচন করেছেন তাঁর হাসির ছবি 'লাখ টাকা'য়।

নিউ থিয়েটার্সের 'নবীন যাত্রা' ছবিরও নায়ক নির্বাচিত হয়েছি আমি। পাশাপাশি তিনটি ছবির কাজ করে চলেছি। ক্লান্তি আমাকে এতটুকুও স্পর্শ করেনি। নিজেকে একটুও ব্যস্ত বলে মনে হয় না। আনন্দে খুশিতে আমি কাজ করে চলেছি : এমন সময় নরেশ মিত্র মহাশয় আমাকে ডেকে পাঠালেন।

নটশেখর নরেশ মিত্র তখন আমার কাছে প্রণম্য। নরেশদা তখন যেমন নাট্য জগতের মধ্যগগনে, তেমনি চিত্রজগতেও সুপ্রতিষ্ঠিত। চিত্রপরিচালক হিসাবে একটি সুপ্রসিদ্ধ নাম। তিনি আমাকে ডেকেছেন জেনে নিজেকে গর্বিত মনে করলাম। আমি ছুটে গেলাম। আমাকে বসতে বললেন নরেশবাবু। শান্ত সাবলীল কণ্ঠে বললেন, আমার ছবিতে অভিনয় করার জন্য তোমাকে

ডেকে পাঠিয়েছি, কবিগুরুর গল্প 'বৌঠাকুরাণীর হাট'। রোলটা বড় টাফ, প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে, পারবে তো?

সঙ্গে সঙ্গে আমি উত্তর দিলাম, হাঁ, আপনার সুযোগ্য শিক্ষা পেলে ভালই করব।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস—নরেশদা বোধকরি বেশ খুশি হলেন। বললেন, ব্যস তাহলেই হবে।

ছবির নায়ক নির্বাচিত হলাম আমি। ছবির বিষয়ে নানা আলোচনা প্রসঙ্গে 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ছবি করার কারণ জানালেন তিনি। বললেন, আমি যখন 'গোরা' করেছিলাম সেইসময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে কথাপ্রসঙ্গে এই গল্পের চিত্ররূপ দিতে বলেছিলেন, আমি কবির সেই নির্দেশ পালন করতে চলেছি।

অবশেষে সেই ছবিতেও কাজ আরম্ভ করে দিলাম।

নরেশ মিত্র আমাকে তাঁর অভিনয় শিক্ষা দিয়ে এমনভাবে সাহায্য করলেন যা কোনদিন বিস্মৃত হব না।

এল ১৯৫৩ সাল।

এই বছরটি আমার জীবনে স্থিতি এনে দিল। মুক্তি পেল 'সাড়ে চুয়াত্তর'। তারপর এই একই বছরে পর পর আরও তিনখানা ছবি মুক্তি পেল—'নবীন যাত্রা', 'বৌঠাকুরাণীর হাট' এবং 'লাখ টাকা'।

'সাড়ে চুয়াত্তর' মুক্তি পেল প্যারাডাইস সিনেমায়।

প্যারাডাইস তখন ছিল অন্যতম প্রথম শ্রেণীর চিত্রগৃহ। বাংলা ছবি এই হাউসে মুক্তি পাওয়া যেন একটা বিরাট কৃতিত্বের পরিচয় বহন করা। এম.পি.-র কর্তৃপক্ষ যেন সেই কৃতিত্বই অর্জন করলেন।

ফলাও করে বিজ্ঞাপন দিলেন। বিজ্ঞাপনে মুখ্য বিষয়বস্তু হ'ল প্যারাডাইস।

আমার মনটা ভীষণ দমে গেল। কিছুতেই এম.পি.-র প্রচার বিভাগ আমার নামটা বিজ্ঞাপনে দিতে রাজী হলেন না। অবশেষে সে ব্যাপারেও আমার উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল। অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ আমার নামের ব্যাপারে এতটুকুও আমল দিলেন না।

ছবি মুক্তি পেল।

যথারীতি সাংবাদিকরাও ছবির সমালোচনা করলেন। আমি আবার আগের মতই ছবির সমালোচনার স্তম্ভ হাতড়ে বেড়াতে লাগলাম।

আনন্দবাজার আবার লিখল—"রামপ্রীতির ভূমিকায় উত্তমকুমারকে বেশ স্মার্ট দেখা গেল, অভিনয়ও স্বচ্ছন্দ"। সত্যি কথা বলতে কি এতেই আমার মন ভরে গেল। কিন্তু বিজ্ঞাপনে নজর পড়লেই আমি ভীষণ দুঃখ পেতাম। 'সাড়ে

চুয়াত্তর' ছবির বিজ্ঞাপনে প্রথম যে কথা ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল তা ছিল এইরকম—"প্যারাডাইস চিত্রগৃহে বাংলা ছবি"

বিজ্ঞাপনে তারপরই দ্বিতীয় অ্যাট্রাকশন ছিল, তুলসী চক্রবর্তী অভিনীত একটা ছবি। নায়ক হিসাবে আমার কোন হদিশই রইল না বিজ্ঞাপনের কোথাও। আমি নগণ্য—আমি সামান্য। বিজ্ঞাপনে নাম পাবার অধিকার তখনও আমি পাইনি। মনকে নানাভাবে সংযত করলাম।

একমাত্র 'সাড়ে চুয়াত্তর' জনসমাদর পেল। বাকি ছবিগুলি একই বছরের মধ্যে মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে আবার আমাকে ভারাক্রান্ত করে দিয়ে গেল। চারখানা ছবির মধ্যে তিনখানাই ফ্লপ, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি থাকতে পারে? তবুও আমি ভাঙিনি। নিজেকে এতটুকুও দুর্বল ভাবিনি।

চেনা-অচেনা অনেকেই আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ছবিতে আমার অভিনয় নাকি সকলেরই ভাল লেগেছিল। সেই প্রশংসায় নিজেকে অনেকটা শক্ত করে রেখেছিলাম। খুশি দিয়ে নিজেকে ভরিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম।

বেশ মনে পড়ে। মনে পড়ে স্বয়ং নরেশদা একবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকের কাছেই আমার প্রশংসা করেছিলেন তখন। তিনি বেশ গর্বের সঙ্গেই বলেছিলেন, "উত্তম যে একদিন অসাধারণ অভিনেতা হবে তা আমি 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ছবি তৈরি করার সময় ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলাম। একজন বাধ্য ছাত্রের মত ও আমার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। যেখানে বুঝতে পারেনি বার বার আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে। ওর ধৈর্য দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। খুশি হয়েছি অভিনয়ের প্রতি ওর আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখে।"

অনেকবার অনেকজনের কাছেই আমার অসাক্ষাতে নরেশ মিত্র মশাই আমার এই প্রশংসার মানপত্র ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, যা ভাবলে আজও আমি গর্ববোধ করি।

সেদিনের কথা আজ মনে পড়ে।

'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর নায়ককে ঘোড়ায় চড়তে হবে। অথচ আমি তখন ঘোড়ায় চড়া প্রসঙ্গে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। নরেশদা তো ভীষণ চিন্তায় পড়লেন। আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ঘোড়ায় চড়তে পারবে তো? কথাটা আমাকে খুব ভীত করে তুলল। মনে মনে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়লাম।

মনে হ'ল, যদি বলি ঘোড়ায় চড়তে পারি না তাহলে নরেশদা হয়তো আমাকে বাতিল করে দেবেন। সুতরাং সত্যকে স্বীকার করে নেবার মত মন তখন আমার নেই। কি উত্তর দেব ভাবছি।

নরেশদা আমার পিঠ চাপড়ে সস্নেহে বললেন, বুঝেছি, তা এতে ঘাবড়াবার কি আছে? ঘোড়ায় চড়াটা তো তোমাকে একেবারে আয়ত্তে আনতে হবে না, মোটামুটি যদি একটু ওঠা-নামাটা শিখে নিতে পার তা হলেই চলবে—ভালই হবে।

আমার মনে তখন অবাক প্রশ্ন, চলবে কেমন করে? অথচ সরাসরি জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হচ্ছে না।

নরেশদা আবার বললেন, ভাবছ কি করে চলবে, তাই না? তুমি ঘোড়ায় ওঠা আর নামাটা আয়ত্তে আনতে পারলে বাকিটুকু আমি ডামি দিয়েই চালিয়ে নেব।

কথাটা শুনলাম বটে, তবে মন ভরল না। আমার তখন ঘোড়ায় চড়া শেখবার প্রবল ঝোঁক চেপে গেল। নরেশদাকে ব্যাপারটা সেই মুহূর্তে খুলে বললাম না। ভাবলাম ঘোড়ায় চড়া পুরোপুরি আয়ত্তে আনতে পারলে সবাইকে অবাক করে দেওয়া যাবে।

অবশেষে ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলবার কাজ শুরু করে দিলাম। এবং মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই আমি সেই কাজটা আয়ত্তে আনলাম।

সেই দৃশ্যের শুটিং-এর দিন সত্যিই অবাক করে দিলাম সবাইকে। নরেশদা আমার এই ব্যাপারে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। সবাইকে ডেকে ডেকে বলেছিলেন, যেদিন ঘোড়ায় চড়ার সিনটা টেক করলাম সেদিন আর ডামির প্রয়োজন হ'ল না। পুরোপুরি উত্তমকে দিয়েই দৃশ্যটা গ্রহণ করেছিলাম, আর তা থেকেই মনে হয়েছিল—

আমি আজ খুব বড় অভিনেতা হয়েছি কিনা জানি না, তবে সেদিন নরেশদাকে আমি খুশি করতে পেরেছিলাম। নরেশদার সেদিনের ভবিষ্যদ্বাণী আমার জীবনে যে কী মূল্য এনে দিয়েছে তা ঠিক বোঝাতে পারব না।

পর-পর তিনটি ছবি ব্যবসার দিক থেকে ব্যর্থ হলেও অনেকগুলো ছবিতেই আমি তখন নির্বাচিত হয়ে আছি। মোটামুটিভাবে তখন ছবির জগতে নিজেকে বেশ খানিকটা ব্যস্ত করে ফেলেছি আমি। দু-চারখানা ছবির কাজ চলছে। বাকি ছবিগুলি শুটিং-এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন সময় পাবলিক স্টেজে অভিনয় করার জন্যে আমাকে আহ্বান জানানো হ'ল।

স্টেজে অভিনয় করতে হবে জেনে আমি আনন্দিতই হয়েছিলাম। আনন্দিত হয়েছিলাম এই কারণে যে, বাংলাদেশের মঞ্চকে আমি ছোটবেলা থেকেই মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করতাম। স্টেজের সঙ্গে আমার ছিল রক্তের সম্বন্ধ। একেবারে স্টার থেকে অফার এল অভিনয় করবার।

১৯৫৩ সাল।

এই সালটি আমার শুধু নয় ভারতীয় চলচ্চিত্রেরও এক স্মরণীয় সাল। এই সালে ভারত সরকার গর্বের সংগে ঘোষণা করলেন যে শ্রেষ্ঠ ভারতীয়-রাষ্ট্রীয় ছবির জন্যে পুরস্কার দেওয়া হবে। রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের প্রবর্তন হ'ল।

সেবার স্টার থিয়েটারকে নতুন করে সাজানো হয়েছে। স্টার থিয়েটারের মালিক সলিল মিত্র পুরনো স্টারকে ভেঙে একেবারে আনকোরা নতুনভাবে তৈরি করলেন। চারিদিকে প্রচার ছড়িয়ে পড়ল 'বঙ্গরঙ্গমঞ্চের উন্নতি সাধনকল্পে দীক্ষিত রঙ্গালয়'। এই সময়ে এই থিয়েটারে যুগ্ম পরিচালক হিসেবে যুক্ত হলেন শিশির মল্লিক আর যামিনী মিত্র। ওঁরা ঠিক করলেন স্বর্গীয়া সাহিত্যিক নিরুপমা দেবীর সুবৃহৎ উপন্যাস 'শ্যামলী'কে নাটকাকারে স্টারের পাদপ্রদীপে উপস্থিত করবেন। নাট্যরূপ দেবার জন্য দেবুবাবুকে ওঁরা আহ্বান জানালেন। দেবুদা, অর্থাৎ দেবনারায়ণ গুপ্তকে নাট্যকার ও চিত্রপরিচালক হিসেবে আমি তখন বেশ ভাল করেই জানি।

মনে আছে। ১৯৪৬ সালে যখন আমি 'ওরে যাত্রী' ছবিতে শুটিং করছিলাম তখন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে অন্য একটি ফ্লোরে দেবুবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম চাক্ষুষ দেখা। আলাপ তখনও হয়নি। আমার সঙ্গে আলাপ না হতেই, আমার একটা সেটে একটু অভিনয় দেখে সেদিনকার দেবনারায়ণ গুপ্ত যে উক্তি করেছিলেন তা কোনদিনই বিস্মৃত হব না। রাজেনবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন দেবুদাকে, কেমন লাগল?

সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, বেশ ভাল লাগল ভদ্রলোকের অভিনয়, দুর্গাদাসের পর মনে হ'ল ইনি দ্বিতীয় নায়ক। টিকে থাকলে বাংলাদেশের ছবির জগতে নায়কের অভাব ইনিই পূরণ করতে পারবেন।

সেই দেবনারায়ণ গুপ্তের নাট্যরূপায়িত 'শ্যামলী'তে আমার ডাক এল।

নাট্যরূপ দেওয়া শেষ হলে শুরু হ'ল নাটকের চরিত্র বন্টন। নায়ক আর নায়িকা হিসাবে কাদের নেওয়া হবে তখন সেই ভাবনা যেন ওঁদের গ্রাস করেছে। ইতিমধ্যে সুলালদা মানে জহর গাঙ্গুলী স্টারে যোগ দিয়েছেন। জহর গাঙ্গুলীর তখন নিদারুণ প্রতাপ। তাঁর কোন উপদেশ বা প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা তখন অনেকেরই ছিল না। সেই জহর গাঙ্গুলীই একসময়ে স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের কাছে আমার নামটা প্রস্তাব করেছিলেন। সুলালদার প্রস্তাবই তৎক্ষণাৎ মেনে নিয়েছিলেন তাঁরা। তবে সিনেমার সঙ্গে যে নায়ক জড়িত সেই নায়ক এসে মঞ্চের অভিনয় কতটুকু ফুটিয়ে তুলতে পারবে তাই নিয়ে তখনও তাঁদের সংশয়। তবুও ওঁরা আমাকে মঞ্চে অভিনয় করার জন্য আমন্ত্রণ

জানালেন। আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজী হয়ে গেলাম। যথাসময়ে হাজির হলাম স্টার থিয়েটারে।

মহলা শুরু হ'ল। এ-কথা স্বীকার করতে আজ আমি গর্ববোধ করি যে, রিহার্সাল চলাকালীন আমি একদিনের জন্যও কাজে গাফিলতি দেখাইনি। যথাসময়ে হাজিরা দিতাম রিহার্সালে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আমি চরিত্রটি ভাল করে বুঝে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিনি। পরিচালকের নির্দেশ যেখানে মনে ধরেনি, সেখানে সেই মুহূর্তে আমি চুপিচুপি দেবুদার কাছে আমার সাজেশন পেশ করেছি। নিজেকে ঝালাই করে নিয়েছি। পরিচালক যখন যেভাবে আমাকে দিয়ে অভিনয় করিয়েছেন তখনই ঠিক সেইভাবে তাঁকে আমি ফলো করেছি। এতটুকুও ক্লান্তি বোধ করিনি। অবশেষে 'শ্যামলী'র অনিল আমার ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়াল।

১৯৫৩ সালের ১৫ই অক্টোবর স্টারে 'শ্যামলী' মঞ্চস্থ হ'ল।

বাবা-মাকে প্রণাম করে আমি পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ালাম। অভিনয় করলাম। এক এক রাতের অভিনয় শেষ হয়, আর সকলেই কেন জানিনে আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। অনেকেই আমার অভিনয় শেষে মেক-আপ রুমে আসেন আমাকে অভিনন্দন জানাতে।

আমার খুশির মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলল।

ওদিকে তখন পর-পর অনেকগুলো ছবিতেই আমি অভিনয় করে চলেছি। অনেকগুলো ছবির ব্যাপারে চুক্তিপত্রে সইও করেছি। চিত্রজগতের অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আমাকে তাঁদের ছবির জন্য নির্বাচিত করেছেন।

এইসব ছবির মধ্যে স্কুমার দাশগুপ্তের 'ওরা থাকে ওধারে' এবং 'সদানন্দের মেলা', নরেশ মিত্রের 'অন্নপূর্ণার মন্দির', নিউ থিয়েটার্সের 'বকুল', 'অগ্নি-পরীক্ষা', 'চাঁপাডাঙার বৌ', 'কল্যাণী', 'গৃহপ্রবেশ', 'মন্ত্রশক্তি', 'মনের ময়ূর'। একদিকে পাদপ্রদীপের সামনে সপ্তাহে তিনদিনের চারটি শো ও অন্য ছুটির দিনে 'শ্যামলী'র বিশেষ শো-তে দর্শকদের অভিবাদন জানানো, অন্যদিকে কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ছুটে বেড়ানোর মধ্যে আমি যেন নতুন করে বাঁচার আনন্দ উপভোগ করছি।

অল্পদিনের মধ্যে 'শ্যামলী' রীতিমত জমে উঠল। প্রত্যেকটি দর্শকের মুখে বোবা শ্যামলীর ভূয়সী প্রশংসা, অন্যদিকে অনিলের খ্যাতি। বলা প্রয়োজন, শ্যামলীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

পত্র-পত্রিকা শ্যামলীর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল। থিয়েটারের ক্ষেত্রে এবার খবরের কাগজের সমালোচনা স্তম্ভ আমাকে হাতড়ে বেড়াতে হ'ল না।

মনে পড়ছে আর স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো এক এক করে সরে যাচ্ছে। মনে পড়ছে ৩•|১•|৫৩ তারিখের কথা। কে যেন খানকতক খবরের কাগজ নিয়ে আমার সামনে এসে হাজির। কাগজগুলো আমাকে দিয়ে বলেছিল, দেখ। আমি দেখেছিলাম আনন্দবাজার তার নিরপেক্ষ মন্তব্য পেশ করেছে—

"অনিলের ভূমিকায় উত্তমকুমার পর্দার চেয়ে মঞ্চের অভিনয়েই বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নাটকখানি জমে ওঠায় তাঁর অভিনয় অনেকখানি সাহায্য করেছে—"

সেই একই তারিখের স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা মেলে ধরলাম চোখের সামনে—

"Young and personable Uttam Kumar, already a film favourite, is a delightful (if at times overimpulsive) answer to the producer's problem of juvenile leads for the stage. He should soon learn that exuberance and effectiveness are not necessarily in direct ratio."

স্টার থিয়েটারের জনসমাগম উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল। আজ ভাবলেও আনন্দ লাগে, স্টার থিয়েটার আমার নাম প্রচার ইস্তাহারে দিয়েছিলেন এই রকম—অনিলের ভূমিকায় "উত্তমকুমার (ফিল্ম)"।

'শ্যামলী'র জনপ্রিয়তা যত শিখরে পৌঁছতে থাকে, পত্র-পত্রিকাও তত মুখর হতে থাকে। ৬|১১|৫৩ তারিখে যুগান্তরে সমালোচনা-স্তম্ভে বেরিয়েছিল—

"ভাবপ্রবণ অভিনয়ে নায়কের ভূমিকায় উত্তমকুমার সফল কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং মঞ্চাভিনেতারূপে তাঁর আবির্ভাবকে সার্থক করে তুলেছেন···"

এমনি করে একরাশ সাফল্যের আনন্দে আমার মন ভরে উঠল। আমাদের সেই পঙ্গু সংসারটা তখন অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছে। আমাকে ঘিরে গৌরীর স্বপ্ন যেন সার্থকতার দ্বারপ্রান্তে। আমার ব্যস্ততায় সে খুশি। আমার আনন্দে সে আনন্দিত। খানিকটা ব্যস্ততার জন্য 'শ্যামলী' থেকে কিছুদিনের জন্য অবসর নিলাম।

অঙ্গীকার করে এলাম আবার ফিরে আসব স্টারে, শ্যামলীর জন্য।

এল ১৯৫৪ সাল।

এই বছরে পর-পর অনেকগুলো ছবির মুক্তির পালা। দু-এক মাসের ব্যবধানে ছবিগুলো মুক্তি পেতে শুরু করল। সবগুলো ছবিই সাফল্য লাভ করল। পর-পর দশখানি ছবি মুক্তি পেল এই বছরে।

নির্মল দে পরিচালিত 'চাঁপাডাঙার বৌ' ছবিতে আমি নাকি অসামান্য অভিনয় দক্ষতার নজির রেখেছি। আনন্দবাজারের সমালোচনা-স্তম্ভে পরোক্ষ-

ভাবে এই বিশেষণ প্রথম বর্ষিত হ'ল। আনন্দবাজার আবার লিখল—

"অনেকের মনে হয়তো উত্তমকুমারই সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন···"

আমার অভিনয়ের প্রশংসা তখন আমি ঘরে বসেই শুনতে পাই। 'চাঁপা-ডাঙার বৌ' ছবিতে আমার অভিনীত চরিত্রের নাম ছিল 'মহাতাপ'। সেই মহাতাপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। এই বছরের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে সুশীল মজুমদারের 'মনের ময়ূর' মুক্তি পেল। এই ছবির মাধ্যমে আমার অভিনয়ের খ্যাতি আবার ছড়িয়ে পড়ল। ওঁরাই বোধ করি বেশী করে স্বীকৃতি দিলেন বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে। কাগজের বিজ্ঞাপনেও আমার নাম মুদ্রিত হ'ল।

এর মাঝেও দুঃখের বিষয় হ'ল 'কল্যাণী' ছবিতে কিন্তু প্রকারান্তরে আমাকে অপমানই করা হয়েছিল। এই ছবির বিজ্ঞাপনে আমার ছবি ছাপা হ'ল কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আমার নামটাও বিজ্ঞাপনে ছাপা হয়নি। তখনকার 'দেশ' পত্রিকায় এই ছবির একটা বিজ্ঞাপন দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একটি ডিজাইনে অনেক শিল্পীর মধ্যে আমার ছবিটাও ছিল। কিন্তু আমার নাম ছিল না। ছবিটি উত্তরা-পূরবী-উজ্জ্বলায় মুক্তি পেয়েছিল।

সেদিন এইসব ব্যাপারে আঘাত পেলেও মুখ বুজে সহ্য করেছিলাম, খ্যাতির প্রত্যাশায়।

ইতিমধ্যে আমার আর রমার যুগ্ম অভিনয়-খ্যাতি ছবির দর্শকদের কাছে সমাদৃত। আমাদের মত রোমান্টিক জুটি নাকি ইতিপূর্বে বাংলা ছবির জগতে আসেনি। আমরা নাকি বাংলা ছবির জগতের অসহায় অবস্থা মুছে ফেলতে এসেছি—এমন একটা ধারণাও অনেকেই পোষণ করতেন। বোধ করি ওঁদের ধারণার অপমৃত্যু ঘটল না। রমা অর্থাৎ সুচিত্রা সেন আর আমি দর্শকদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলতে থাকলাম। 'অগ্নিপরীক্ষা' মুক্তি পেল। অকল্পনীয় জনসমাদর পেল ছবিটা।

এই ছবির জনপ্রিয়তাই বোধ করি আমাকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দিল। রোমান্টিক জুটি হিসেবে তখন আমার আর সুচিত্রা সেনের একটা বিশেষ স্থান রচিত হ'ল দর্শক-মহলে। দৈনিক সংবাদপত্র আর অন্যান্য সাময়িক পত্র-পত্রিকা এগিয়ে এলেন আমাদের সাহায্য করতে—অভিনন্দিত করতে।

নানা কাগজে তখন নানা মন্তব্য। তারই কয়েকটি নমুনা আমি উপস্থাপিত করছি এখানে।

'মরণের পরে' ছবির জন্য লেখা হ'ল—"প্রণয়ের দিকটা রসোজ্জ্বল।"

'সদানন্দের মেলা' ছবির জন্য বর্ষিত হ'ল—"অনন্যসাধারণ প্রণয়ের অংশ পরিবেশন।"

'অগ্নিপরীক্ষা' ছবির প্রশংসার মানপত্রের বাণী হ'ল—"শান্ত অথচ উন্মনা প্রণয়াতুর।"

এমনি ধরনের কত অভিনন্দনের জয়টিকা পরতে থাকলাম আমরা দু'জনে।

নিজেকে ধন্য মনে হতে লাগল। ধন্যপূজারী হিসাবে মনে মনে তাই আগামীদিনের দর্শকদের জন্য পূজার অর্ঘ্য সাজাতে লাগলাম। সেই প্রসাদ যদি গণদেবতা গ্রহণ করেন তা হলেই সার্থক জন্ম, সার্থক হবে সাধনা আমার।

একটি একটি করে দিন চলে যায় আর অতিক্রম করতে থাকি একটা একটা করে খ্যাতির সোপান।

'শ্যামলী' নাটক তখনও অপ্রতিহত অবস্থাতেই চলছে। ৫৮৮ রাত্রির অভিনয় যখন তখন হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমার অসুস্থতা দেখেই বাবা-মা লালুকে ডেকে পাঠালেন। লালুই আমাদের বাড়ির প্রাথমিক চিকিৎসা করত। বলা হয়নি, লালু ডাক্তারী পড়েছিল। এম. বি. বি. এস. ডাক্তার। প্রথম দিকে লালুও কাকার ডাক্তারখানায় হাত পাকাচ্ছিল। সেই লালু আমাকে পরীক্ষা করে শেষপর্যন্ত বড় ডাক্তার দেখাবার মতামত দিল। ডাঃ নলিনী সেনগুপ্ত এলেন। লালু আর ডাঃ সেনগুপ্ত জানালেন বাইশ দিন সম্পূর্ণ বেড রেষ্ট। জানতে পারলাম, আমার প্যারাটাইফয়েড হয়েছে। ছেলেবেলা থেকে মাঝে মধ্যে একটু সর্দি-কাশি ছাড়া আর বড় রকমের অসুস্থতা আমার ছিল না, এই সূত্রপাত। আমি শয্যা নিলাম।

বলেছিলাম আবার ক'টা দিনের মধ্যে ফিরে আসব ষ্টারে। সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছিলাম। শেষের দিকে যখন ষ্টারে অভিনয় করছি সেই সময়ে বোধহয় ১৩৫৫-৫৬ সালে আমাদের লুনার ক্লাবের সিলভার জুবিলী উৎসব হলো। আমি বললাম, উৎসবে ষ্টারের সবাইকে দিয়ে আমরা পাড়ায় শ্যামলী নাটক করব। কথাটা সলিল মিত্র মশাই শুনেছিলেন। একদিন মিত্র মশায়ের পক্ষে শিশির মল্লিক আমাকে শ্যামলী নাটক করতে বারণ করলেন। বললেন, যে নাটক ষ্টারে চলছে সেই নাটক কোন পাড়ার প্যাণ্ডেলে হবে না। শিশিরবাবুর কোন আপত্তি কেউ মানলেন না। সরযূ মা অর্থাৎ সরযূ দেবী, সাবিত্রী এমনকি ষ্টারের সকলেই একবাক্যে বললেন—হবে। এটা আমাদের বাড়ির থিয়েটারের মত, সুতরাং আমরা করবোই। শেষপর্যন্ত সবার দাবী জয়ী হলো। শুধু শ্যামলী নাটকটি নেবার কথা ভেবেছিলাম, এবার হলো ঠিক তার উল্টো। ষ্টারের পুরো ষ্টাফ শুধু নয়—সেট-লাইট সব নিয়ে এসে আমাদের বাড়ির সামনে নরেশ বসুর বিরাট মাঠে ষ্টেজ তৈরি করে সেই শ্যামলী হয়েছিল। সাবিত্রীর বাবার রোলে অভিনয় করেছিল লালু (রবি

রায়ের পরিবর্তে) আমি সেই অনিলের পার্ট করেছিলাম। বিজয় চ্যাটার্জী, শম্ভু ব্যানার্জী (এরা আমার আত্মীয়) অভিনয় করেছিল। স্থলালদা অসুস্থ ছিলেন বলে তাঁর রোলে অভিনয় করেছিল বুড়ো। তরুণকুমার। তারপর বেশিদিন থাকা হয়নি। ছবির ব্যস্ততা এড়িয়ে আর আমি ফিরে আসতে পারিনি 'শ্যামলী'র আঙিনায়। একটি ছবির কাজ শেষ করি, আবার একটি আহ্বান আসে। ছবির সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লাগল। জনপ্রিয়তাও বাড়ছে। ঠিক এমন সময় আমাকে একটা মর্মান্তিক ঘটনার সম্মুখীন হতে হ'ল। মনে পড়ছে সেদিনকার সেই বিকৃত নিয়মের ছবিগুলো।

সিনেমা জগতে সেদিন যে রীতি চালু ছিল আজ অবশ্য তা নেই। সেই বিকৃত রীতির আমি স্বয়ং একজন শিকার ছিলাম, এই মুহূর্তে সেই কথাই আমার মনে পড়ে গেল। মাঝে মাঝেই মনে পড়ে। মনে পড়লে ব্যথিত হই। মনটা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চায়।

জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে কি জানি কেন তখনকার সেই জঘন্য মনোবৃত্তির মানুষগুলোর সামনে আমার রুখে দাঁড়াতে ইচ্ছে হয়েছিল। রুখে দাঁড়াতে পেরেছিলাম প্রচলিত বিকৃত সেই রীতি ভেঙে দেবার জন্য। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম যদি এই ঘৃণা ধারাকে ভেঙে দিতে না পারি তা হলে আমার মূল্য কোথায়, সেই কথা ভেবে।

নিজের মূল্য যাচাই করবার জন্য সেদিন আমি বিন্দুমাত্র উৎসাহিত হইনি। ওঁদের মূল্য ওঁরা পান সেই ইচ্ছাটাই যেন তখন আমাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। আমার মনে হয়েছিল ছবির জগতে যাঁদের মূল্য সবচেয়ে বেশী, যাঁরা ছবি তৈরির প্রাণস্বরূপ, তাঁদের যদি প্রতি পদক্ষেপে অপমান মাথায় নিয়ে চলতে হয় তা হলে ওঁরা যে একদিন ফুঁসে উঠবেনই। আমি ওঁদের অর্থাৎ আমার প্রিয় কলাকুশলীদের মনের সেই জ্বালা উপলব্ধি করেছিলাম মর্মে মর্মে। ওঁরা অর্থাৎ সিনেমা জগতে যাঁরা সাহেব নয়, বিবি নয়, শুধুমাত্র গোলাম। সেই বিচিত্র ধারা বা রীতি কেমন ছিল তারই একটা ছবি তুলে ধরি এখানে।

নামকরা শিল্পীদের জন্য স্পেশাল খাদ্যের আয়োজন করবেন প্রডিউসাররা। আর অল্প দামী শিল্পী ও নিম্নস্তরের কলাকুশলীদের জন্য অতি সাধারণ খাদ্যের ব্যবস্থা। যাকে বলে অখাদ্য। খাদ্য পরিবেশনেও প্লেটের পরিবর্তে শালপাতা।

মনে পড়ে, প্রথম প্রথম সেই শালপাতায় আহার করার দিন একদিন আমারও ছিল। ওদের নিয়মের সঙ্গে আমারও খাবার আসত একই নিয়মে। আমি মাথা নীচু করে খেতাম ওদের পাশে বসে। সেইভাবেই হয়তো মুখ

বুকে সব সহ্য করতে পারতাম যদি আমার ক্ষেত্রেও সেই রীতি চালু থাকত আজও। কিন্তু চালু থাকল না। দেখলাম, আমি যেন রাতারাতি জাতে উঠে গেছি। আমার জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা। আমার জন্ত স্পেশাল খাগু।

ঠিক এই মুহূর্তে অনিলের কথা মনে পড়ছে। অনিল চ্যাটার্জী।

অনিল আমার বন্ধু। আমার প্রথম দিনের বন্ধু। চকচকে ছেলে। সদা হাস্তময়। সে তখনও সিনেমার অভিনেতা হয়নি। আমি তখন মোটামুটি কাজ করে চলেছি। আমাদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব অম্লান। আমরা অনেকটা সময় একসঙ্গে কাটাতাম। খেলতাম। পাড়ার নানা পুজো-পার্বণ নিয়ে মেতে থাকতাম। হঠাৎ শুনলাম অনিল সিনেমা লাইনে এসেছে।

আমি জানি বড় উঁচু আশা নিয়ে সে এসেছিল এখানে। আশা ছিল অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর হবে। তারপর ভাল করে কাজ শিখে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডিরেক্টর হবে। তারপর আরও আরও বড় হবে। বিরাট এক শিল্পীমন ছিল তার। অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজও পেয়েছিল সে। মাঝে-মধ্যে আবার সিনেমার পর্দায় অভিনয়ও করত।

ঠিক এমন সময় কি যেন একটা ছবিতে আমি অভিনয় করছি, আর সেই ছবিতে আমার সঙ্গে অনিলও অভিনয় করছে। শুটিং-এর লাঞ্চব্রেকের সময় আমি অনিলকে ডাকলাম। বললাম, চল, আজ আমরা একসঙ্গে খেতে বসব।

অনিলের কেমন যেন সংকোচ। তবুও বোধকরি আমার অনুরোধ সে এড়াতে পারল না। আমরা যথাস্থানে খেতে বসলাম। খাবার এল। আমার খাবার প্লেটে সাজানো আর অনিলের সামনে শালপাতায় অতি সাধারণ খাবার। মুহূর্তে আমার শিরা-উপশিরাগুলো যেন টনটন করে উঠল। আমার ভিতরকার মানুষটা রাগে আর উত্তেজনায় যেন ফুঁসে উঠল। আমি চিৎকার করে উঠতে চাইলাম। অনিল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমাকে সংযত করার চেষ্টা করল। আমি নীরবে আমার প্লেটটা সরিয়ে রাখলাম।

মুহূর্তে কথাটা সারা স্টুডিওতে রটে গেল। প্রডিউসার তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন! আমি রীতিমত উত্তেজিতভাবেই তাঁকে বললাম—সবাইকে যদি সমান সম্মান দিতে না পারেন তাহলে এ খাবার আমি খাব না, আর কোনদিন এভাবে আমার জন্ত স্পেশাল ব্যবস্থা করে এঁদের অপমান করবার চেষ্টা করবেন না।

উপস্থিত সকলেই তখন আমার কথাকে মেনে নিলেন এবং সব কিছুরই নতুন রূপ দেখা দিল। এরপর থেকে আস্তে আস্তে সেই প্রথার অবসান হ'ল। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

এই ১৯৫৫ সালেই যখন সুস্থ হয়ে আবার স্টারে যোগ দিলাম, তখন একদিন অভিনয় চলা কালীন আমি স্টেজেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। খবর পেয়ে বাড়ির সবাই যখন স্টারে এসে পৌঁচেছিল তখন অবশ্য আমি আবার সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম। অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্যই বোধকরি এমনটা হয়েছিল।

যাহোক এই বছরে পর-পর বারোটা ছবি মুক্তি পেল। সব ছবিই সার্থকতার সোপান পেরুতে পারল না। তবে তার মধ্যে কয়েকটি ছবির অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তা আমার অভিনেতা জীবনকে যেন আরও পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেল।

মুক্তি পেল 'হ্রদ'। অর্ধেন্দু সেনের পরিচালনাধীন এই ছবিতে একজন স্মৃতিভ্রষ্ট যুবকের চরিত্রে আমি অভিনয় করেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি সেই দুরূহ চরিত্রটি যখন পরিচালক আমাকে শুনিয়েছিলেন তখন বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা আমাকে ভর করেনি। ছবিটার আগাগোড়া সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট। চরিত্রটিকে বাস্তবায়িত করার কোন ত্রুটিই আমার ছিল না। তা ছাড়া সন্ধ্যারানীর আন্তরিক দরদভরা অভিনয়ের সহযোগিতায় ছবিটা শেষ পর্যন্ত চমক সৃষ্টি করল।

সমালোচকরা বললেন, "উত্তমকুমার স্মৃতিভ্রষ্ট যুবকের চরিত্রে প্রথম আবির্ভাব থেকেই দর্শকমনে একটা সম্মোহনী প্রভাব বিস্তার করেন যে ছবি খানিক দূর এগিয়ে যাবার পর ওঁকে না পেলে যেন দর্শকমন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।" নানা কথা। নানা প্রশংসা। কেউ কেউ উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে বলেই ফেললেন, আমি নাকি গ্রেগরি পেক-এর সমতুল্য অভিনয় করেছি। আবার অনেকে বললেন, "হ্রদে উত্তমকুমারের শিল্পী-জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়—"

এরপরই মুক্তি পেল আরও দু'খানা ছবি। একটি তপন সিংহের 'উপহার,' আর মৃণাল সেনের 'রাতভোর'। তারপর মুক্তি পেল 'সাঁঝের প্রদীপ'। এ ছবির পরিচালক ছিলেন সুধাংশু মুখার্জী। নায়িকা ছিলেন সুচিত্রা সেন। অনেকেই বললেন, চিত্রনাট্যের দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও উত্তমকুমারের অভিনয়ে ছবিটা উৎরে গেছে। আনন্দবাজারের সমালোচনা আমাকে সেদিন ভীষণ আনন্দ দিয়েছিল।

আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়েছিল, "সুমন্তর জীবন নিয়ে চিত্রনাট্যে ছিনিমিনি খেলা হলেও উত্তমকুমারের অভিনয়ের জন্যই চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে—"

এই ছবির কিছুদিন পর এল 'অনুপমা'। অগ্রদূত পরিচালিত ছবি। এই ছবিতে আমার বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন সাবিত্রী চ্যাটার্জী।

এই সময়ে আমার প্রধানত দুটি কাজ হয়ে গেল। শুটিং করে বাড়ি ফেরা আর ছবির সমালোচনা স্বচক্ষে দৃষ্টি রাখা। এই ছবির ক্ষেত্রে সমালোচকদের উক্তি—

"উত্তমকুমার···অভিনয়ের একটা নতুন মান দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন—"

বিশ্বাস করুন, আমার সর্বশক্তি উজাড় করে দিয়ে আমি তখন মরিয়া হয়ে গেছি সমালোচকদের এই প্রশংসা-বাণীর যথাযথ মর্যাদা বজায় রাখতে।

মুক্তি পেল 'রাইকমল' ছবি। সুবোধ মিত্র ছিলেন পরিচালক, আর আমার বিপরীতে নায়িকা ছিলেন কাবেরী বসু। তারপর একে একে মুক্তি পেল 'দেবত্র', 'শাপমোচন', 'বিধিলিপি', 'উপহার', 'কঙ্কাবতীর ঘাট', 'ব্রতচারিণী' আর 'সবার উপরে'।

এই সাল অর্থাৎ ১৯৫৫ আমার জীবনের গতি পাল্টে দিল। প্রায় প্রত্যেকটি ছবিই খ্যাতির শীর্ষে। উল্লেখযোগ্য জনপ্রীতি পেল 'শাপমোচন', 'সবার উপরে', আর আগেই বলেছি 'হ্রদ'।

চারিদিকে, এমন কি প্রায় সবার মুখেই আমার প্রশংসা। খ্যাতি তখন শুধুমাত্র দর্শক-মহলে সীমাবদ্ধ নয়, সাংবাদিক-মহলেও। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের সাংবাদিকরা ইতিমধ্যে বি. এফ. জে. এ. (বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন) নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র বাংলাদেশে নয়, তামাম ভারতে এই প্রথম। বি. এফ. জে. এ. প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ সালে। এবং এই বছর থেকেই শুধু ভারতীয় ছবি নয় বিদেশী ছবিও সাংবাদিকদের বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করতে থাকে। আবার শুধুমাত্র ছবিই নয়, শিল্পী এবং বিভিন্ন বিভাগীয় কলা-কুশলীদেরও শ্রেষ্ঠ কর্মকীর্তির জন্য সাংবাদিকরা একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কারে ভূষিত করেন।

১৯৫৫ সালেই আমার নায়ক-জীবনকে সার্থক করে তুললেন তাঁরা। যখনই শুনলাম সাংবাদিকদের বিচারে ১৯৫৫ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে আমি পুরস্কৃত হতে চলেছি, তখনই খুশিতে আমি টলমল করে উঠেছিলাম। যথাসময়ে 'হ্রদ' ছবির জন্য তাঁরা আমাকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মানে ভূষিত করলেন।

ভয় হত। ভীষণ ভয় হত—এত প্রশংসা আমার কপালে টিকবে তো!

তাই প্রশংসার জোয়ারে আমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভাসিয়ে দিতে রাজী হলাম না। আমার শুধু কাজ করার আকাঙ্ক্ষা।

শুনলাম, স্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী' দীর্ঘ কয়েক রজনী অতিক্রান্ত হবার পর

স্তিমিত হয়ে এসেছে। অথচ এদিকে অনেক ছবির অঙ্গীকার। অনেক ছবির দায়িত্ব। অনেক ব্যস্ততা। তবুও স্টারের সেই স্তিমিত অবস্থায় নিজের দিয়ে আসা প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করতে পারলাম না, চলে এলাম স্টারে আবার।

আবার নিয়মিত অভিনয় করতে লাগলাম অনিলের ভূমিকায়।

এমন সময় আর এক নতুন আশার আলো দেখতে পেলাম। যে সরল পথ ধরে আমি ছুটে চলেছিলাম, সহসা দেখলাম সেই সরল সরণী যেন বাঁক নিয়েছে। দুটি পথের সঙ্গমস্থলে এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। কয়েক মুহূর্তের ভাবনা। ভাবলাম এবার কোন্ পথ ধরে আমার চলা উচিত! অনেক ভেবে অবশেষে সোজা পথই বেছে নিলাম। হিন্দী ছবিতে অভিনয় করার প্রলোভন আর আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিলাম।

মনে আছে, একবার সাংবাদিক ও প্রচারবিদ বি. খা মশাই এসেছিলেন আমার কাছে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বোম্বাইয়ের একজন খ্যাতনামা প্রযোজক প্রতিনিধি। খা-জী জানতে চাইলেন, আমি হিন্দী ছবিতে অভিনয় করতে ইচ্ছুক কিনা। ইচ্ছে আমার ছিল না তা নয়। এমন কি পার্টনারশিপেও হিন্দী ছবিতে অভিনয় করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেই ইচ্ছেটাকে দমন করলাম তখনই, যখন জানতে পারলাম বম্বে গিয়ে শুটিং করতে হবে।

রাজী হতে পারলাম না। আমার মনে হয়েছিল, এখানে বাংলা ছবির পাশাপাশি হিন্দী ছবি তৈরি হলে আর্থিক স্বচ্ছলতা আসবেই। অথচ তার পরিবর্তে বাংলা ছবির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে একেবারে নির্বাসনে চলে যাবার মত যেতে হবে বোম্বাইতে। অসম্ভব! মন সাড়া দিল না। তখন আমার অনেক ছবিতে চুক্তি। খা-জীর কথায় রাজী হতে পারলাম না।

১৯৫৫ সালে 'শ্যামলী'র শেষ অভিনয় ঘোষিত হ'ল। আমি সেই শেষ অভিনয় দিনেও শ্রদ্ধার সঙ্গে অনিলকে তুলে ধরলাম দর্শকদের সামনে। ১৩ই নভেম্বর 'শ্যামলী' শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার পেশাদারী মঞ্চে অভিনয় শেষ হয়ে গেল। একরাশ আশা নিয়েই ফিরে এলাম। মঞ্চ থেকে ফিরে এলাম আবার মঞ্চে ফিরে আসব এই আশা নিয়ে।

শুরু হল ১৯৫৬ সাল।

যে দিনটি দিয়ে বছরের শুরু সেইদিনই মুক্তি পেল 'সাগরিকা'। ছবিটি মুক্তি পাবার আগে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। বহু অর্থ ব্যয় করে 'সাগরিকা'র প্রচারপর্ব চলতে লাগল। অসাধারণ খরচ প্রচারে। ছবি মুক্তি পেলে আমার বিস্ময়ের মাত্রা যেন আরও বাড়ল। সেইদিনই উপলব্ধি করলাম খ্যাতির বিড়ম্বনা অনেক। একদিকে যেমন প্রশস্তি অন্যদিকে তেমন জেলাসি।

জানি না কেন, সেদিন আমার অভিনয় দেখে এক মজার মন্তব্য পেশ করলেন সাংবাদিকরা। খবরের কাগজে বেরুল—

"উত্তমকুমার যতটা পেরেছেন করেছেন—"

এই মজার মন্তব্য প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বেশ খানিকটা দমে গেলাম। আমার ভীষণ অভিমানও হয়েছিল তখন।

আমি যাঁদের সর্বশেষ 'রায়'-এর জন্যে অপেক্ষা করি, সেই দর্শকরা কিন্তু একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়ে দিলেন। তাঁদের ঐকান্তিক চাহিদায় 'সাগরিকা' ছবিটি সিনেমার ভাষায় সুপারহিট হ'ল।

তারপর সেই একই বছরে পর পর কয়েকটা ছবি মুক্তি পেল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'সাহেব বিবি গোলাম', 'লক্ষহীরা', 'চিরকুমার সভা', 'একটি রাত', 'শঙ্করনারায়ণ ব্যাঙ্ক', 'শ্যামলী', 'ত্রিযামা', 'নবজন্ম', 'পুত্রবধূ'। আমার অভিনীত ছবির যেন জোয়ার এসেছে! প্রায় প্রতিটি ছবিই হিট্। ছবিগুলোর ব্যবসায়িক সাফল্য মানে আমারও প্রতিষ্ঠার আসন শক্ত হওয়া। তাই হ'ল।

আমি একটু একটু করে আমার সেই ব্যর্থতা আর হতাশার অতীতটা ভুলে যেতে থাকলাম। আমি শুধু ব্যস্ততার ঘূর্ণিপাকে ঘুরপাক খাচ্ছি। আমার পাশে পাশে ঘুরপাক খাচ্ছেন অনেকেই। আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য ব্যস্ত।

একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করলাম, অনেক চিত্রনাট্যকার, অনেক পরিচালক আমাকে প্রাধান্য দিয়ে চিত্রনাট্য লিখতে ব্যস্ত। ব্যস্ত প্রযোজকরা।

পরিচালকরা, অর্থাৎ যাঁরা আমাকে নিয়ে ছবি করেন, তাঁরা গোটা ছবিতে কী ভাবে আমাকে ছড়িয়ে দেবেন সেই ভাবনায় বিভোর হয়ে যেতে লাগলেন। লক্ষ করলাম, আমার সঙ্গে যদি কোন দৃশ্যে কোন নতুন বা সদ্য-পরিচিত শিল্পী অভিনয় করেন, পরিচালকেরা সেখানেও চিত্রনাট্যের চাহিদা মেটাতে রাজী নন। উদ্দেশ্য গোটা ছবিতে আমাকে ইউটিলাইজ করা।

ক্যামেরায় কি ভাবে আমাকে প্রাধান্য দেওয়া যায় ক্যামেরাম্যান বা পরিচালকরা সেদিকে সজাগ। এসব আমার বিন্দুমাত্র ভাল লাগত না। আমি যেন আমার সহকর্মী শিল্পীদের মধ্যে (অবশ্য যাঁরা নবাগত) আমার সেই অতীতের আমাকে দেখতে পেতাম। আমার মনে একটা ক্ষোভ জন্মাত। মনে মনে ভাবতাম ক্যামেরায় কেন ওদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না!

পারলাম না। নিজেকে কিছুতেই সংযত করে রাখতে পারলাম না। একদিন আমার মনের ভেতরকার সেই ক্ষোভ প্রকাশ করে ফেললাম। এই ঘটনা ঘটে গেল অনিল চ্যাটার্জীকে ঘিরে।

সেই ছবিটার নাম কি ছিল ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

ছবিতে আমার সঙ্গে অভিনয় করছে অনিল। একটা শট। সেই শটে আমাদের দুজনকেই দরকার। শুটিং জোনে আলো প্রস্তুত হ'ল। আমরা দুজনেই মনিটার দিলাম। ফাইন্যাল টেকিং হবে। সবাই প্রস্তুত। হঠাৎ আমার পজিশন থেকে লক্ষ্য করলাম ক্যামেরা এমন জায়গায় রয়েছে যেখান থেকে টেক করলে সম্পূর্ণ প্রাধান্য অনিই পাব। অথচ চিত্রনাট্য অনিলের প্রাধান্যই প্রত্যাশা করছে। করা উচিত। ব্যাপারটা অসহ্য লাগল আমার। এই অসহযোগিতামূলক মনোভাবের জন্যে আমার ভেতরকার ক্ষোভ বেরিয়ে এল। প্রতিবাদ করা দরকার মনে হ'ল। বললাম, যদি শটটা নিতে চান তা হলে আমাদের পজিশন চেঞ্জ করুন—

পরিচালক বিস্মিত হলেন। আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। আমিও ছাড়বার পাত্র নই। সহজেই তাঁকে আমার এই প্রতিবাদের কারণ বিশ্লেষণ করলাম। খুশি হলাম, পরিচালক যথারীতি আমার এই নির্দেশ বা অনুরোধ মেনে নিলেন। শটটিতে অনিলের প্রাধান্য দেওয়া হ'ল। আমিও সেদিন হাসি মুখে কাজটা শেষ করে এসেছিলাম।

ঠিক এমনি ধরনের ব্যক্তিত্বের আসনে আমার প্রিয় দর্শকরা আমাকে পৌঁছে দিয়েছেন। এইভাবে আমি আমার কর্তব্যে অটল রইলাম।

যে কাজের জন্যে একদিন আমি স্টুডিওর দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, আজ সেখানেই আমি একমাত্র কাজের মধ্যে ডুবে গেছি।

এসব ১৯৫৬ সালের কথা।

এই বছরে আমার অভিনীত প্রায় এগারোখানা ছবি মুক্তি পেল।

বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' ছবির ভূতনাথ চরিত্রটির ওপর আমার একটা দুর্বলতা ছিল প্রথম থেকেই। উপন্যাসটি যখন প্রথম পড়ি তখন থেকেই। দেশ পত্রিকায় বিমলবাবু ওদিকে ধারাবাহিক লিখছেন, এদিকে আমি পড়ছি।

এমন সময় একদিন পরিচালক কার্তিক চ্যাটার্জী আমার বাড়িতে এলেন।

ব্যাপার কি!

বললেন, 'সাহেব বিবি গোলাম' উপন্যাসের চিত্ররূপ দেবেন তিনি। আমাকে ভূতনাথের চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। রাজী হয়ে গেলাম তখনই।

এই বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত সব ছবিই সাফল্য অর্জন করল। আমার মন আর মেজাজও বেশ খানিকটা খুশি। এমন সময় বুড়ো, অর্থাৎ আমার ভাই তরুণ আমার কাছে এসে বলল, দাদা, তোমার সঙ্গে একটা ছেলে দেখা করতে এসেছে—

কে ছেলেটি? আমার প্রশ্ন।

তরুণ বলল, ছেলেটির নাম বিশু। কয়েকটা ছবিতে নামছে, থিয়েটার করে।

তোমার কাছে একটা বিশেষ দরকার বলেই এসেছে, একটু দেখা কর—

চরমতম ব্যস্ততার মধ্যে একটু সুযোগ করে নিলাম। বললাম, অমুক দিন দেখা করতে বলিস—

নির্দিষ্ট দিনে আমার ভবানীপুরের বাড়িতে এসে হাজির হ'ল ছেলেটি। নম্রতা আর বিনয়ের সঙ্গে আমাকে একটা প্রণাম করল। সুশ্রী মিষ্টি ছেলেটি। আমি ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মধ্যে যেন অতীতের আমাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। মনে হ'ল একরাশ স্বপ্ন বুকে নিয়ে সেই পথ-পরিক্রমায় ক্লান্ত অতীতের অরুণ এসে দাঁড়িয়েছে বর্তমানের উত্তমের সামনে।

ওকে বসতে দিলাম। বললাম, কি ব্যাপার?

ছেলেটি অতি বিনয়ের সুরেই বলল, আমার নাম বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। রঙমহলে 'সাহেব বিবি গোলাম' হবে। ওঁরা আমাকে ভূতনাথের চরিত্রে সিলেক্ট করেছেন। সিনেমার ভূতনাথের রোলে আপনার অসাধারণ অভিনয় আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। আপনার কাছ থেকে ঐ চরিত্রটা একটু ভাল করে বুঝে নিতে চাই—যদি একটু বুঝিয়ে দেন—

বিশ্বজিতের সেই আন্তরিক স্নেহকামনা আমি ভুলতে পারব না।

স্ক্রীন-অ্যাকটিং আর স্টেজ-অ্যাকটিং-এর মধ্যে কি পার্থক্য তাই সেদিন বেশী করে জানতে চেয়েছিল সে। খুশি হলাম। মনে হ'ল, এই আন্তরিকতা এই নিষ্ঠার জন্য ও একদিন পপুলার আর্টিস্ট হবে।

প্রায় দু'তিন ঘন্টা ধরে সেদিন ওকে ভূতনাথের চরিত্রটা বুঝিয়ে দিলাম। কথা দিয়েছিলাম, যদি রোজ সকালে সে আমার কাছে আসে, আমি আমার সীমিত জ্ঞান দিয়েই ওকে তৈরি করে দেব—

তারপর রঙমহলে যতদিন ও রিহার্সাল দিয়েছে, ততদিনই সকালে আমার কাছে আসতে ভোলেনি।

এত ব্যস্ততার মধ্যেও বিশ্বজিতকে নিয়ে অনেকগুলো ঘন্টাই আমি কাটিয়ে দিয়েছি। এ আমার সময়ের অপব্যবহার নয়, আমার কর্তব্য সম্পাদন মাত্র। এই কর্তব্য থেকে চ্যুত হলে আমার এই অস্তিত্বই থাকে না।

প্রতিদিন ব্যস্ততা! চরম ব্যস্ততা!

আমাকে যেন আমার সংসারজীবন থেকে এই ব্যস্ততা টেনে বার করে নিয়ে যেতে চায়। এই কলকাতায়, আবার এই হয়তো ভারতের অন্য কোন প্রান্তে। একদিকে ইনডোর অন্যদিকে আউটডোর। কিন্তু একটা মজার কথা কি জানেন? এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমি কিন্তু আমার গানকে ভুলে যাইনি।

যখনই একটু অবসর পেয়েছি তখনই বসেছি গানের চর্চা নিয়ে।

মাঝে মাঝে গানও গেয়েছি, গানের ব্যাপারে গৌরী বোধকরি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে বেশী। আবার ঠাট্টাও কম করেনি সে। গৌরীর জন্যই গান থেকে আমার সরে আসা চলেনি তখনো। আমি ছবিতে প্লে-ব্যাকও করেছিলাম।

'নবজন্ম' ছবিতে নেপথ্য গায়ক হিসেবেও অংশগ্রহণ করেছিলাম আমি।

দেবকীকুমার বসু পরিচালিত 'নবজন্ম' ছবির নেপথ্যে গাইবার জন্য যখন অফার পেয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করেছিলাম আমি। এতটুকুও দ্বিধা বোধ করিনি। নচিকেতা ঘোষ ছিলেন সেই ছবির সুরকার। আমার বেশ মনে পড়ে, তাঁরই সুরে এই ছবিতে একখানা দুখানা নয়—একেবারে ছ-ছ'খানা গান গেয়েছিলাম আমি। এই প্রসঙ্গে আর একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। সে-সব ঘটনা স্মৃতি হয়ে গেছে আজ।

মনে পড়ে একদিন এক অনুষ্ঠানের কথা। অনুষ্ঠানে আমি গায়ক হিসেবে আমন্ত্রিত। আমন্ত্রিত হয়েও মাত্র একটা গান শোনাবার জন্য সেদিন আমি চরম ব্যাকুল হয়েছিলাম। বার বার শুধু অনুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষদের কাছে ধর্ণা দিয়ে চলেছি। শুধু স্তোকবাক্য। রয়ুন, এবার আপনার প্রোগ্রাম। একজনের পর একজন প্রোগ্রাম শেষ করে চলে যেতে লাগলেন, অথচ আমার আর ডাক পড়ে না। তবুও সেদিন আমি বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হইনি। ব্যথা পাইনি। সেই অনুষ্ঠানে আমি প্রথম দেখেছিলাম নচিকেতা ঘোষকে। তখন অবশ্য নচিবাবু সবে উঠছেন। মাঝে-মধ্যে দু-একখানা গানের সুর করছেন। বাজারে সম্ভবত দু-চারটে রেকর্ডও বেরিয়েছে।

বিভিন্ন জলসার আসরে নচিকেতা ঘোষ নামটা মাঝে মাঝে দেখা যায়। সেই সুবাদেই ঐ নামটিকে আমি জেনেছিলাম। অতি সামান্য পরিচয়ও যে ছিল না তা নয়। এই সময় জগন্ময় মিত্র, সুধীরলাল চক্রবর্তীর সময়। লোকে ওঁদের পেলে যেন আর কাউকে চায় না। নচিকেতা ঘোষ এই সময়ে আমাদের ভবানীপুর পাড়ায় এসেছেন একটা অনুষ্ঠানে। আমিও বসে আছি নিতান্ত অবহেলার পাত্র হয়ে। সেখানেও আবার দেখা হয়। আবার পরিচয়।

পরবর্তীকালে সেই নচিকেতা ঘোষের সুরেই আমি গাইলাম 'নবজন্ম' ছবিতে। এই আর একটা মধুর স্মৃতি নিয়েই শেষ হয়ে গেল ১৯৫৬ সাল।

একটি করে বছর শেষ হয় আর আমি একটু করে ব্যস্ততার মধ্যে ডুবে যাই। ছবির তালিকাও বাড়তে থাকে। আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পাই আমার মামার সেই বাণী। আমি যেন সেই অতীত ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পাই। নিজেকে ধন্য মনে করি। এটা তো অস্বীকার করা চলে না যে একরাশ ব্যস্ততার মধ্যে

ডুবে যেতে চেয়েছিলাম। কাজই হোক আমার বিলাস, তাই তো ছিল আমার লক্ষ্য। আমি যেন সেই বিলাসকে আরও বেশী মাত্রায় উগ্র করে তুললাম। ইতিমধ্যে ছবির প্রযোজক হিসেবেও আমি নেমে পড়েছি। একদিকে একাধিক ছবির শুটিং, অন্যদিকে আমার নিজস্ব ছবি 'হারানো সুর'-এর কাজ।

'হারানো সুর' ছবির পরিচালনার জন্য এলেন অজয় কর। শুধুমাত্র পরিচালক হিসেবেই এলেন না, এলেন আমার অংশীদার হিসেবেও।

ছবির শুটিং যথাসময়ে শুরু হয়ে গেল। এমন সময় একদিন একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেললাম আমি। হারানো সুরের কোন ক্ষতিতে যে আমার ক্ষতি সে ভাবনা আসেনি আমার। নিজের স্বার্থের জন্য আমি অন্যদের সঙ্গে অন্যায় কোন ব্যবহার তো করতে পারি না। সেইজন্য যত বিপদের মুখেই আমাকে যেতে হোক না কেন তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। ঘটনাটা ছিল এই রকম।

ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে 'হারানো সুর'-এর সেট তৈরি হয়েছে। সবই প্রস্তুত। সুচিত্রা সেনের খ্যাতিও তখন শিখরে। তাঁর একটি 'ডেট', তখন অনেকখানি মূল্যবান। তিনিও সেই ডেটে ও সেটে অভিনয় করবেন। শুধু ডেট দেওয়া নয়, যথাসময়ে সেটে হাজিরও হয়েছেন।

ওদিকে আমি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সানন্দে শুটিং করছি মানু সেনের 'হারজিৎ' ছবিতে। মানু সেনের অনুরোধ আমি সেদিন প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। একবেলা শুটিং না করে দিলে ওঁরা নাকি ভীষণ বিপদে পড়বেন। ওঁরা নাকি সর্বনাশের অতলে তলিয়ে যাবেন। অগত্যা কথা দিয়েছি। ওদিকে আমি 'হারানো সুর'-এর স্বত্ব প্রযোজক-অভিনেতা হয়ে যে রসাতলে চলে যাব তার খবর রাখে কে? তবুও উপায় নেই।

নিতান্ত নিরুপায় হয়েই সরাসরি ইন্দ্রপুরীতে চলে এলাম শুটিং করতে। শুটিং করছি। অনেক সময় কেটে গেছে। ওদিকে যে অজয় করকে কতটা বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছি তা ভাববার অবকাশ নেই তখন আমার। আমার সারা মন জুড়ে তখন 'হারজিৎ'। এমন সময় আমাদের প্রোডাকশন-ইন-চার্জ ক্ষিতিশ এল হন্তদন্ত হয়ে। আমি দূর থেকে দেখলাম আমার দেরি দেখে ক্ষিতিশ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আসছে। ও এসে দেখল আমি শুটিং নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত। ফলে যতটা রাশভারী ভাব নিয়ে এসেছিল ঠিক ততটা মুখ না খুলে ফিরে গেল। ফিরে গেল অজয়বাবুর কাছে।

আমি শুটিং করে চলেছি। এমন সময় দেখি মুখ কাঁচুমাচু করে স্বয়ং অজয় কর এসে হাজির আমার সেটে। আমি হাসিমুখেই এগিয়ে গেলাম অজয়বাবুর কাছে। নিতান্ত অসহায় সুরে বললাম, অজয়দা, আমি নিরুপায়, আপনি বরং

আজ শুটিং ক্যানসেল করুন। তা না হলে মাছু সেনরা একদম মারা পড়বে।

অজয় করের চোখে বিস্ময়ের ছাপ। বিস্ময়ের আতিশয্যে তিনি যেন চমকে উঠলেন। অজয়বাবু বললেন, ওদিকে তুমি নিজেও যে মরছ, অত কস্ট্লি সেট, তার উপরে মিসেস সেনের ভ্যালুয়েবল্ ডেট—সবই তো তোমাকে হারাতে হবে। ভেবে দেখ।

তখন আর ভেবে দেখার কোন উপায় নেই। বললাম, ও সব তো আমাদের নিজেদের ব্যাপার, যত বিপদই হোক মাথা পেতে নিতে হবেই—

অবশেষে অজয় কর হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। সেদিন আমি ব্যস্ততার এমন পর্যায়ে যে, নিজের ছবির সর্বনাশ ডেকে এনে অন্যকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর।

ভাবছি। সব ভাবছি। ভাবতে আজ ভালই লাগছে।

১৯৫৭ সাল একটা বিরাট পরিবর্তনের ঝড় তুলে দিয়ে গেল আমার জীবনের ওপর দিয়ে। এই সালে বারোখানা ছবি মুক্তি পেল। প্রায় প্রতিটি ছবি এনে দিল অনন্যসাধারণ সাফল্য।

আমার ব্যস্ততার আনন্দে উদ্বেলিত মনে হঠাৎ আঘাত হানল সেই 'বড়দিদি'। 'বড়দিদি' যখন নতুন করে আবার তৈরি হ'ল আমি তখন সুরেনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। প্রথমবার এই ছবিটি তৈরি করেছিলেন নিউ থিয়েটার্সের কর্তৃপক্ষ। তখন সুরেনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন পাহাড়ী সান্যাল।

আমার অভিনীত সুরেন দেখে সমালোচকরা বললেন—

"উত্তমকুমার সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রে প্রাণ সঞ্চার করতে পারেননি। তাকে এই ভূমিকায় জড়বৎ দেখে চিত্রামোদীরা দুঃখ পাবেন, শরৎ-সাহিত্যানুরাগীরাও।"

এই সমালোচনায় আঘাত পেয়েছিলাম, কিন্তু ভেঙে পড়িনি। মনে হয়েছিল, আমার অনুশীলনে নিশ্চয়ই ত্রুটি আছে। তাই আগামী দিনের জন্য ভেতরে ভেতরে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলাম। সেই চিড়-খাওয়া মনে প্রশান্তির প্রলেপ দিয়ে গেল 'অভয়ের বিয়ে'। 'অভয়ের বিয়ে' ছবিটিও আবার নতুন করে তৈরি হয়েছিল। এই ছবিতে আমি যে চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম, সেই নায়কের চরিত্রে প্রথম অভিনয় করেছিলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য। এই ছবির ক্ষেত্রে সকলেই, এমন কি সমালোচকরাও আমার প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন। ' এবার আমার অনেকটা খুশি হবার কথা।

এরপর মুক্তি পেল 'তাসের ঘর'। এই ছবিতে আমি প্রথম দ্বৈত-ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। দুটি ভিন্নধর্মী চরিত্র। 'তাসের ঘর' ছবির জন্য যখন আমাকে নির্বাচিত করা হ'ল, তখন এই দ্বৈত-ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে

ভেবে খুশি হয়েছিলাম। ছবি যথাসময়ে মুক্তি পেল। সকলেই বললেন, অসাধারণ অভিনয় করেছি আমি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

এর পর মুক্তি পেল 'পথে হল দেরি'। বাংলাদেশে ছবির জগতে এই ছবি একটা নতুনত্বের স্বাদ নিয়ে এসেছিল। গেভাকলারে রঞ্জিত প্রথম বাংলা ছবি। আর সৌভাগ্যবশত সে ছবির নায়কও আমি।

ছবিটি দর্শকমহলে মোটামুটি একটা প্রশংসা পেল। তারপর আমার জীবনে এল আর এক স্বর্ণময় সময়। ছবি মুক্তি পেল 'চন্দ্রনাথ'। আমার অভিনয়-জীবনে যতগুলি স্মরণীয় ঘটনা আছে, তার মধ্যে স্মরণীয় হয়ে রইল এই 'চন্দ্রনাথ'।

মেট্রো সিনেমার মত অভিজাত প্রেক্ষাগৃহে বাংলা ছবি প্রদর্শিত হতে পারে, এমন চিন্তা ইতিপূর্বে অনেকের মনে এলেও তা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেননি। পারলেন 'চন্দ্রনাথ' ছবির কর্তৃপক্ষ। সেই মেট্রো সিনেমায় মুক্তি পেল 'চন্দ্রনাথ'। আমার গর্ব সে-ছবির নায়কও আমি। অসাধারণ সাফল্য লাভ করল ছবিটি। এদিকে সুপারহিট হ'ল আমাদের ছবি 'হারানো সুর'।

আগেই বলেছি, আমি আর অজয়বাবু অর্থাৎ অজয় কর, মিলিত ভাবে ছবিটি প্রযোজনা করেছিলাম। আমাদের যে সংস্থা ছিল তার নাম 'আলোছায়া'। এরই ব্যানারে মুক্তি পেয়েছিল 'হারানো সুর' প্রতিটি দর্শক শ্রীমতী সুচিত্রা সেন ও আমার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পত্র-পত্রিকা হয়েছিল প্রশংসায় মুখর। 'হারানো সুর' শুধু আর্থিক সাফল্যই আনেনি, সেই সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের বিচারে ছবিটি সম্মানিতও হয়েছিল দিল্লীতে।

১৯৫৭ সালে রাষ্ট্রপতির 'সার্টিফিকেট অব মেরিট' পেল 'হারানো সুর'। আমি আমন্ত্রিত হলাম দিল্লীতে। যথাসময়ে হাজির হয়েছিলাম। মাননীয় রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বহস্তে তুলে দিলেন সেই পুরস্কার আমার হাতে। প্রথম প্রযোজিত ছবির সম্মানে সেদিন আমি খুশি হয়েছিলাম।

এরপর সবগুলি ছবিই আমাকে সার্থকতার শিখরে পৌঁছে দিল।

বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে স্মৃতির মুক্তা কুড়িয়ে তোলার আনন্দ আমাকে আজ যেন এক নতুন অনুভূতির আবেশে বার বার ভরিয়ে তুলছে।

মনে পড়ছে সেদিন আমি কি আনন্দই পেয়েছিলাম!

মনে পড়ে 'হারানো সুরে'র সাফল্যে বিমলবাবুর কথা। বর্ধমান সিনেমার কর্ণধার বিমলবাবু জানালেন, আমাদের তিনি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্বর্ধনা জানাতে চান। তাঁর সিনেমা হাউসে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজনও করেছেন। আমরা বর্ধমানে যেতে রাজী হলাম। এই অনুষ্ঠানে শুধু আমাকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল অজয় কর, অসিত চৌধুরী এবং

আরও অনেককেই। বলাবাহুল্য, অসিত চৌধুরী মশাই ছিলেন 'হারানো সুরে'র পরিবেশক অধিকর্তা। কথা ছিল জি. টি. রোডের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বিমলবাবু গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবেন, আর আমরা সেখান থেকে বিমলবাবুর গাড়িতে করে একটা গোপন পথ ধরে সরাসরি হাজির হবো হাউসে।

আমরা যথাসময়ে পৌঁছে গেলাম। গিয়েই দেখলাম বিমলবাবু নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করছেন। গাড়িতে উঠলাম। আমাদের নিয়ে গাড়ি ছুটে চলল বর্ধমানের দিকে। সিনেমা হাউসের উদ্দেশ্যে।

তারপর আমাদের গাড়ি যখন বর্ধমানে ঢুকলো, গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েই তো আমাদের চক্ষুস্থির। অগণিত মানুষের ভিড় সেই সিনেমা হাউসের সামনের মাঠে। কৌতূহলী মন নিয়ে ভাবছি, কি ব্যাপার! কোন গণ্ডগোল হয়নি তো! আমাদের গাড়ি হাউসের পিছন দিকে ঢোকামাত্র একদল লোক একেবারে আমাদের গাড়ির ওপর এসে পড়ল। আর আমার কানে ভেসে আসতে থাকল 'জয় উত্তমদা কি জয়', স্লোগান।

সেটা ছিল শীতকাল। অথচ আমরা তখন গাড়ির ভেতরে ঘেমে স্নান করে গিয়েছি। আমাদের তখন রীতিমত নাভিশ্বাস ওঠবার উপক্রম। বেশ বুঝতে পারছিলাম আর কিছুক্ষণ এভাবে থাকলে আমাদের দম আটকে যাবে। অজয়বাবু তাড়াতাড়ি বাঁদিকের দরজা খুলে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন খাতা, কাগজের টুকরো, এমন কি দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'উত্তমদা, সই দিন—অটোগ্রাফ'। আমি যেন এক নতুন স্বাদ পাচ্ছি তখন। হাসিমুখে আমি একটার পর একটা অটোগ্রাফ দিতে থাকলাম। অনেকক্ষণ পর কয়েকজন ভদ্রলোক আমাকে ওদের কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন। আমি ভেতরে গিয়ে বসলাম।

সেই মুহূর্তে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছিল। নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম এই ভেবে যে আমি আমার পূজার প্রসাদে আমার দর্শকদের তুষ্ট করতে বোধ করি সক্ষম হয়েছি। পেছনে রেখে আসা যে মাটি সেই মাটি খুঁড়ে অতীত সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপ আবিষ্কারের একটা নেশা যেন আমাকে ক্রমশ গ্রাস করছে। বর্ধমানের সেই আনন্দের কথা স্মরণ করার পাশাপাশি মনে পড়ছে আর একদিনের একটা গল্প।

'সবার উপরে' ছবির নায়ক মনোনীত হয়েছি। যথারীতি ছবির শুটিংও শুরু হয়ে গিয়েছে। সেবার শুটিং ছিল কৃষ্ণনগরে আউটডোর। সদলবলে আমরা শুটিং করে ফিরলাম। বেশ মনে পড়ে সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। স্টারে চলছিল 'শ্যামলী' নাটক। আমাকে সময়মতই বোর্ডে হাজির হতে

হবে। তাই গাড়ি করে যতটা সম্ভব দ্রুত এসে হাজির হলাম স্টারে। অভিনয় শেষ হয়ে গেল। মেক-আপ তুলছি এমন সময় একজন এসে খবর দিলেন একজন ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বাধ্য হয়েই দেখা করলাম। বিবাহিতা এক ভদ্রমহিলা। অভিজাত কোন পরিবারের কুলবধূ। ভদ্রমহিলা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে নির্ভয়ে বলেছিলেন, আমরা যখন কৃষ্ণনগর থেকে ফিরছিলাম তখন তিনি আমাদের গাড়ি ফলো করে সোজা সেখান থেকে এ স্টারে এসেছেন। টিকিট কেটে আমার অভিনয়ও দেখেছেন। তার পরের কথাটা আরও বিস্ময়কর, এমন কি অবিশ্বাস্যও বটে। সে কথা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, আমি আর বাড়ি ফিরব না—

কথাটা কানে যেতে আমি ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকলাম। রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়লাম। তারপর অনেক বুঝিয়ে মিনতি জানিয়ে অনেক কষ্টে ভদ্রমহিলাকে শান্ত করলাম এবং তাঁর ফিরে যাবার ব্যবস্থাও তখন হ'ল।

ধন্য হয়েছিলাম। জনপ্রিয়তার এই নিদর্শনের কোন প্রমাণ হয়তো আজ আমি দাখিল করতে পারব না, তবে যে সব ঘটনা আমার মনে দাগ রেখে গেছে তাকে অস্বীকার করি কেমন করে ?

ভুলিনি। ভুলতে পারিনি সেই ভদ্রলোককেও। এই মুহূর্তে বড় বেশী করে মনে পড়ছে আমার সেই ছবিটা। তখন আমার 'হারানো সুর' সবে তৈরি হচ্ছে। অত্যন্ত ব্যস্ততা আমার। সকালে যথারীতি বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি আমি শুটিং করতে। নীচে নেমে এসে গেটের কাছে পৌঁছেছি। গাড়িতে উঠতে যাব এমন সময় আমাদের বাড়ির সামনে মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক। মুখখানা তাঁর শুকনো। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রীতিমত উদ্‌ভ্রান্ত। তিনি আমার পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। প্রায় আক্রোশে যেন ফেটে পড়তে চাইছেন। আমি তো বিস্ময়ে হতবাক। ভদ্রলোক আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বললেন, আপনিই তো উত্তমকুমার ? আমি অবাক স্বরে বললাম, হাঁ—

ভদ্রলোক আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তারপর যে কাহিনী শুনি, তা আজও আমাকে ভাবিয়ে তোলে। মনে মনে বলি, আমি তো এ চাইনি। আমার জনপ্রিয়তা আর একজনকে আঘাত করবে তা তো আমি চাইতে পারি নে।

ভদ্রলোক কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার স্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে আজ চারদিন হ'ল বাড়ি থেকে বেরিয়েছে—আজও ফেরেনি—

চমকে উঠলাম। সেই মুহূর্তে ভদ্রলোককে যে কি ভাবে সান্ত্বনা দেব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মনটা আমার ভেঙে গেল। তবুও নিজেকে সংযত করে ভদ্রলোককে শান্ত করে ভারাক্রান্ত মনে আমি স্টুডিওতে চলে

গেলাম। সেই ভদ্রমহিলাকে আমি চোখেও দেখিনি, তবুও এই ঘটনায় আমি সেদিন লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম বৈকি! ভেবেছিলাম এই কি শিল্পীর জনপ্রিয়তা!

'হারানো সুর'কে নিয়ে কত ঘটনা কত অঘটন! এই মুহূর্তে আমি যেন আমার হারানো সুর ফিরে পাবার জন্য আনন্দে মেতে উঠেছি। মনে পড়ছে। আমার হারানো অতীতের ছবিগুলো একে একে আমার স্মৃতির সিংহদ্বারে এসে দাঁড়াচ্ছে। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সব। ইসমাইল আর কানাইয়ের শুকনো মুখ দু'টো আমার মনের দর্পণে ভেসে ভেসে উঠছে।

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও দুই নম্বরে আমার 'হারানো সুর'-এর শুটিং হচ্ছে। টুকরো টুকরো সেটে কাজ। এই সময়ে ওদের দুজনকে আমায় বাঁচাতে হ'ল। দু'দিন শুটিং-এর পর লাঞ্চ ব্রেকের সময় অজয় করের কাছে এগিয়ে গেলাম, বললাম, অজয়দা, কালকের শটগুলো রি-টেক করা যায় না?

আমার কথা শুনে অজয়দার তো চক্ষুস্থির!

আবার বললাম, না, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন ঠিক সুবিধে করতে পারিনি, রি-টেক করলে আরও বেটার করতে পারব বলে আমার মনে হচ্ছে।

অজয়দাও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি আমাকে বোঝাতে লাগলেন, আমি যা করেছি তা ভালই হয়েছে। আমি তাতেও শান্ত হলাম না। বললাম, না ওই শটগুলো আপনি রি-টেক করুন।

রি-টেক করা হ'ল অবশেষে। রি-টেক ছাড়া ওদের বাঁচাবার আর কোন পথ ছিল না আমার। ব্যাপারটা হয়েছিল কি, ইসমাইল আর কানাই দে এরা দুজনে ছিল অজয়বাবুর ক্যামেরা-সহযোগী। ক্যামেরার মধ্যে ভুলক্রমে সাউণ্ড নেগেটিভ চাপিয়ে পুরো একদিন শুটিং করা হয়েছে। যখন ধরা পড়ল তখন ওরা ভীত-সন্ত্রস্ত। অজয়বাবুকে ব্যাপারটা বলবার সাহস নেই। তাই সরাসরি আমার কাছে এসে সব কথাই খুলে বলেছিল। সেদিন ঐ ছবির প্রযোজক হিসেবে আমার উত্তেজিত হবারই কথা ছিল। তা হইনি। হতে পারিনি। ভুল তো মানুষই করে। তার জন্যে 'সাফার' তো ওরা করবে না। অগত্যা সব দোষটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে অজয় করকে শটগুলো রি-টেক করতে বাধ্য করলাম। একজন টেকনিসিয়ানের মন নিয়েই ওদের সেদিন দেখেছিলাম আমি, এ আমার নৈতিক কর্তব্য মাত্র।

থাক এসব কথা। গৌতমের কথা বলি!

আমার একমাত্র সন্তান গৌতমের বয়স তখন সাত বছর হবে। কিন্তু ছবির কাজে আমি এমন জড়িয়ে পড়েছি যে তার দিকে ভাল করে তাকাবার

সময়টুকু পাই না। বুঝতে পারি ওর লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে না। অনেকেই আমাকে এ ব্যাপারে খোঁচা দিয়ে বলত। বসন্ত আমার বন্ধু। বসন্ত চৌধুরী। বসন্তও বলত গৌতমের কথা। একটি ছেলে, তাকে ভাল জায়গায় রেখে পড়াবার কথা বলত সবাই। একদিন মানসিক উত্তেজনা ছিল, অনেক দায়-দায়িত্ব। সেই সময় গৌতমকে কি যেন একটা পড়া জিজ্ঞাসা করায় সে পারেনি। সেইদিন প্রথম আমি আমার পিতৃত্বের অহঙ্কারেই বোধহয় গৌতমের মুখে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছিলাম। তার ফলে ওর কচি মুখটা লাল হয়ে গিয়েছিল। অসুস্থ হয়েছিল। ডাঃ এ. বি. মুখার্জীকে কল করতে হয়েছিল। সেইদিন ডাঃ মুখার্জী আমাকে তিরস্কার করেছিলেন। তারপরই আমি গৌতমকে দার্জিলিঙে সেণ্টপলস্ স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে আসি।

মাঝে মাঝে সপরিবারে আমরা দার্জিলিঙে যেতাম। হোটেলে থাকতাম। গৌতমকে ছ' একদিনের জন্য নিজেদের কাছে পেয়ে অনেক আনন্দ করতাম। আবার ফিরে আসতাম আমরা। 'এদিকে—১৯৫৭ সালের ছবিগুলি একে একে মুক্তি পেল। আমি ওদিকে ১৯৫৮ সালের জন্য প্রস্তুত হয়েছি।

১৯৫৮ সালে কয়েক মাসের ব্যবধানে পর পর মুক্তি পেল আটখানা ছবি। এই অভিনয়কে কেন্দ্র করে একদিন কতই না স্বপ্ন দেখেছিলাম। এই স্বপ্ন দেখাও ছিল একদিন অপরাধ আমার। অভিনয়কে ভালবেসেছিলাম বলেই কোন অপমান কোন লাঞ্ছনাই সেদিন আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। মাঝে মাঝে সেই অপমানের ছবিও আমি দেখতে পাই। দেখতে পাই বলে আনন্দ পাই। আনন্দ পাই এই ভেবে যে, আমার অভিনয় দিয়েই সে অপমানের জবাব দিতে হবে তাই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা। মনে পড়ে কি সেই দুঃসহ অপমান!

আমি তখন নরেশ মিত্রের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ছবিতে কাজ করছি। বাজারে তখন আমার নামডাকও মোটামুটি হয়েছে। এমন সময় একটা নতুন ছবিতে কাজ করার সুযোগ পেলাম। পাকাপাকি কথা হয়ে গেল। গল্পের নামটা আজ আর আমার ঠিক মনে পড়ছে না। চুক্তিপত্রে সই করতে তখন বাকি মাত্র। ছবির মহরৎ উৎসবের দিন পাকা হ'ল। ঠিক হ'ল আমাকে দিয়েই মহরতে একটি দৃশ্য তোলা হবে। যথাসময়ে হাজির হলাম স্টুডিওতে। মেক-আপ নিতে যাব এমন সময় জানলাম আমার জায়গায় মেক-আপ করে দাঁড়িয়ে আছেন অপর একজন শিল্পী। তখন বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের হিসাব করতে বসিনি আমি। সত্যের চরমতম প্রকাশ ঘটুক সেই ছিল তখন আমার অন্তরের একান্ত কামনা। ক্ষোভে, অপমানে, দুঃখে সেদিন আমার ভেতরকার মানুষটা কেঁদে ফেলেছিল। চোখে জলও এসেছিল। লজ্জায় সেদিন মাথা তুলে কারও

দিকে তাকাতে পারিনি। সেই অপমান আমার বুকে দারুণ ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। নীরবে, নিতান্ত চোরের মত মাথা হেঁট করে সেখান থেকে সেই মুহূর্তে আমি চলে এসেছিলাম। নিজেকে ঠিক রাখা যায় না। একটি অপমানের কথা লিখতে গিয়ে পাশাপাশি আরও কত অপমান-লাঞ্ছনার কথা মনে পড়ছে আমার। সেই ছবিটার কথাও মনে করতে পারছি না। মনে রাখার মত মন তৈরি করবার আগেই আমাকে অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল বলেই মনে নেই। শুধু মনে রেখাপাত করে গেছে সেই অপমান।

অনেক পরীক্ষা—অনেক আলোচনা—জল্পনা-কল্পনার পর একটা ছবিতে আমাকে নির্বাচন করা হ'ল। কন্ট্রাক্ট ফর্ম সামনে খোলা। শুধু নিজের নামটি সই করলেই হয়, এমন একটা মুহূর্ত। কলম খুলে সই করতে উদ্যত হয়েছি কিন্তু সই করতে পারলাম না। আমার কলম তখন আর আমার হাতে নেই। কলমটি তখন সেই ছবির প্রযোজকের হাতে চলে গেছে। সই করতে দিলেন না সেই সহৃদয় প্রযোজক। কি ব্যাপার! জানলাম, আমার চাইতে অনেক বড় একজন শিল্পীকে ওঁরা অভিনয় করতে রাজী করিয়ে ফেলেছেন। বুঝলাম, এতদিন সেই শিল্পীর সঙ্গে দরে পোষাচ্ছিল না বলেই দয়া করে তাঁরা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু সেদিন এতটুকুও হতাশা আমাকে গ্রাস করেনি। অপমানে সেদিন পায়ের নীচের মাটিকে দু'ভাগ হতে বলিনি। তার পরিবর্তে ছুটে গেছি অন্য আর একজন প্রযোজকের দরজায়। সেখান থেকে আর একজনের কাছে। তারপর দরজা থেকে দরজায়। হয়তো বা অবচেতন মনে চিৎকার করে জানিয়েছি—দয়া করে সুযোগ দিন আমাকে, প্রমাণ করতে দিন আমি অযোগ্য নই।

আজ সেই কথা প্রমাণিত কি অপ্রমাণিত তা জানি না, শুধু জানি এমনি করেই হাজির হ'ল ১৯৫৮। মুক্তি পেল 'ডাক্তারবাবু'। বিশু দাশগুপ্ত ছিলেন এই ছবির পরিচালক। প্রচণ্ড ব্যস্ততার দরুন আর কোন হাউসের সামনে গিয়ে না দাঁড়াতে পারলেও সব কথাই আমি জানতে পারতাম। সব প্রশংসা আমার কানে এসে পৌঁছত। বাংলা তথা ভারতের প্রায় প্রতিটি পত্র-পত্রিকা তখন আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাছাড়া আমি নিজেও খুশি হয়েছিলাম 'ডাক্তারবাবু' ছবিতে সুরেনের চরিত্রে অভিনয় করে।

অবশ্য 'মানময়ী গার্লস স্কুল' ছবিতে কোথায় যেন আমার অভিনয়ে বেশ কিছুটা দ্বিধা থেকে গিয়েছিল। এ ছবি আগেও একবার চিত্রায়িত হয়েছিল। তখন নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বুলানদা অর্থাৎ জহর গাঙ্গুলী। তাঁর স্পষ্ট চরিত্রে অভিনয় করে পরবর্তীকালে আমি কিন্তু খুশি হতে পারিনি। বেশ

খানিকটা দমেও গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার তখনকার সেই ভগ্নমনকে জোড়া দিয়ে গিয়েছিল 'স্বর্গতোরণ'। 'স্বর্গতোরণ' ছবিতে আমি সোমনাথের চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। সাংবাদিক-সমালোচকদের প্রশংসায় ধন্য ও সার্থক হয়ে গেল সোমনাথ। আমিও খুশি হলাম।

তারপর আশাতীত সাফল্য এনে দিল 'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত'।

সাফল্য এনে দিল—বন্ধু, শিকার, যৌতুক, ইন্দ্রাণী।

নানা বিশেষণে তখন অনেকেই আমাকে ভূষিত করে চলেছেন। বিজ্ঞাপনে আমার নাম দেখার জন্য একদিন যেমন ব্যগ্র ছিলাম, তেমনি করে আর আমাকে ব্যগ্র থাকতে হয় না। নানা দিকে নানা ভাবে শুধু আমার কথা বলা।

এই সালে আমার নিউ আলিপুরের বাড়ি তৈরি হয়েছে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি। আমি প্রায় প্রতি শনিবার বন্ধুদের নিয়ে, বিশেষ করে লালুকে নিয়ে সেই নতুন বাড়িতে যাই। তখনও ইলেকট্রিক আসেনি, মোমবাতি জ্বালিয়ে আমরা আড্ডা জমাই। একদিন এই আড্ডার একটা নাম দিলাম—স্টার ডে ক্লাব! মদ্যপান এর আগে নেশা ছিল না। কখনও একটু আধটু খেতাম। প্রকৃত পক্ষে এই স্টার ডে ক্লাবে সেটা পাকা হতে থাকল।

আমি বাড়ি তৈরি করলাম নিউ আলিপুরে। গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জী রোডের এক ভদ্রলোক নাকি নিউ আলিপুরে সাত কাঠা জমি বিক্রী করবেন। কথাটা কানে যেতেই যোগাযোগ করলাম। শেষ পর্যন্ত সেই জমি কিনে তার উপরে মনের মত করে একটি বাড়িও তৈরি করলাম। যতটা সাজানো যায় তেমনি করে সেই বাড়ি সাজালাম। যথা দিনে গৌরী আর গৌতমকে নিয়ে আমি সেই বাড়িতে চলে গেলাম। বাবা-মা, বুড়ো আর পেল্টু রইল গিরিশ মুখার্জী রোডের বাড়িতে। পেল্টুর আসল নাম বরুণ। বরুণটা বরাবরই একটু চাপা ছেলে।

এই সালেই আমি কনট্রাক্টর অজিতবাবুকে ডেকে পাঠাই এবং ভবানী-পুরের বাড়িটা রিমডেল করার ব্যাপারে সব রকম ব্যবস্থা নিতে বলি। তখন ভবানীপুরের বাড়ির সামনের দিকটা ছিল একতলা আর ভিতর দিকটাতে পিছন দিকে ছিল দোতলা। ঠিক হলো এই সামনের দিকটা ভেঙ্গে চারতলা করতে হবে আর পিছন দিকে দোতলার ওপরে আর একতলা উঠবে। আমার বাবার ভীষণ সাধ ছিল এই নতুন বাড়িতে জীবনের অনেকগুলো দিন কাটাবার।

আমি প্রায় রোজই শুটিং-এ যাবার আগে সকালের দিকে এই বাড়িতে আসতাম, সকলের খোঁজখবর নিয়ে চলে যেতাম। আবার বাবা মাঝে মাঝে নিউ আলিপুরের বাড়িতে গিয়ে আমার বাথরুমে স্নান করতেন। বাথরুমটা

বাবার ভীষণ পছন্দ হয়েছিল। এদিকে যথাসময়ে বাড়ি ভাঙ্গার কাজ শুরু হয়ে গেল। এইভাবে হাসতে হাসতে কাটিয়ে দিলাম গোটা বছরটা।

এমন সময় আমাদের উপর দিয়ে সহসা বয়ে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ঝড়।

এল নতুন বছর।

ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে এল ১৯৫৯ সালের সাতই ডিসেম্বর।

আমাদের চাটুজ্জে-বাড়ির হাসিতে-খুশিতে ভরা পরিবেশে সহসা নেমে এল শোকের ছায়া। সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা নাগাদ আমরা হারিয়ে ফেললাম আমাদের একান্ত আপনজনকে। আমাদের এক বিরাট শূন্যতার মধ্যে ফেলে রেখে গেলেন বাবা। আমরা সেই মুহূর্তে অভিভাবক-শূন্য হয়ে গেলাম।

আমার বাবা মারা যান করোনারী থ্রম্বসিসে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। মারা যাবার আগের দু'দিন একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অসুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ শৈলেন মুখার্জী আর ডাঃ এ. বি. মুখার্জীকে এনে দেখানো হয়। তাঁরা বলেছিলেন, অত্যন্ত শান্তভাবে সম্পূর্ণ শুয়ে থাকতে। নীচে নামা বারণ। যেদিন মারা যান সেইদিন আমি যথারীতি সকালে বাবাকে দেখে শুটিং করতে যাই। অজয় করের 'সপ্তপদী'র শুটিং চলছিল তখন।

হঠাৎ দুপুরে বাবা উতলা হয়ে পড়েন। বার বার উঠে চলে যেতে যান। বার বার শুধু বলেন, আমি ও বাড়িতে যাব—আমি ও বাড়ির বাথরুমে স্নান করতে যাব—

এইভাবে যখন তিনি ছেলেমানুষী করতে থাকেন তখনই তাঁর শরীরটা খারাপ হয়। লালুকে ডেকে পাঠান মা। লালু আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার নলিনী সেনগুপ্তকেও আনা হয়। হঠাৎ অসময়ে হাপাকে গাড়ি নিয়ে স্টুডিওতে আসতে দেখে আমার বুকটা কেঁপে উঠেছিল। ব্যাপারটা ভাল মনে হচ্ছিল না। তখন আমার ড্রাইভার ছিল হাপা। সে বলল, 'বাবার অবস্থা ভাল নয়—'

সঙ্গে সঙ্গে শুটিং প্যাক্ আপ করে অজয়দা আমাকে নিয়ে বাড়ি চলে আসেন। এখানে আরও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, এর ক'দিন আগে অজয়দার অর্থাৎ পরিচালক অজয় করের পিতৃবিয়োগ হয়। বাড়িতে এসে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বাবা-বাবা বলে একটু ডেকেছি তার মধ্যেই সব শেষ। মনে আছে তাঁর মুখে গঙ্গাজল দিয়েছিলাম আমি। বাবা চলে গেলেন সন্ধ্যে

সাড়ে ছ'টায়। আমার সেই বাবা, যিনি আমাকে আর আমার অন্য ভাইদের মানুষ করে গড়ে তোলার জন্য, সংসারের সবাইকার মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখার জন্য কি অক্লান্ত পরিশ্রমটাই না করেছেন সারাটা জীবন ধরে।

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আকুল উচ্ছ্বাসে কেঁদে ফেলেছিলাম। বাবা যেন চিরশান্তির কোলে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছেন। পরের দিন বেলা বারটা সাড়ে বারটা নাগাদ আমরা ফুলে ফুলে ঢাকা আমাদের জন্মদাতা ঈশ্বরকে নিয়ে ভবানীপুরের বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করলাম। মরদেহ নিয়ে এলাম কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। সেই মহাতীর্থে দাঁড়িয়ে দু'চোখ ভরে বাবাকে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম কি অদ্ভুত মানুষ ছিলেন তিনি।

সংসারে কারু ওপর কোনদিন কোন দাবীই তিনি রাখেননি। সকলকে দিতেই যেন তিনি এসেছিলেন। আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সকলকে ভরিয়ে দিয়েই যেন তিনি নীরবে চলে গেলেন।

মেট্রো কোম্পানি কলকাতায় বায়োস্কোপ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ মেট্রো সিনেমার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল আমার বাবার একটা মধুর সম্পর্ক। তিনি ছিলেন 'চীফ অপারেটার'। কতদিন বাবাকে আমরা দু'চোখ ভরে দেখিনি। দেখতে পাইনি। রাতের শো শেষ করে যখন তিনি বাড়ি ফিরতেন তখন বেশীরভাগ দিনই আমরা ঘুমিয়ে থাকতাম।

এমনি করে অবশেষে আমিও ব্যস্ত হয়ে গেলাম। বাবাকে ভাল করে দেখার আগ্রহ মেটাতে পারিনি কোনদিনই। তবে আমরা বিশেষ করে আমার মা আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন একটা ব্যাপারে তা হ'ল বাবার মৃত্যুর কয়েক মাস আগে আমরা গৌতমের পৈতে দিয়েছিলাম ঘটা করে। আমার পৈতে হয়েছিল তের বছর বয়সে, আর আমার ছেলে গৌতমের পৈতে হয়েছিল ন' বছর বয়সে। এটাই ছিল আমাদের সবচাইতে আনন্দের বিষয়।

বোধহয় সকলের উপর প্রচ্ছন্ন অভিমান নিয়েই চলে গেলেন আমার বাবা। পরদিন সকালে অশ্রুসজল চোখে ফিরে এলাম বাড়িতে। বাবার মৃত্যুর ছবিতে আমি যেন নতুন করে পুতুলদিকে দেখলাম। সে যেন তখনও হাসতে হাসতে বলছে—তুই যাত্রা শিখছিস কাউকে বলিনি রে। যাত্রা শেষ, বেশ মজা হবে। বাড়ি ফিরে আবার আমাকে সেই মজায় মেতে যেতে হ'ল।

মায়ের বৈধব্য বেশ আমি সেদিন যেন সহ্য করতে পারছিলাম না। অগত্যা তরুণ তার বৌদিকে ডেকে আনল। চোখ তুলে চাইলাম। গৌরী কাঁদছে। সবাই কাঁদছে। বাবাকে হারিয়ে সবাই কাঁদছে। আমি শুধু কাঁদিনি।

এবার আমি যে সব সত্যটুকু জেনে ফেলেছি। জেনেছি যিনি গেলেন তিনি

তো আর ফিরবেন না। তাই মনকে শক্ত করে বাবার স্মৃতি বুকে নিয়ে আমি কঠিন হয়ে গেছি।

বাবার শ্রাদ্ধশান্তির কাজ করার আগে একটা গণ্ডগোল বেধে গেল আমার চুল নিয়ে। সবাই বললেন মস্তক মুণ্ডন আবশ্যিক। ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান হয়ে মাথা না কামান অপরাধ। অথচ সে উপায় নেই। আমি চুল কাটলে অনেক প্রোডিউসারের সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিশেষ করে সর্বনাশ এখুনি যাঁর হবে তিনি অজ্ঞা কর। শেষ পর্যন্ত আমরা মায়ের বিধান চাইলাম। মা বললেন, যা ভাল বোঝ করো—

বুড়ো বলল, তোর চুল কাটার দরকার নেই—আমি আর পিন্টু কাটবো, আমি বাবার কাজ করবো—

আমি বললাম, 'চুল যদি কাটতে হয় আমরা তিন ভাই-ই কাটব, তা না হলে কেউ কাটবো না—'

এবার আমরা ঠাকুর মশায়ের শরণাপন্ন হলাম। আমাদের বাড়ির তখন সব কাজ করতেন তারাপতি ভট্টাচার্য। তিনিই বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কাজ করেছিলেন। তিনি বিধান দিলেন, মূল্য ধরে দিলে চুল না কাটলেও চলে। আমরা তিনভাই চুল কাটিনি বলে তিন জনের মূল্য ধরে দিয়েছিলাম। একটা অধ্যায় তারপর শেষ হয়ে গেল।

গৌরীকে মায়ের কাছে রেখে চলে গেলাম আমরা তিন ভাই নিউ আলিপুরের নতুন বাড়িতে। কোন সান্ত্বনাই সেদিন ছোট ভাইদের দিতে পারিনি। আবার মেতে গেছি কাজে। অফুরন্ত কাজ। আগামী দিনের অনেক প্রতিশ্রুতি।

এদিকে এই ১৯৫৭ সালেই মুক্তি পেয়েছে আমার অভিনীত প্রায় আটখানা ছবি। এই সালেই ভবানীপুরের বাড়ির রিমডেলিং-এর কাজও শেষ হয়ে গেল।

আবার এই সালেই আমার বন্ধু দেবেশ ঘোষের গল্ড ব্লাডার অপারেশন হয়। দেবেশ তখনও চিত্রপ্রযোজনার ক্ষেত্রে নামেনি বলেই আমার মনে হয়। তবুও সে আমার বন্ধু হয়ে উঠেছিল। একদিন হঠাৎ শুনলাম দেবেশ ক্যালকাটা নার্সিং-হোমে ভর্তি হয়েছে। ১৮।৫।৫৭ তারিখে ডাক্তার মুরারী মুখার্জী তার অপারেশন করেন। এই ব্যাপারে আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, আসলে আমি চিরকালই একটু বেশী রকমের নার্ভাস লোক।

একদিকে খ্যাতি অন্যদিকে অখ্যাতি পাশাপাশি চলছে আমার অভিনয়কে কেন্দ্র করে। বেশ মনে আছে, আমার অভিনীত 'বিচারক' ছবির সমালোচনা প্রসঙ্গে সেবার দেশ পত্রিকা লিখেছিল—

আমি যেন দম দেওয়া একটা ঘড়ির কাঁটা। নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। পূর্ণ দম নিয়ে কখন থেকে যে চলতে শুরু করেছি জানি না। শুধু চলছি। যন্ত্রের মত চলছি। একটি করে বছর আসে, ছবি মুক্তি পায় আর ওদিকে আগামী বছরগুলোর জন্যে আমি প্রস্তুত হতে থাকি।

এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে আজও আমার কোন ক্লান্তি আসেনি, তার কারণ আমি মনে করি অভিনয়ের বিশাল জগতে আজও আমি শিক্ষানবীশ। শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়ে চলেছি মাত্র।

এরই মধ্যে মাঝে-মাঝে বৈচিত্র্য আসছে। কখনও ক্রিকেট ব্যাট ধরে মাঠে নেমেছি খেলতে, কখনও বা ভিক্ষার পাত্র হাতে করে বেরিয়েছি পথে পথে।

বন্যাদুর্গতদের সাহায্যের জন্য আমরা সবাই বেরিয়েছি, অগণিত দুর্গত ভাই-বোনদের জন্য বেদনাহত মন নিয়ে ঘুরেছি কলকাতার জনদেবতার দরজায়-দরজায়।

বাবা মারা যাবার পর থেকে আমার মনটা সর্বদাই কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে থাকত। বার বার মনে হতো আমি বাবার জন্য কিছুই করতে পারিনি। আরও যদি সুযোগ দিতেন তিনি তাহলে হয়তো আরও ভাল চিকিৎসা করাতে পারতাম। আমাকে সব সময় এই দুশ্চিন্তা গ্রাস করত। হঠাৎ অসুস্থ বোধ করতে থাকলাম। আমার সব সময় মনে হতো বায়ু রোগে আমি আক্রান্ত। কোন চিকিৎসাই বাদ দিইনি। লালুটালু বলতো এটা আমার একটা ম্যানিয়া। আসলে মানসিক দুশ্চিন্তার ফল!

আমি হোমিওপ্যাথী, এলোপ্যাথী, কবিরাজী কোন চিকিৎসাই বাদ দিই নি। তবুও যেন স্বস্তি পাই না। একদিন শুনলাম নিউ আলিপুরের বাড়ির পাশের বাড়ির একজন ড্রাইভার রেজ্জাক নাকি খুব ভাল ঝাড়ফুঁক জানে। তাকে ডাকা হলো। সে এক গ্লাস জল নিল, এক টুকরো কাগজ নিল। সেই কাগজে কি সব লিখল, তারপর কয়েকবার ফু দিয়ে সেই কাগজটা জলে ফেলে দিয়ে বলল, এই জলটা খেয়ে নিন—

আমার মানসিক অবস্থা তখন এমন যে সেই কাগজ সমেত জল খেয়ে ফেলেছিলাম। আমার ধারণা হয়েছিল কাগজ সমেত খেলে বায়ু রোগ নির্মূল হবে। কী আশ্চর্য কিছুক্ষণ ভালই ছিলাম। আবার সেই দিনই রাত তিনটে নাগাদ শরীরটা খারাপ লাগল। মনে হলো সেই বায়ুর চাপে আমার জীবনটা চলে যাবে! আবার লালুকে ডাকলাম। সে কিছু ট্যাবলেট দিল। ক'দিন ভালই ছিলাম। সবাই বলল, কোলকাতার জল খারাপ—তোপচাঁচীর জল

খেলে কিংবা রাজগীরের জল খেলে ভাল হবে। লালু এবং বাড়ির সবাইকে নিয়ে একদিন চলে গেলাম তোপচাচী। ক'দিন ভালই ছিলাম। জ্বাপা করেক বড়া জল গাড়িতে এনেছিল তোপচাচী থেকে। এই রকম কত কি। আজও কিন্তু সেই বায়ুর প্রকোপ আমার আছে।

এমনি করে ১৯৬০ সালের দরজায় এসে দাঁড়ালাম।

এ বছরে আমার অভিনীত ন'খানা ছবির মুক্তি। একমাত্র 'কুহক' ছবিটিই আমাকে আশাহত করেছিল। তাছাড়া অন্য সব ছবি চলেছিল ভাল। অথচ এই 'কুহক' ছবিটিকে ঘিরে অনেক সাধনাই করেছিলাম আমি। একটি বিদেশী ছবি, শুধু ছবি নয় প্রচণ্ড হিট ছবি 'নাইট অফ দি হান্টার' অবলম্বনে কুহকের চিত্রনাট্য রচনা করা হয়েছিল। চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন সাহিত্যিক সমরেশ বসু। আমি আমার সমস্ত ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্ব দিয়েই অভিনয় করেছিলাম, অভিনয় করেছিলাম আমার নিজস্ব স্টাইল-এ। আসল ইংরাজী ছবিতে এই অভিনয় করেছিলেন রবার্ট মিচাম। 'কুহক' ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সাফল্য আনেনি, তবে আমার অভিনয়ের খ্যাতি ছড়িয়েছিল বলে শুনেছি।

আবার 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ছবিতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। 'রাইচরণ' কারও কাছ থেকে চরম প্রশংসা কুড়িয়ে নিল, আবার কেউ করলেন নিন্দা। আমি রাইচরণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল রাইচরণ পার্শ্বচরিত্র। ক্যারেকটার অ্যাকটরের মধ্যেই ফেলা যায় রাইচরণকে। যদিও 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এ রাইচরণ প্রধান চরিত্র। সেদিনও যে কথা বলেছিলাম, আজও আমি আমার এই জীবনকথার পাতায় সেই কথাই রেখে যাচ্ছি যে, দর্শক যা-ই বলুন না কেন, আমি কিন্তু সেদিন রাইচরণের ভূমিকায় অভিনয় করে বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট হইনি, আনন্দও পাইনি। সেদিন অবশ্য রাইচরণের ভূমিকায় আমার অভিনয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচকরা বলেছিলেন—

"রবীন্দ্রসৃষ্ট রাইচরণ চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাব এবং মর্মবেদনা উত্তমকুমারের সুনিপুণ অভিনয়ে যথাযথভাবে ফুটে উঠেছিল—"

একটি করে ছবি মুক্তি পাচ্ছে আর আমি ওদিকে একটি করে নতুন চরিত্রে অভিনয় করে চলেছি। এই সালেই মুক্তি পেল 'মায়ামৃগ'। 'মায়ামৃগ'র নায়ক

শুভ্র। শুভ্র প্রেমিক। রোম্যান্টিক ক্যারেকটার। শুভ্রকে এই মুহূর্তে মনে পড়ল বলে মনে পড়ছে বিশ্বজিতের কথা।

বিশ্বজিৎ তখন রঙমহলে থিয়েটার করে। দু'একখানা ছবিতে কাজ করেছে। আমার ভাই তরুণের সঙ্গে বেশ ভালই পরিচয় ছিল বিশ্বজিতের। সেই সুবাদে আলাপ। রঙমহলের উইংসের পাশে দাঁড়িয়েও আমি ওর অভিনয় দেখেছি। ভাল লেগেছিল ছেলেটিকে। আলাপী। মিষ্টভাষী। আমাকেও দাদা বলেই ডাকত। হঠাৎ শুনলাম 'মায়ামৃগ'র শুভ্র চরিত্রের প্রতি ওর একটা দুর্বলতা আছে। রঙমহলে কিন্তু ঐ রোলটি সে করে না। দু' একটা সিনের এক্স্ট্রা আর্টিস্ট সে। বসে বসে নাটক দেখে। অন্যের অভিনীত শুভ্রকেসে মনে মনেকামনা করে।

কথাটা কানে আসতেই আর দ্বিধা করলাম না। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে 'শুভ্র'র চরিত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বিশ্বজিতকেই অফার দিলাম পরোক্ষভাবে। নিতান্ত মনের তাগিদে দাদার একটা কর্তব্য করে ফেললাম। বিশ্বজিৎ সেই রোম্যান্টিক চরিত্রে সুযোগ পেয়ে চলে এল আমার কাছে। চোখে তার বিস্ময়। বলেছিল, শুভ্রর রোলে আপনাকে ছাড়া তো ভাবাই যায় না দাদা—আমি কি পারব ?

আমি সেদিন ওর পিঠ চাপড়ে বলেছিলাম, হাঁ, তুমিই পারবে রোম্যান্টিক শুভ্রর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে, ভয় কি ? আমি তো আছি—

সত্যিই আমি ছিলাম। ছিলাম নায়কের পরিবর্তে একটি ছোট চরিত্রে।

'মায়ামৃগ' সাফল্য এনেছে শুটিং করতে করতেই শুনলাম। শুনলাম 'রাজাসাজা', 'উত্তরমেঘ', 'হাত বাড়ালেই বন্ধু', 'পথের চোর', 'শহরের ইতিকথা', 'শুন বরনারী' এক এক করে মুক্তি পাচ্ছে। সাফল্য-অসাফল্যের মধ্য দিয়ে ছবিগুলি চলছে। আমি তখন আগামীদিনের জন্য হয়তো কোন স্টুডিওতে রঙ মেখে অভিনয় করে চলেছি।

সেই সংগে যেখানে আনন্দ পাওয়া যায় আমি সেখানেই ছুটে যাই। নিউ আলিপুরের বাড়ি সম্পূর্ণ হবার সংগে সংগে স্টার-ডে ক্লাবও বন্ধ হলো। আমি সবাইকে বললাম, না বন্ধ হবেনা—জায়গা খোঁজ। সবাই ক্লাব করার জায়গা খুঁজতে লাগল। পূর্ণ সিনেমার উল্টোদিকে একটু বাঁ দিকে এখন যে বাড়িতে দেনা :ব্যাঙ্ক, যে বাড়িতে আনন্দবাজারের প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ থাকতেন সেই বাড়িটি হলো বিচারপতি দ্বারকানাথ চক্রবর্তীর বাড়ি। আমরা সেই বাড়িতে খেলা খেলা ছলে সাধারণভাবে যে স্টার-ডে ক্লাব তৈরি করেছিলাম তার নতুন নাম দিয়ে নতুন জীবন দান করলাম।

নাম দেওয়া হলো মৌসুমী ক্লাব। আমি এই ক্লাবের সভাপতি ছিলাম।

এই বাড়িতে ১৯৬০ থেকে ৬২ এই তিন বছর আমরা জাঁকজমকপূর্ণভাবে সরস্বতী পুজো করেছিলাম। এই বাড়িতে আমরা গানের আসরও করতাম। একবার বড়ে গোলাম আলী খাঁ সাহেব, একবার হেমন্ত মুখার্জী, একবার আমি এখানে গানও করেছিলাম।

আমার এই সোনাঝরা দিনগুলো হারিয়ে গেল এক সময়।

আমার সাধের পাড়ার সেই সোনাঝরা দিন।

১৯৬১ সালে আমার অভিনীত ছবিগুলিই কেবল মুক্তি পেল না, সেই সঙ্গে আমার প্রযোজিত ছবিও মুক্তি পেল। মাঝে মাঝে ছবির প্রযোজনা করারও একটা দায়িত্বভার মাথায় নিতে ইচ্ছে করত।

ইচ্ছে হত নিছক প্রযোজক হবার আকাঙ্ক্ষাতে নয়, আমার মনে হয়েছিল—বাংলা ছবির সংখ্যা বাড়ানো উচিত। নতুন নতুন মানুষেরা যদি সাহস নিয়ে ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হয় তাহলে যে এ ব্যবসা ক্ষীণ অবস্থায় এসে দাঁড়াবে! এ জগৎ তো শুধু মাত্র শখ-শৌখিনতার জগৎ নয়, এ যে মহান শিল্পী-তীর্থ। কতশত মানুষের জীবিকার সঙ্গে এর সম্পর্ক। সুতরাং ছবি তৈরি করতে দ্বিধা হবে কেন? তাই 'হারানো সুরে'র পর আবার আমার খেয়াল হ'ল ছবি করার। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী 'সপ্তপদী'র কাজ যথাসময়ে শুরু করেছিলাম। শুরু করেছিলাম আগেই। সেই ১৯৫৯-এ। তারপরই বাবা মারা গেলেন—আগেই বলেছি।

'সপ্তপদী'র মত জটিল এবং বলিষ্ঠ উপন্যাসের সার্থক চিত্ররূপ দেবার জন্য কোন কার্পণ্যই ছিল না। একদিকে নতুন ছবির কাজ, পারিবারিক কর্তব্য, অন্যদিকে 'সপ্তপদী'র চিত্রনাট্য নিয়ে সর্বক্ষণ আলোচনা, ভাবনা।

অবশেষে সেই ছবি মুক্তি পেল। চিত্ররূপে অনেকেই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। আমারও মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। 'সপ্তপদী'কে ঘিরে অনেক স্বপ্নই ছিল আমার। তবু অহেতুক অনেক আঘাতই সহ্য করতে হয়েছিল এই 'সপ্তপদী'কে নিয়ে। প্রায় বছরখানেকের ওপর ছবির শুটিংও বন্ধ ছিল। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে একটা অশান্তি আর অস্বস্তিতে দিন কাটাতে হয়েছিল আমাকে। এক অসহ্য যন্ত্রণায় যেন কাতর হয়ে পড়ছিলাম।

যন্ত্রণা অসিতবাবুর কথা ভেবেই। অসিত চৌধুরী ছিলেন 'সপ্তপদী'র পরিবেশক। মোটা টাকার অঙ্ক তাঁর উপরেই চাপানো, অথচ ছবি অনেকদূর এগিয়ে বন্ধ হয়ে আছে। অনিবার্য কারণবশত বন্ধ। অথচ বন্ধ থাকলে আমার কি ক্ষতি, কতটুকু ক্ষতি! ক্ষতি অসিতবাবুর। আমার আন্তরিক ব্যাকুলতা ছিল সেই কারণেই। অন্য ছবিতে শুটিং করতে করতে উৎকণ্ঠা নিয়ে কতদিন

ছুটে গেছি অসিতবাবুর কাছে। পরিশ্রম করেছি—অসিতবাবুর যেন কোন ক্ষতি না হয়।

অবশেষে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য থেকে আমরা মুক্তি পেলাম। ছবি মুক্তি পেল। আমরা তখনকার মত স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। খুশি হয়েছিলাম। নিদারুণ খুশি হয়েছিলাম যখন বি. এফ. জে.-এর কর্তৃপক্ষর কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেলাম। সাংবাদিকদের বিচারে আমি নাকি শ্রেষ্ঠ নায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছি! এবারও আমি পুরস্কৃত হলাম 'সপ্তপদী' ছবির শ্রেষ্ঠ নায়ক হিসাবে। পুরস্কার হাতে নিয়ে মুহূর্তে আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম।

আমার ভেতরকার শিল্পী মনটা যেন আরও সুন্দর হতে, নিজেকে বলিষ্ঠ করে প্রকাশ করার জন্ম প্রস্তুত করতে শুরু করল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, এই পুরস্কারের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেই হবে আমাকে। আরও গভীরভাবে শিল্প-সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করলাম।

তারপর মুক্তি পেল সুধীরবাবুর অর্থাৎ সুধীর মুখার্জীর 'দুই ভাই' ছবি। অনেকেই বললেন, উত্তমকুমারের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়ে ছবিটি দর্শনীয়।

এ বছরেই মুক্তি পেয়েছিল—'সাথীহারা', 'অগ্নি-সংস্কার', 'ঝিন্দের-বন্দী', 'নেকলেস' ছবিগুলো।

এই ছবিগুলোতে অভিনয় করার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে অবসর পেতাম। ক্ষণিকের অবসরের আমেজে নিজেকে একটু স্নান করিয়ে নিতাম মাত্র। অবসর পেতাম কোন ছবির আউটডোর শুটিং-এ গেলে। 'ঝিন্দের বন্দী'র সময়ে এসেছিল এমনি এক অবসরের ক্ষণ। শুটিংটুকু করা—বাকি সময়টা অবসর। দীর্ঘদিন উদয়পুরে থাকতে হয়েছিল আমাদের। সময় পেলে আমি আর সৌমিত্র গল্প করতাম। কত ব্যর্থতা-সার্থকতার গল্প। যখন সৌমিত্র কাছে থাকত না, তখন মনের পর্দায় ফেলে আসা অনেক ঘটনার ছবি ভেসে উঠত। কখনো হাসতাম, কখনও বা মন ভরে ব্যথা জমে যেত।

গৌরীকে আমি কি বিরক্তই না করেছি, কিন্তু কি আশ্চর্য, সে এতটুকুও বিরক্ত করেনি কখনো। অভিমান করেছে। আমি তার অভিমান মুছিয়ে দিয়েছি।

এমনি করে আজ আবার এই আত্মজীবনী লিখবার অবকাশে মনে পড়ে গেল সেদিনের কথা। সেটা বোধকরি ১৯৫৫ সাল। অনেকগুলো ছবি আমার মুক্তি পেয়েছে। অনেকগুলো আবার ফ্লোরে। ভয়ানক ব্যস্ত। দিন-রাত ব্যস্ত। মাঝে মাঝে ডে-নাইট শুটিং। কোনদিকে তাকাবার অবকাশ নেই। শুধু কাজ আর কাজ।

হঠাৎ একদিন ছুটি ছিল। সেদিন শুটিং নেই। কাজ নেই। সে আবার মারাত্মক অবস্থা। আধঘন্টা চুপচাপ থাকতে ভাল লাগে না। সামনে ছিল 'সাহেব বিবি গোলাম' বিরাট উপন্যাসখানা। সেই ছবির 'ভূতনাথ' চরিত্রে অভিনয় করার জন্য চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছি। অগত্যা ভূতনাথকে ভাল করে বুঝে নেবার জন্যে বইটি গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ছি। পড়তে পড়তে আত্মহারা হয়ে গেছি।

সেদিনকার সেই আত্মহারা অবস্থা আমাদের একটা চরম শাস্তি দিয়েছিল, যা এই মুহূর্তে লিখতে বসে ভেবেই হাসি পাচ্ছে।

ব্যাপারটা জানতে পারলাম যখন গৌরী বেলা ছুটোর পর বাড়ি ফিরে আমার সম্বিৎ ফেরাল। আসলে হয়েছিল কি, আমি যখন বইটা পড়তে পড়তে গভীরে চলে গেছি তখন গৌরী কোথায় যেন বেরুচ্ছিল। সে আমার কাছে এসে নাকি বলেছিল, আমি একটু বেরুচ্ছি, ফিরতে দেরি হতে পারে, তুমি চাকরকে দিয়ে বাজারটা করিয়ে নিও—

আমি নাকি মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়ে বলেছিলাম, ঠিক আছে।

গৌরী ফিরে এসে দেখল—কিছুই ঠিক নেই। সব যেমন যেখানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়েছিল সেখানেই তেমনি পড়ে আছে।

আমি তখনও বই পড়ছি, ওদিকে চাকরটা বসে বসে বাইরে ঝিমুচ্ছে। বাজার করা হয়নি। গৌরী ফিরে এসে যখন এই অবস্থায় মুখোমুখি দাঁড়াল তখন বোধকরি তার রাগের চাইতে অভিমানই বেশী হয়েছিল।

এ ব্যাপারে আমি ভীষণ লজ্জায় পড়েছিলাম।

অবশ্য লজ্জা বলতে যা বোঝায় তা আমার কমই ছিল। সাধনায় আবার লজ্জা কিসের! 'সপ্তপদী'র সময়েও সেই লজ্জা আমার ছিল না। আমি রাতদিন সময় পেলেই Shakespeare আবৃত্তি করতাম—

> 'It is the cause, it is the cause, my
> Soul—
> Let me not name it to you, you chaste
> Staro—
> It is the cause. Yet I'll not shed her blood,
> Nor scar that whiter skin of hers than snow,
> And smooth as monumental alabaster.
> Yet she must die, else she'll betray more
> men.
> Put out the light, and then put out me light…'

এমন কি বাথরুমে গিয়েও আমার সেই সংলাপ আওড়ানো। সবাই বোধ হয় অতিষ্ঠ হয়ে যেত। কিন্তু আমি Othelo-কে ভুলতে পারতাম না কিছুতেই।

এমনি করেই একসময় হাজির হয়ে গেলাম ১৯৬২ সালের দ্বারে।

এ বছরে মাত্র তিনখানি ছবি মুক্তি পেল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছবির অঙ্কও গুনছি। একটি ছবির ভাল-মন্দর সঙ্গে আমারও তো ভাল-মন্দের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তার প্রধান কারণ আমি হেরে যেতে আসিনি। কোন ছবি ব্যবসার দিক থেকে যদি হেরে যায় তাহলে সেই হার তো আমারও। আর সেই হারবার খবর শুনলে আঘাত পেতাম। তেমনি আঘাত হানল 'কান্না'। অগ্রগামীর এই ছবি ব্যবসায়িক সাফল্য আনতে পারল না। সাফল্য আনল 'বিপাশা' আর 'শিউলিবাড়ি'।

একদিকে ভাল অন্যদিকে মন্দ, তারই মধ্যে আমি এগিয়ে চলেছি। এগিয়ে চলেছি বিরামহীনভাবে আগামী দিনের জন্য। অবসর যেন ভাল লাগে না। আসলে মদের নেশার মত কাজের নেশায় আমি মত্ত থাকতে পারলেই বেঁচে যাই। তাই ইতিমধ্যে আবার নতুন করে ছবি তৈরির কথাও ভেবেছি আমি।

একদিকে রূপালী পর্দায় তখন প্রতিফলিত হচ্ছে তিনটি ছবির ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের অভিনয়—অন্যদিকে আমি নতুন ছবির শুটিং শুধু নয়, নতুন ছবি তৈরির ভাবনাও শেষ করে ফেলেছি। ছবির নাম 'ভ্রান্তিবিলাস'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের Commedy of Errors অবলম্বনে লিখিত কৌতুক উপাখ্যান।

এই ১৯৬২ সালেই চীন আক্রমণ করে বসল ভারত।

ভারতের বুকে চীন ঝাঁপিয়ে পড়ল, থাবা দিতে থাকল এখানে-ওখানে। চারদিকে একটা দুশ্চিন্তার ছায়া। কী হবে কী হবে সেই ভাবনা, তার মধ্যে গৌরী অস্থির হয়ে উঠল ছেলের জন্যে। একমাত্র ছেলে, এই যুদ্ধের মুখে বাইরে থাকলে যদি অঘটন কিছু ঘটে সেই ভাবনা তার। ভাবনা আমারও কম নয়। চীন যেভাবে মাথা চাড়া দিয়েছে তাতে দার্জিলিং নিরাপদ থাকতে নাও পারে। অগত্যা আমরা দার্জিলিং গেলাম। গৌতম তখন ক্লাশ এইটের ছাত্র।

আমরা গৌতমকে কোলকাতায় ফিরিয়ে আনলাম। কোলকাতায় এসেই আবার কাজ আর কাজ।

'ভ্রান্তিবিলাসে'র প্রযোজক হয়ে হয়তো সবটুকু কাজের ভার আমার কলাকুশলীদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু তা করিনি। গল্প নিয়ে ভেবেছি। পরিকল্পনা করেছি। দিনের পর দিন নিজের বাড়িতে বসে ছবির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। এসব করেছি নিজের জ্ঞানকে বাড়াতে,

আরও অনেক কিছু শিখতে। তারপর সে-ছবির কাজ শুরু হয়েছে। আমি দ্বৈত ভূমিকায় আবার অবতীর্ণ হয়েছি।

পরিশেষে ১৯৬৩ সালে মুক্তি পেয়েছে আমার স্বপ্রযোজিত 'ভ্রান্তিবিলাস'। মুক্তি পেয়েছে—'শেষ অঙ্ক', 'নিশীথে','উত্তরায়ণ', 'সূর্যশিখা', 'দেয়া নেয়া'।

'নিশীথে' ছিল রবীন্দ্রনাথের গল্প। দক্ষিণাচরণ ছিল তারই প্রধান চরিত্র। সেই দক্ষিণাচরণের ভূমিকায় অভিনয় করে কেন জানিনা মনকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারছিলাম না। বার বার মনে হচ্ছিল কোথায় যেন আমার ফাঁকি রয়ে গেছে। কিন্তু ছবিটা রিলিজ হবার পর দেখি বিপরীত সমালোচনা। সবাই বললেন, আমি নাকি বাস্তবানুগ অভিনয় করেছি। আমি নাকি অনন্যসাধারণ অভিনয় করেছি।

এই সালেই গৌতমকে দার্জিলিং থেকে এনে আবার ভর্তি করে দেওয়া হলো লা মার্টিনেয়ারে। গৌতম পড়ছে। আর আমি কাজ করে চলেছি। সংবাদপত্রের সমালোচনা স্তম্ভে আমার প্রশংসা আর প্রশংসা।

এসব সমালোচনা শুনেও স্থস্থির হতে পারিনি। দর্শক-সমালোচক উচ্ছ্বাস দেখালেও আমার মনে হয়েছিল কালজয়ী অভিনেতা হতে গেলে আমার আরও অনুশীলনের প্রয়োজন। বাইরের জগতে আমার প্রশংসার ঝড় আর আমার মনের জগতে তখন আর এক অশান্তির ঝড়। আমার সারা মন জুড়ে এই সময়ে একটা অশান্তির ছায়া। ইদানীং আমার সংগে মাঝে মাঝেই গৌরীর অশান্তি হতো। আমাকে গৌরী যেন কোনভাবেই সহজ করে নিতে পারছে না। এক সময়ে আমার ধৈর্য এবং স্থৈর্য চ্যুতি ঘটল।

সেদিন ছিল ১৯৬৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর। গৌরীর জন্মদিন। ভবানীপুরের বাড়িতে সেদিন গৌরীর জন্মদিন পালিত হচ্ছিল। আমিও সেই আনন্দের অংশীদার ছিলাম। হঠাৎ অশান্তির ঝড় উঠল। কথা কাটাকাটির সীমা ছাড়াল। আমার মেজাজ গরম হয় না কিন্তু যখন গরম হয় তখন সামলানো দায়। তাই হলো। ফলে এক জামা-কাপড়ে আমি রাত সাড়ে দশটা-এগারটা নাগাদ বেরিয়ে গেলাম গাড়ি নিয়ে। সেদিন সারারাত পথেই কেটেছিল আমার। আমার জীবনে নতুন অংকের এ হল সূচনা পর্ব। সে কথায় পরে আসছি।

১৯৬৪ সালে অভিনয় করলাম প্রায় পাঁচখানা ছবিতে।

'বিভাস', 'জতুগৃহ', 'নতুন তীর্থ', 'মোমের আলো', আর 'লালপাথর'।

আমি জানি আমার এই ব্যস্ত জীবনে এই জনপ্রিয়তার মূলে শুধু একা আমিই প্রধান নই। অনেকের অনেক সাহায্য মহানুভবতা অনুপ্রেরণাই আমাকে এই জনপ্রিয়তার সিংহদ্বারে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে। মনে পড়ে তপন সিংহের সেদিনকার উক্তি। আজকের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রস্রষ্টা তপন সিংহের 'জতুগৃহ' ছবিতে অভিনয় করার পর তপনবাবু বলেছিলেন, 'জতুগৃহের ক্যারেকটারটা ছিল ভীষণ স্টং। সেখানে কোন ঘটনা ছিল না, সম্পূর্ণ নিজের মনের কথা। একঘেয়ে জীবনের অভিব্যক্তি। আমার মনে হয় অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে উত্তমবাবু সেটা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। ছবিটা আমাদের এখানে কমার্শিয়ালি খুব বেশী চলেনি, কিন্তু আমার নিজের মনে হয়েছে ওঁর অভিনয় যে-কোন দেশের একজন বিশিষ্ট অভিনেতার অভিনয়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে।'

ভাল লেগেছিল। খুব ভাল লেগেছিল তপনবাবুর সেই উক্তি। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার অবকাশ পাইনি। অবকাশ ছিল না।

আমার সমস্ত দেহমন তখন 'ছোটী সি মুলাকাৎ'কে ঘিরে। কখন কেমন করে যে সেই বিরাট জাল বিস্তার করে ফেলেছিলাম জানি না, শুধু এইটুকু জানি 'ছোটী সি মুলাকাৎ' ছবি তৈরির পিছনে কি ভাবনা ছিল আমার।

নিখুঁত সুন্দর নিটোল একখানা হিন্দী ছবি তৈরী করার কথা ছিল। নিছক ধরা-বাঁধা ছকের বাইরে এসে একটা ভাল ছবি তৈরি করার কথা তখন ভাবছি। প্রাথমিক কাজ প্রায় শেষ। শুটিং শুরু হবে। চরম ব্যস্ততার মধ্যে তলিয়ে গেলাম। তার মধ্যে আবার অন্য ছবির কাজও শেষ করতে হবে। পারলাম না। অনেকের আশা পূরণ করতে পারলাম না। অনেক 'অফার' আমাকে একান্ত নিরুপায় হয়ে ছেড়ে দিতে হ'ল। তবুও কাজ কিছু আছে।

একদিকে 'ছোটী সি মুলাকাৎ'-এর ফাইন্যাল স্টেজ। তার চিত্রনাট্য, তার শিল্পী, তার গান, তার এডিটিং, তার সংলাপ, তার সেট রিকুইজিশনস, তার কস্টিউমস্ সব ব্যাপারেই আমার নিজস্ব বক্তব্য ছিল। একটা মন ছিল নিখুঁতভাবে সব গড়ে তোলার। তবুও 'থানা থেকে আসছি', 'রাজকন্যা', 'সূর্যতপা'—এ ছবিগুলিকে আমি তো হারিয়ে ফেলতে পারি না। ফ্লোরে ঢুকলেই 'ছোটী সি মুলাকাৎ'কে ঘিরে আমার চিন্তা-ভাবনাগুলোকে ফ্লোরের বাইরে রেখে আসতাম।

১৯৬৫ সালে মুক্তি পেল ছবিগুলো। আমার 'ছোটী সি মুলাকাৎ' তখন একটু একটু করে এগুচ্ছে। আমি যেন আমার নিজেকে ভুলতে বসলাম। আমার আমি থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। আমার বাড়ি, আমার সংসার, আমার মা, আমার ভাইয়েরা, আমার ছেলে, আমার গৌরী, আমার রক্তে-মাংসে গড়া ভিতরকার মানুষটাকেও যেন ভুলে যেতে বসেছি।

এই হয়তো কলকাতার কোন স্টুডিওতে চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করছি—এই হয়তো উড়ে চলেছি বোম্বাই। 'ছোটী সি মুলাকাৎ'-এর কাজ সেখানে অনেকটা এগুচ্ছে। বিন্দুমাত্র কার্পণ্য না করে এগিয়ে চলেছি। আমার অক্লান্ত পরিশ্রমের অর্থ ঢেলে আমার শিল্প-চেতনা দিয়ে আমি গড়ে চলেছি একটা বিরাট ছবি।

চলেছি যেন কোন পর্বতের উত্তুঙ্গ শিখরের ধার ঘেঁষে। একটু কেঁপে উঠলেই আমার নিশ্চিত পতন। স্থির লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্ম আমি একটু একটু করে এগিয়ে চলেছি। এখানে শুধু একটা ছবি তৈরির কথাই মুখ্য নয়, অনেক দায়িত্ব। সে-দায়িত্ব আমার পাশে পাশে থাকা মানুষগুলোকে নিয়ে। যাঁরা বিশ্বাস আর সম্মান দেখিয়ে সর্বতোভাবে আমাকে সাহায্য করে চলেছেন।

আসলে 'ছোটী সি মুলাকাৎ' ছিল বাংলার সুপারহিট ছবি 'অগ্নিপরীক্ষা'র হিন্দী ভার্সান। কাহিনী আশাপূর্ণা দেবীর। আমি হয়ত সেই কারণেই আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু জীবন দেবতা আমায় নিয়ে অন্য খেলা খেললেন।

এল ১৯৬৫ সালের সেই অভিশপ্ত সেপ্টেম্বর। আমি যেন সহসা আমার চলার পথে এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশের গহ্বর দেখতে পেলাম। পতন অনিবার্য!

সর্বনাশের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবার ঠিক আগে আমি এতটুকু বিচলিত হলাম না। এতটুকুও স্নায়ু দুর্বল হ'ল না। সেই সর্বনাশা গহ্বর হ'ল পাকিস্তানের যুদ্ধ। পাকিস্তান যেন আমাদের গোটা ভারতকে গ্রাস করতে বদ্ধপরিকর। ওদিকে আমি ফেঁদে বসেছি এমন একটা সেট, যেটি শুধু তৈরি করতে নয় যার কাজ সমাপ্ত করতে প্রায় লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন। একটি নাচের সেট। অথচ ঐ একটি সেটের জন্ম যা খরচ তা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে যেন দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। তবু সংগ্রহ করতে হবে। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আমি তখন রীতিমত উদভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। স্নান-খাওয়া ভুলতে বসেছি।

বাড়িতে সারাদিনের মধ্যে এক মিনিটের জন্যও মন বসাতে পারছি না। চারিদিকে যুদ্ধের দামামা তখনও বাজছে। সব কিছুর দাম তখন রীতিমত চড়া।

চিত্রনির্মাতারা রীতিমত ভীত। সাহসে ভর করে কেউ ব্যবসায় টাকা খাটাতে চাইছেন না। লেনদেন প্রায় বন্ধ। তবুও সেই নাচের সেট ক্যানসেল করা যায় না। ক্যানসেল করলে রসাতলে চলে যাবে আমার স্বপ্ন।

একটা অস্বস্তি। আমি তখন উন্মাদ প্রায়। এর মধ্যে চার-পাঁচখানা ছবিতে যে চুক্তি ছিল তাও পূর্ণ করতে হচ্ছে। শুধু অপরের ছবি কেন, আমার নিজের ছবিরও কাজ। সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী কাজ। আমি তখন কাজের মধ্যে দিশাহারা।

এই সময়ে বেণু অর্থাৎ সুপ্রিয়ার সাহচর্য, তার সহযোগিতা, আমাকে ঘিরে তার চিন্তা আমার জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা। বেণুর সেদিনের সেই রূপটি আমি ভুলব না কোনদিন। তার মধ্যে একদিকে 'শুধু একটি বছর' ছবির পরিচালনা ও চিত্রনাট্যের দায়িত্ব, আবার অন্যদিকে 'কাল তুমি আলেয়া' ছবিতে আমি সঙ্গীত-পরিচালক।

কাজকে আমি ভয় পাই না। বরং কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাই।

সেই একরাশ কাজের আনন্দে যতটা আমি আত্মহারা—তেমনি সেই নাচের সেটের জন্য আমি ততটা উন্মাদ। সমস্ত দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে আমি আমার পূর্ব চুক্তি অনুসারে কাজ করে চলেছি। সেই সঙ্গে সেই সেটের শুটিং ডেট এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়েই আমি পাড়ি জমালাম বোম্বাইতে।

অপরিসীম চেষ্টা করেও পারলাম না শুটিং করতে। সেই সেট এবং ডেট নিরুপায় হয়ে ক্যানসেল করলাম।

মনটা যেন সেই মুহূর্তে ভেঙে দুমড়ে তালগোল পাকাতে চেয়েছিল। নিজেকে শক্ত করে শুধু পূর্ব-চুক্তিবদ্ধ ছবিগুলোতে অভিনয় করে চলেছি। কিন্তু আমার সারা মন জুড়ে 'ছোটী সি মুলাকাৎ'।

১৯৬৬ সাল এল।

মুক্তি পেল আমার একে একে পাঁচখানা ছবি। মুক্তি পেল আমার পরিচালিত 'শুধু একটি বছর' আর সঙ্গীত পরিচালিত 'কাল তুমি আলেয়া'।

একদিকে প্রদর্শিত হতে থাকল এই ছবিগুলো, অন্যদিকে আমি শুটিং করতে থাকলাম নতুন নতুন ছবিতে। মাঝখানে আবার নতুন উদ্দীপনায় শুরু

করলাম 'ছোটী সি মুলাকাৎ' ছবির কাজ। প্রস্তুত হলাম সেই নাচের সেটটিকে রি-মেক করতে। এমন সময় আবার এক নতুন আশার আলো বহন করে নিয়ে এল বি. এ. জে. ফ-র আমন্ত্রণ পত্র।

সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ছবির শ্রেষ্ঠ নায়ক হিসাবে সাংবাদিক মহল পুনরায় আমাকে পুরস্কৃত করলেন। সত্যজিৎবাবুর ছবিতে সেই আমার প্রথম কাজ। 'নায়ক' এক অভিনেতার জীবনকাব্য। বলা বাহুল্য কাজ করে খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম। আমন্ত্রিত হলাম বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব থেকে।

সেদিন সেই মুহূর্তে সারা দেহমনে খুশির হিল্লোল খেলে গেল।

বার্লিন যাবার আগে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। একরাশ কাজের ব্যস্ততায় যেন কতদিন মাকে দেখিনি সেইভাবে মাকে জড়িয়ে ধরলাম। আমার দিকে চেয়ে রইলেন আমার মা। মায়ের সেই দৃষ্টির আলোয় যেন আমাদের কুলগুরুদেবকে, তাঁর সেই আশীর্বাণীকে নতুন করে প্রত্যক্ষ করলাম।

মাকে প্রণাম করে বার্লিন যাবার অনুমতি চাইলাম।

মা আমাকে হাসতে হাসতে অনুমতি দিলেন।

একদিকে এই সম্মানে আমি আনন্দিত, অন্যদিকে আর এক নতুন উপসর্গের জন্য ভারাক্রান্ত। হারব না। হারতে আমি জানি না। সেই উপসর্গের জন্য আমি প্রস্তুত হলাম। শুরু করে দিলাম নাচের তালিম নিতে। সারাদিন শুটিং করে বাড়ি ফিরে সন্ধ্যে থেকে নাচের রিহার্সাল প্রায় দু' ঘণ্টা করে প্রতিদিন। একটি বছর ধরে আমি এই তালিম নিয়েছিলাম, এতটুকুও ক্লান্তি-বোধ করিনি কখনও। বেণুর পরিশ্রমও অস্বাভাবিক। এই নাচের তালিমে তার যে সাহায্য ছিল তা ভোলা যায় না—যাবে না।

বেশ মনে পড়ে, আমার এই পরিশ্রমের জন্য অনেকেই বিশেষ করে বেণু মাঝে মাঝে কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে যেত। মাঝে মাঝে বলত, তুমি এত খাটছ, শরীরের দিকে নজর রাখছ না, এত পরিশ্রম করা কি ঠিক হচ্ছে!

একান্ত আপনজনদের এ কথাগুলো কত সুন্দর, কতখানি আন্তরিকতা মেশানো তা আমি বুঝতে পারতাম, তবুও মেনে নিতে পারতাম না। বলেছিলাম, তোমরা বুঝতে পারছ না, তামাম বাংলাদেশের দর্শক আমাকে কোথায় বসিয়েছে। আজকে হিন্দী ছবিতে আমার ডিফিট মানে বাংলাদেশের ডিফিট। ওরা আর কথা বলেনি।

'ছোটী সি মুলাকাৎ' আর তারই পাশে পাশে আরও পাঁচখানা ছবিতে আমি অভিনয় করে চলেছি। এক সময়ে অনেক মূল্যে গড়া বহু অর্থে তৈরি 'ছোটী সি মুলাকাৎ' শেষ হলো।

১৯৬৭ সাল এল। মুক্তি পেল—'নায়িকা সংবাদ', 'চিড়িয়াখানা', 'অ্যান্টনী ফিরিঙ্গি', আমার অনেক স্বপ্নে ঘেরা 'ছোটীসি মুলাকাৎ', 'জীবনমৃত্যু', 'গৃহদাহ'।

বছর আরম্ভের প্রথম দিনের আলো দেখে আমি বুঝতে পারিনি আমার জীবনে কি বার্তা বহন করে নিয়ে এল নতুন বছরটা। আমি মনে মনে প্রস্তুত। উত্থান হলে উচ্ছ্বসিত হবার কারণ থাকবে না। পতন এলে নিজেকে নিঃশেষ করে দেব না। শুধু প্রতীক্ষায় রইলাম আমার দর্শকদের শেষ বিচারের আশায়।

১৯৬৭ সালে 'চিড়িয়াখানা' ছবির শ্রেষ্ঠনায়ক হিসাবে আবার সাংবাদিকদের পুরস্কার মাথা পেতে গ্রহণ করলাম। বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের হাত থেকে সেই অনুষ্ঠানমঞ্চে দাঁড়িয়ে পুরস্কার গ্রহণ করলাম হাসিমুখে। 'চিড়িয়াখানা' আমার অভিনীত সত্যজিৎ রায়ের দ্বিতীয় ছবি। কাহিনী ছিল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

শুধু তাই নয়, ১৯৬৭ সালে 'ভরত' পুরস্কার এল আমার কাছে। স্বীকৃতির এই জয়টীকা আমাকে আমার শিল্পীজীবনকে সার্থক করে দিল। হাসিমুখে পুরস্কার গ্রহণ করলাম। মাননীয় রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনের হাত থেকে মাথা পেতে নিলাম এই জয়মাল্য।

সেদিন আমার মায়ের চোখে দেখেছিলাম জল। আনন্দ-অশ্রুতে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন সেদিন। খুশি খুশি মন নিয়ে তখন শুধু তাকিয়ে আছি আমার 'ছোটী সি মুলাকাৎ'-এর দিকে।

অবশেষে সেই বিচারের দিন এসে গেল। ছবি রিলিজের দিনটি এল।

আমার অনেক সাধের অনেক পরিশ্রমে অনেক স্বপ্নে গড়া 'ছোটী সি মুলাকাৎ' ছবি রিলিজের দিনেই হঠাৎ ভীষণ খারাপ বোধ হতে লাগল শরীরটা। সমস্ত শরীরে একটা অস্বস্তি। বুকে মৃদু ব্যথা অনুভব করলাম। ওদিকে আমার ছবি রিলিজ, এদিকে আমি ময়রা ষ্ট্রীটের বাড়িতে শয্যা নিলাম। বেণু কিছুতেই আমাকে ঘরের বাইরে যেতে দিল না। বেণু সংগে সংগে খুব বড় ডাক্তার শৈলেন সেনের সংগে ফোনে যোগাযোগ করল, তাকে ডেকে আনল ফ্ল্যাটে। ডাক্তার শৈলেন সেন হলেন ডাক্তার সুনীল সেনের বাবা। পরে এলেন ডাক্তার যোগেশ ব্যানার্জী। মুহূর্তের মধ্যে ময়রা ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাটেই চিকিৎসার সব ব্যবস্থা পাকা করা হলো। আমি যে স্ট্রোকে আক্রান্ত তা জানতে পারলাম। এই

আমার প্রথম আক্রান্ত হওয়া।

আমি সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী। ঘরের বাইরে যাবার অনুমতি নেই। বেণু আমাকে তার সেবা যত্নে আর নিয়মিত ওষুধে বাঁচিয়ে রাখছে।

ওদিকে শুনলাম গৌরীও মারাত্মক অসুস্থ। ভয়ঙ্কর রক্তক্ষরণ। কঠিন রোগ। ইনফেকটিভ হেপাটাইটিজ তার রোগের নাম। শুনলাম গৌরীকে পি. জি. হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ৬৯০ বার রক্ত দেওয়া হয়েছিল। পি. জিতে সব ডাক্তাররা গৌরীকে বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। বাড়িতে লক্ষী পুজো। গৌরী নাকি সেই অসুস্থ শরীর নিয়ে বাড়ি আসতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার মণি ছেত্রী সেই অনুমতি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, একদিনের জন্য যেতে পারেন, কোন রকম নড়া চড়া চলবে না। গৌরী লক্ষী পুজোর দিন বাড়িতে এসেছিল, ময়রা স্ট্রীট থেকে আমিও গেলাম। আমাকে চেয়ারে করে ওপরে তোলা হয়েছিল। তারপর আবার গৌরী হাসপাতালে। আমিও কিছুটা সুস্থ। আমি গৌরীকে দেখতে যেতাম—কিন্তু হাসপাতালে আমি ঢুকলে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। শেষ পর্যন্ত সবাই বললেন, আপনি এখানে যদি না আসেন ভাল হয়—আমি মেনে নিয়েছিলাম।

'ছোটী সি মুলাকাৎ' চরমতম আঘাত হানল আমাকে। আর্থিক সাফল্য আনল না এই বিরাট ছবি। বাংলা তথা ভারতীয় বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, শিল্পজ্ঞান সম্পন্ন দর্শকরা আমার পাওনা সুদে-মূলে মিটিয়ে দিলেন। আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। আমার প্রশংসায় কোন কোন সংবাদপত্র হল মুখর—আবার কোন কোন সংবাদপত্রে আমার অখ্যাতি। আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলাম না। ঠিক সেই মুহূর্তে দুর্বল হতে পারলাম না। আমার মাথায় তখন মোটা অঙ্কের ঋণ। আমার চারিদিকে একাধিক পাওনাদার। আমার চোখের সামনে একরাশ অন্ধকার। আমি ওদের আশ্বাস দিলাম যত তাড়াতাড়ি পারি ঋণ শোধ করব। অবশেষে ঋণ শোধ করার আকাঙ্ক্ষায় আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। একটা সান্ত্বনা পেলাম মনে যে আমার গৌতম বড় হচ্ছে।

দার্জিলিঙ থেকে এনে ওকে লা মার্টিনেয়ারে ভর্তি করেছিলাম এটা আগেই বলেছি। গৌতম অবশ্য বাড়িতে থাকত না, থাকত লা মার্টিনেয়ারের হোস্টেলে। আসলে বাড়ি থেকে যাতায়াতের সুবিধার জন্য নয়, যদিও আমাদের ভবানীপুরের বাড়ি থেকে বেশী দূরে স্কুল নয়, তবুও তাকে হোস্টেলে ভর্তি করা হয়েছিল, এই পরিবেশ থেকে আলাদা করে গড়ে তোলার জন্য। পরে গৌরী যখন খুব অসুস্থ তখন তাকে বাড়িতে আনা হলো। এখানে থেকে গৌতম জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করল। আমার মন খুশিতে ভরে গেল।

এবার ভাবনা হলো গৌতমের কি হবে! কী করবে গৌতম! আমি তো সব সময় বাবার পূর্ণ কর্তব্য করতে পারতাম না আমার ব্যস্ততার জন্যে, তাই অনেকেই মাঝে মাঝে গৌতম প্রসঙ্গে আমাকে ভাবাত। লালুও বলত। কিন্তু গৌতম আমার কাছে দাঁড়িয়ে তার চাহিদার কথা জানাত না। আমার বাল্যবন্ধু লালু অর্থাৎ ডাক্তার লালমোহন মুখার্জী আমাকে পরামর্শ দিতে থাকল গৌতমের জন্য একটা ডাক্তারখানা করে দিলে ভাল হয়। স্বাধীন ব্যবসা। আমি আমার কর্তব্য করে চলেছি আর ভেবে চলেছি গৌতমের জন্য কী করা যায়!

ছবি করছি। অনেক ছবি। আর অর্থ যা আসছে তা দিয়ে একটু একটু করে আমি ঋণমুক্ত হচ্ছি।

'ছোটী সি মুলাকাৎ' আমাকে নিঃস্ব করে দিলেও পরিশ্রমের মাধ্যমে যখন সেই ঋণ শোধ করে ফেললাম তখন যেন সমস্ত দেহমন আমার হালকা হয়ে গেল। আমি আবার নতুন করে শুরু করলাম আমার অভিযান।

দেনা মেটাবার জন্য ছবির মাত্রা বাড়িয়েছি। দিনের পর দিন শুধু কাজ করে গেছি আগামী বছরগুলিকে আবার নতুন করে সাজিয়ে তুলবার ছুঁবিবার আকাঙ্ক্ষায়।

১৯৬৮ সাল আমার জীবনের আর এক অধ্যায় রচনা করল।

শুধু আমার অভিনীত ছবিগুলির মুক্তি। আর সেই একই আবর্তে এল আবার চলেও গেল ১৯৬৯ আর ১৯৭০। তারপর ১৯৭১ সাল।

অভিশপ্ত '৭১।

বছরের শুরুতেই বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প অপ্রত্যাশিতভাবে হারালো এক সদা হাস্যময় বন্ধুকে। আমি যেদিন চিল্কাতে যাচ্ছিলাম সেদিন যদিও জানতাম গিরীনদা অসুস্থ, তবুও একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি গিরীনদা আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। গিরীন্দ্র সিংহ। উল্টোরথ ও পরে প্রসাদ পত্রিকার কর্ণধার। ছবির প্রযোজক।

আমি চিল্কাতে 'আলো আমার আলো' ছবিতে শুটিং করছিলাম।

আমার বিপরীতে ছিল রমা। অর্থাৎ সুচিত্রা সেন। রমাই প্রথম আমাকে এই মর্মান্তিক খবরটা দিয়েছিল। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ছবির টেকনিসিয়ানরাও স্তম্ভিত। ধরা গলায় বললাম, কবে ?

রমা বলেছিল, ২রা ফেব্রুয়ারী।

মৃত্যুর কিছু আগে রমা শেষবারের মত আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে দেখে এসেছিল গিরিনদাকে। আমি দেখতে পাইনি। খবরটা কানে যেতে সেদিন আর কাজ করতে পারলাম না। যেদিন মৃত্যু-খবর পেলাম তার কিছুদিন আগেও গিরীনদার অর্থাৎ প্রযোজক গিরীন্দ্র সিংহের 'নবরাগ' ছবিতে কাজ করেছি। এই ছবিটাকে ঘিরে গিরীনদার কতই না স্বপ্ন। এই ছবির পরে কত নতুন নতুন পরিকল্পনা ছিল তাঁর। সব স্বপ্নের অবসান। ছবি মুক্তির মাত্র দু'দিন পর গিরীনদা সব রেখে চলে গেলেন। মুক্তির দিনে নিজের ছবিকে নিজেই দেখে আসতে পারেননি হাউসে গিয়ে। রোগশয্যায় শুয়ে ফোনে খবর নিয়েছিলেন।

সেই গিরীনদা যেন বারবার আমার মনের ওপর এসে হাজির হতে থাকলেন। সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, আমি যখন অসুস্থ ছিলাম তখন গিরীনদা ঘন্টার পর ঘন্টা আমার পাশে বসে অভয় দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন। আপনজন-হারাবার ব্যথা অনেকবার অনুভব করেছি, তবু গিরীনদা নেই, এই মর্মান্তিক সত্যকে যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না আজও। গিরীনদার শেষ ছবি 'নবরাগ'। আমারও গিরীনদার সংগে সেই শেষ দেখা। মনে আছে ১৯৬৮ সালের শেষদিকে আমি অসুস্থ থাকার সময়ে গিরীনদা আমার পাশে গিয়ে শুধু বসতেন না, এমন ভাবে অভয় দিতেন, মনে হতো প্রকৃত গার্জেন। সুস্থ হবার পরই গিরীনদা আমাকে নিয়ে যে ছবি করেছিলেন তার নাম 'মন নিয়ে'। 'মন নিয়ে' জনপ্রিয়ও হয়েছিল। ছবির গোটা কাহিনীটাই ছিল সাইকোলজিকাল ট্রিটমেন্টের ওপর ভিত্তি করে।

যতদিন আছি সাধনা আমাকে করতেই হবে।

শত বেদনা এলেও সব বেদনা বুকে নিয়েই আমাকে হাসি মুখে কাজ করে যেতে হবে। তাই 'আলেয়া', 'আমার আলো', 'বিরাজ বৌ', 'অন্ধ অতীত' ইত্যাদি ছবিগুলির কাজ একদিকে যেমন চালিয়ে যেতে লাগলাম তেমনি একে একে সাত-সাতখানা ছবি মুক্তি পেল ১৯৭১ সালে। প্রত্যেকটি ছবিই ব্যবসায়িক দিক থেকে অসাধারণ সাফল্য এনে দিল।

ঠিক যে মুহূর্তে নিজেকে সব বেদনা থেকে সরিয়ে এনে অফুরন্ত কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছি ঠিক সেই মুহূর্তে আর এক দুর্ঘটনার খবরে মনটা

ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। খবরে দেখলাম এক আততায়ীর গুলিতে হেমন্ত বসু নিহত। ২০শে ফেব্রুয়ারী অকস্মাৎ এই প্রিয় জননেতার মৃত্যুতে সব কাজ স্তব্ধ হয়ে গেল। আমিও যেন কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারছিলাম না।

চারদিকে যেন মৃত্যুর ভয়ঙ্কর চেহারা। কাজে তবুও ফাঁকি দিতে পারিনা। সব বেদনা বুকে নিয়েই একটার পর একটা ছবিতে কাজ করে চলেছি। কখনো এলাহাবাদে, কখনো লক্ষ্ণৌতে আবার কখনো একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে চলেছি আউটডোর শুটিং-এ। 'ছিন্নপত্র', 'জীবন-জিজ্ঞাসা', আরও বহু ছবি।

১৯৭১ সালে আমার জীবনে একটা প্রচণ্ড দুর্ঘটনা ঘটে যাবার ইংগিত পেলাম। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি আমি একান্ত নিরুপায় হয়ে চলে গেলাম কোলকাতা ছেড়ে। আমি কোথায় যাচ্ছি এবং অপ্রত্যাশিতভাবে কেনই বা চলে যাওয়া তা কারও কাছে প্রকাশ করার অবকাশটুকুও পাইনি তখন। তবে সেদিন আমার চলে না গেলে কোন উপায় ছিল না। একান্ত বাধ্য হয়েই আমাকে চলে যেত হয়েছিল। বম্বে গিয়ে আমি দেবেশের ফ্ল্যাটে উঠেছিলাম। সেদিন দেবেশ ঘোষ আমাকে সেল্টার দিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেনি। প্রায় আড়াই মাস পর সসম্মানে মাথা উঁচু করে আমার একান্ত আপনার দেশে, সাধের কোলকাতায় ফিরে এসেছিলাম।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রসাদ পত্রিকায় আমার এই অন্তর্ধানের বিষয়ে একটা সংক্ষিপ্ত খবর প্রকাশিত হয়েছিল। খবরটি এই রকম—

> "উত্তমকুমার সুদীর্ঘ আড়াই মাস কোলকাতায় অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে কোলকাতার স্টুডিওগুলির অবস্থা দারুণ শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। ওঁকে নিয়ে তখন শুটিং চলছিল বড় বড় পাঁচখানা ছবির।......চলে যাওয়ার ফলে তাঁর এই পাঁচটি ইউনিটের তাবৎ কলাকুশলী এবং সহশিল্পীরা বেকার বসে ছিলেন। উত্তম বিহনে ফিল্ম লাইনের জীবনে এই ধরনের ট্রাজেডি এই সর্বপ্রথম। এবার আর একটা জিনিস খুব পরিষ্কার উপলব্ধি করা গেল যে ওঁকে বাদ দিয়ে আপাতত আর কিছু করা যাবে না।......"
>
> "প্রসাদ" অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

এই খবর পড়ে আমি বিন্দুমাত্র খুশি হতে পারিনি। কারণ অনিচ্ছাকৃত ভাবে আমার সাধের শিল্পক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে আমি সেই শিল্পের ক্ষতি করেছি বলে আমার মনে একটা অনুশোচনা আছে। এ যুগের এক অস্থিরতা আমাকে যেন বাধ্য করেছিল চলে যেতে।

আড়াই মাসের পর ফিরে এসে আমি আবার আমার অন্তরের সবটুকু শ্রদ্ধা

দিয়েই কাজ শুরু করেছিলাম 'বনপলাশীর পদাবলী', 'বিরাজ বৌ', 'স্ত্রী', 'সোনার খাঁচা' ছবির। 'বনপলাশীর পদাবলী' ছিল আমার জীবনের আর এক স্বপ্ন। সব কথা বলার আগে এই 'বনপলাশীর পদাবলী' ছবিটিকে নিয়ে যে অন্তরঙ্গ ছবি এঁকেছিলাম তার কথা বলি।

একটা বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরেই তৈরি হয়েছিল শিল্পীসংসদ।

সকলেই জানেন আমি এই শিল্পীসংসদের সভাপতি-পদে আজও অধিষ্ঠিত। এটা আমার কাছে কম গর্বের নয়। যেদিন সকলে আমাকে শিল্পীসংসদের সভাপতি-পদে বসালেন সেদিন থেকেই এই সংসদকে নিয়ে আমারও একটা স্বপ্ন ছিল। মনে মনে এই আশাই পোষণ করতাম যে শিল্পীসংসদকে এমন করে গড়ে তুলতে হবে যা অন্যদের কাছে হবে দৃষ্টান্ত। প্রত্যেকটি শিল্পী সভ্য-সভ্যাদেরও এই সংসদের প্রতি যে আন্তরিকতা তাও আমাকে খুশি করেছিল।

আমার অনেক পরিকল্পনার মধ্যে প্রধান পরিকল্পনা ছিল দুঃস্থ শিল্পীদের পাশে দাঁড়াবার। আমাদের সকলেরই একই চিন্তা কি ভাবে এই সংসদের মাধ্যমে দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্য করা যায়। সুযোগ এসে গেল। প্রবীণ চিত্রপরিচালক এবং সংসদ-সম্পাদক অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় খুব বেশী উৎসাহিত হলেন। উৎসাহের কোন অভাব কারও মধ্যে দেখা যায়নি। আমরা ঠিককরলাম, প্রতিটি শিল্পী যদি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন, তাহলে সংসদের পক্ষ থেকে একটা ছবি তৈরি করে তারই অর্থে দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্য করা যেতে পারে।

প্রশ্ন উঠতে পারে আমাকে নিয়ে! যতই আমি সংসদ-সভাপতি হই না কেন, আমি কি আমার পারিশ্রমিক ছাড়তে পারব? পারিশ্রমিক শুধু অভিনয়ের ক্ষেত্রে নয়, পরিচালনা এবং চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রেও। আসলে অনেক টাকার ব্যাপার। কিন্তু কোন প্রশ্নই উঠল না। আমি সানন্দে জানালাম, সংসদ আমার ওপরে যত দায়িত্বই দিক আমি মাথা পেতে নেব। যদি সংসদ একটা নোবল্ কজ-এ ছবি করার সিদ্ধান্ত নেয় ও আমার ওপরে দায়িত্ব দেয়, আমি আমার সব দায়িত্ব সম্পাদন করব বিনা পারিশ্রমিকে।

অনেক আলোচনা, অনেক পড়াশোনার পর আমরা 'বনপলাশীর পদাবলী' কাহিনীর চিত্ররূপ দিতে মনস্থ করলাম। রমাপদ চৌধুরীর কাহিনী। সময় মত রমাপদবাবুর কাছ থেকে কাহিনীর চিত্রস্বত্ব নেওয়া হলো। আমি জানিয়ে দিলাম এই ছবির ব্যাপারে আমি কোনরকম পারিশ্রমিক নেব না। সংসদের পক্ষে অর্দ্ধেন্দুবাবু জানালেন, উত্তম, সংসদের এই ছবির ব্যাপারে সব দায়িত্ব সংসদ তোমার ওপরে দিয়েছে। তুমি যা করবে, যা ভাবে তাই হবে।

আমার ওপরে সকলের অগাধ বিশ্বাস। আমার একাধিক ছবির কাজ

থাকা সত্ত্বেও আমি হাসি মুখে মাথায় তুলে নিলাম এই গুরু দায়িত্ব।

এই কাহিনী বেছে নেবার পিছনেও আমার একটা মানসিক প্রস্তুতি এবং চিন্তাধারা অবশ্যই ছিল। কি সেই চিন্তা তা স্পষ্ট করে বলতে গেলে এ কথাই বলতে হয়, সংসদের অধিকাংশ শিল্পীরা বিনা পারিশ্রমিকে যখন অভিনয় করতে রাজী হয়েছেন, তখন তাঁদের সম্মানীয় চরিত্রে অর্থাৎ প্রত্যেকের যাতে কিছু না কিছু দৃষ্টি আকর্ষণীয় চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পায় তার জন্যই 'বনপলাশীর পদাবলী'র মত বিরাট ক্যানভাসের গল্প আমরা নিয়েছিলাম। রণজিৎমল কাঙ্কারিয়াও এগিয়ে এলেন আমাদের এই বিরাট কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে।

এবং রণজিৎ পিক্‌চার্সই এই ছবির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছিল।

আর একটা কথা বলা দরকার। শিল্পীসংসদ শুধুমাত্র সিনেমায় যাঁরা অভিনয় করেন তাঁদের জন্যই নয়। সিনেমা, থিয়েটার এবং যাত্রার শিল্পীরাও এই সংসদের সভ্য।

যাত্রার জনপ্রিয় নট স্বপনকুমারও তাই 'বনপলাশীর পদাবলী' ছবিতে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। যাহোক, যথা সময়ে ছবির প্রাথমিক কাজ এবং চিত্রনাট্যও শেষ করে ফেললাম।

সারাদিন চরম ব্যস্ততার মধ্যেও বনপলাশীর চিত্রনাট্য আমি নিয়মিত লিখেছিলাম। ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক—এমনকি প্রত্যেকটি গানের সুরের ব্যাপারেও আমি দিবারাত্র ভেবেছিলাম।

একটা ব্যাপারে স্যাটিস্ফ্যাকশন না আসা পর্যন্ত আমি দ্বিতীয়টা আরম্ভ করতাম না। এক রবিবার আমার বাড়িতে গানের এবং ব্যাক গ্রাউণ্ডের ব্যাপারে আলোচনা করবার জন্য একটা আসর বসালাম। বলাবাহুল্য, রবিবার দিনটি যদি আউটডোর না থাকে, তবে আমার বড় আপনদিন। সেই আপন প্রায় প্রতিটি রবিবার ছেড়ে দিলাম বনপলাশীর জন্য। সেই রবিবারে অর্দ্ধেন্দুদা সকালেই বাড়িতে চলে এলেন। সারাদিন এমন কি দুপুরেও খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে চিত্রনাট্য নিয়ে আলোচনা করে নিলাম অর্দ্ধেন্দুদার সংগে। আমি কোথায় কি করব, কোন শটটা কি ভাবে টেক করব এইসব। ট্রেন চলার মত একটা ঝিক্ ঝিক্ শব্দ কেন ছবিতে ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিক হিসেবে ব্যবহার করব তাও আলোচনা করলাম।

আমার ময়রা স্ট্রীটের সুবৃহৎ ড্রইংরুমের মাঝখানে আসর পাতা হলো। হারমোনিয়াম, তবলা ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হলো। বিকেল চারটে নাগাদ সকলের আসার কথা। এইদিনই গৌরাঙ্গ আমার কাছে এল। আমি গৌরাঙ্গকে এইদিন আমার বাড়িতে আসতে বলেছিলাম। কেন আসতে

বলেছিলাম তা তখন আমিও জানতাম না। গৌরাঙ্গ কি যেন একটা বিশেষ ব্যাপারে আমার সংগে আলোচনা করতে চায় এমন একটা কথা ক'দিন আগে স্টুডিওতে দেখা করে বলেছিল। আমি আন্দাজ করেছিলাম ও কিছু লিখতে চায় আমাকে নিয়ে। কি লিখতে চায় তা না জেনেই ওকে আমি এইদিনই আমার ময়রা স্ট্রীটের বাড়িতে দেখা করতে বলেছিলাম।

ঠিক চারটে নাগাদ গৌরাঙ্গ এল। আমি ওকে ভিতরে আসার অনুমতি দিলাম। একটু পরেই এলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। আমি দ্বিজেনবাবুর আসবার আগে থেকেই হারমোনিয়ামের মাথাতে যে মিউজিকটা চাইছিলাম সেটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছিলাম। গৌরাঙ্গ নীরবে আমার পাশে গালিচায় বসেছিল। আমাকে ব্যস্ত দেখে সে যা বলতে চায় বলতে পারছিল না। আমারও অবশ্য শোনার অবকাশ ছিল না। তার পরেই দ্বিজেনবাবু এলেন। গৌরীদা অর্থাৎ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের আসবার কথা। গান নিয়ে আসবেন। তেমনি কথা ছিল। অর্দ্ধেন্দুদা বসেছিলেন সামনের সোফায়। দ্বিজেনবাবু আসতেই আমি আলোচনা শুরু করলাম। দ্বিজেনবাবু হারমোনিয়াম টেনে নিলেন। তখনও গৌরীদার পাত্তা নেই। শেষ পর্যন্ত অর্দ্ধেন্দুদা বললেন ততক্ষণে একটা গান হয়ে যাক। ভিতর থেকে সোমা এসে আমার পাশে বসল। তার একটু পরেই সোমার মা বেণু অত্যন্ত আটপৌরে ভাবে এসে বসল দ্বিজেনবাবুর পাশে। বেণু অর্থাৎ সুপ্রিয়াও অর্দ্ধেন্দুদার কথায় সায় দিল। দ্বিজেনবাবু শুরু করলেন রবীন্দ্র সংগীত।

একটু পরে গৌরীদার আবির্ভাব। গান শেষ হলে, আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করলাম।

বেণু নিজ হাতে চা-পানে অতিথি আপ্যায়ন করল।

রাত আটটা নাগাদ আমাদের সেদিনকার মত আসর শেষ হলে গৌরাঙ্গ তার মনের আশা ব্যক্ত করল। আমার আত্মজীবনী লেখার ব্যাপারে তার উৎসাহ। শেষ পর্যন্ত আমি ওকে উৎসাহিত করার জন্য রাজী হলাম। কথা হলো ওর অনুলেখনে আমি আমার জীবনের সব কথা বলব। সেদিন আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়ে গৌরাঙ্গ বোধহয় একরাশ আনন্দ নিয়ে চলে গেল।

এমনি করেই চরম ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও হাসি খুশি নিয়ে আমরা এক সময়ে 'বনপলাশীর পদাবলী' ছবির কাজ শুরু করেছিলাম।

এরই মধ্যে নিয়মিত শুটিং করছিলাম 'বিরাজ বৌ', 'স্ত্রী', 'সোনার খাঁচা', ছবির। 'ছিন্নপত্র'র কাজও কিছু ছিল। তার মধ্যে আবার আমাকে নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন অসীমাদি। অসীমা ভট্টাচার্য। নিমাই ভট্টাচার্যের

'মেমসাহেব' কাহিনীর মহরৎ করলেন। আমি নায়ক। টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে মহরৎ অনুষ্ঠানে ক্ল্যাপষ্টিক দিলেন ওয়াই-বি-চ্যবন। আমিও উপস্থিত ছিলাম। এটা ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা।

এত কাজ এত দায়িত্ব এত কর্তব্যের মধ্যেও আমি একদিকে যেমন হিন্দী-উর্দু শিখতাম, তেমনি অন্যদিকে ইংরাজী ও এষ্ট্রলজিও পড়তাম। নিখুঁত ইংরাজী পঠন-পাঠন আমার ইচ্ছা। আমার ইংরাজীতে অনর্গল কথা বলা ও লেখার জন্য মাষ্টার এলেন। তিনি ঠিক মাষ্টার মশাই বলে আমার পরিচিত ছিলেন না, তিনি লালুর অর্থাৎ আমার বাল্যবন্ধু লালমোহন মুখার্জীর ভগ্নিপতি শিবপ্রসাদ মজুমদার। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সে চাকরি করতেন আর সপ্তাহে দু'দিন ইংরাজী পড়াতেন আমাকে। মাসিক দু'শত টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে আমি এষ্ট্রলজিও পড়েছি। এক সময়ে এ ব্যাপারে আমি সিদ্ধহস্ত হয়েছিলাম বলে, ভবানীপুরের দু'চার জনের ঠিকুজী কুষ্ঠি আমিই তৈরি করে দিয়েছিলাম।

তারপর আবার সেই ভাগ্য বিড়ম্বনা। আমি যেন ফেরারী জীবন-যাত্রার মধ্যে নির্বাসিত হয়ে গেলাম।

প্রায় আড়াই মাস পর আবার ফিরে এলাম আমার আপন মাটিতে।

ইতিমধ্যে মনের ওপর আর একটা চাপ সৃষ্টি করল যুদ্ধ।

ইয়াহিয়া খাঁর পাকিস্তানী সোলজার সাড়ে সাত কোটী মানুষের বুকের ওপর চেপে ধরল বেয়নেট। শান্তি আর স্বাধীনতাকামী মুজিবর রহমানের ও সাড়ে সাত কোটী দেশবাসীর ওপরে পাকিস্তানের বর্বর অত্যাচার শুরু হলো। পাকিস্তান সরকারের বর্বর অত্যাচার থেকে সাড়ে সাত কোটী মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মুজিবর সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের কাছে সাহায্য চাইলেন।

কোলকাতায় শুরু হলো ব্ল্যাক আউট। চারিদিকে শুধু কাজ থাকা সত্ত্বেও এই ব্ল্যাক আউট আমাদের হাসিমুখেই মেনে নিতে হলো। সন্ধে হতে না হতেই গোটা শহরটা কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়তে থাকল। আমাকেও সন্ধের আগেই বাড়ী ফিরে আসতে হয়।

যুদ্ধ শুরু হলো। আমাদের ভারত সরকার সবকিছু দিয়েই সাহায্য করলেন মুজিবর রহমানকে। অনেক যুদ্ধ, অনেক হানাহানি দেখলাম। আর আমরা যুদ্ধ চাই না। অতীতের বহু ক্লেদাক্ত হানাহানির স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে চাই। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'র রক্তলোলুপতার অবসান কবে হবে? কবে?

আমরা শত চেষ্টা করেও যেন কাজে মন বসাতে পারি না। আমাদের তখন একমাত্র চিন্তা মুজিবের জয়। আলোচনা, যুদ্ধ।

অবশেষে এল সেই প্রতীক্ষিত দিন। নব জন্ম নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল মুজিবরের বাংলাদেশ।

ব্ল্যাক আউট উঠে গেল। আমরা আবার স্বস্তিতে কাজ শুরু করে দিলাম। আবার একটার পর একটা ছবির কাজ শুরু হলো আমাকে নিয়ে।

বনপলাশীর একটানা কাজও আরম্ভ করে দিলাম। এবার একটানা কিছুদিন আউটডোর করলাম বনপলাশীর।

এই প্রসঙ্গে একটা মধুর স্মৃতি মনে পড়ে গেল।

'বনপলাশীর পদাবলী'র বহির্দৃশ্য গ্রহণ করেছিলাম হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুরে। আমরা সদলবলে নারায়ণদার বাড়িতেই উঠেছিলাম। এর আগেও বহুবার গেছি।

নারায়ণদা অর্থাৎ সত্য নারায়ণ খাঁ আমার শুধু নয় বাংলা চলচ্চিত্র জগতের প্রত্যেকের যেমন শ্রদ্ধার তেমনি অত্যন্ত আপনজন। ভদ্রলোক একদিকে প্রখ্যাত পরিবেশক-সংস্থা চণ্ডীমাতা ফিল্মসের যেমন প্রাণস্বরূপ, তেমনি জগৎবল্লভপুরের তিনি যেন সবার একান্ত আত্মীয়। নিজের গ্রামকে অনেকেই অনেকভাবে ভালবাসেন জানি, কিন্তু নারায়ণদার ভালবাসা তাঁর নিজের গ্রামের প্রতিটি মানুষের মনের ভিতরে যেন ছড়িয়ে আছে।

শোভাবৌদি এখন আর নেই। শোভাবৌদি হলেন নারায়ণদার স্ত্রী। বছর পাঁচ-ছয় আগে সকলকে রেখে তিনি ঈশ্বরলোকে চলে গেছেন। ভদ্রমহিলা ছিলেন জগৎবল্লভপুরের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। গ্রামের নিরক্ষর ছেলে-মেয়েদের জীবনে তিনি নিজের হাতে জ্বালিয়েছিলেন শিক্ষা আর সৌন্দর্যের আলো। কী না করতেন তিনি! ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যাতে ভাল করে লেখাপড়া হয়, তারা যেন নিজেদের ভিতরটাকে নানা শিল্পচর্চার মাধ্যমে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে, তার জন্য নিজে দাঁড়িয়ে স্কুল তৈরি করিয়েছিলেন।

গ্রামের গরীব লোকদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল করেছিলেন। বাড়িতে তৈরি করেছিলেন অন্নপূর্ণার মন্দির। তারপর একদিন শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিলেন। নারায়ণদা স্ত্রীর সব আশাকেই পরিপূর্ণ করে তুলেছেন।

জগৎবল্লভপুরের সেই ছোট্ট হাসপাতালকে নারায়ণদা একটি পরিপূর্ণ সুবৃহৎ হাসপাতাল করে গড়ে তুলেছেন। তৈরি করে দিয়েছেন কলেজ। শোভারাণী মেমোরিয়াল কলেজের সুবিশাল সেই বাড়িটা না দেখলে নারায়ণদাকে চেনা যাবে না। গড়েছেন লাইব্রেরী, স্কুল। অন্নপূর্ণার মন্দিরে অতিথি আপ্যায়নের ত্রুটি নেই বিন্দুমাত্র। আজও গৃহ প্রাঙ্গণে প্রতিবছর একটি বিশেষ দিনে,

কয়েক হাজার মানুষকে খিচুড়ী খাইয়ে তৃপ্তি দেওয়া হয়। আজও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জগৎবল্লভপুরের মানুষেরা আনন্দ-খুশিতে ভরে ওঠেন নারায়ণদার এই আন্তরিকতা ও সহযোগিতায়।

বাংলা ছবির আউটডোর ব্যাপারটা এখন তো প্রায়ই লেগে থাকে জগৎবল্লভপুরে।

আমি বহু ছবির আউটডোর করেছি এই জগবল্লভপুরে। যতদিন ছবির কাজে সেখানে গেছি ততদিনই নারায়ণদা তাঁর সব কিছু দিয়ে আমায় শুধু নয় আমাদের প্রতি যে ভালবাসা দেখিয়েছেন তা জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত মনে থাকবে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে না খাওয়ালে যেন তাঁর ঘুম আসে না। আমরা না ঘুমোলে তাঁর যেন চোখে ঘুম নামে না।

ভদ্রলোক মানুষ হিসেবে কত বড়, তা ঠিক বোঝানো যাবে না, আর বোঝাতেও চাই না।

সেই নারায়ণদার বাড়িতেই উঠলাম বনপলাশীর আউটডোর করবার সময়। ওখানে থাকাকালীন একদিন শোভারাণী মেমোরিয়াল কলেজের পিছন দিকের মাঠে যাত্রাভিনয় হয়েছিল। গ্রামের ছেলেরা এবং দিলীপ আগেই জানিয়ে দিল আমাকে যাত্রা দেখতে হবে।

দিলীপ অর্থাৎ দিলীপ খাঁ, নারায়ণদার ছেলে। গ্রামের ছেলেদের নানাভাবে আনন্দ দেবার কাজটা যেন দিলীপের। যেমন মা-বাবা তেমনি তাঁদের ছেলে। ওর ছোটভাই প্রদীপ বরাবরই একটু লাজুক ছিল।

সদা হাস্যময় দিলীপ। আমি ওদের কথায় না বলতে পারলাম না। তা ছাড়া আসরে বসে যাত্রা অনেক যুগ দেখা হয়নি বলে সেদিন সে লোভ ছাড়তে পারলাম না।

যথাসময়ে আমি হাজির হলাম আসরে। শোভাবৌদির নামেই কলেজ বলে নয়, শোভাবৌদিকে আমি যেমন জেনেছিলাম, নারায়ণদাকে যেমন দেখেছি, তার সব কথাই পাঁচজনকে বলার ইচ্ছে ছিল মনের ভিতরে। যাত্রার আসরে গিয়ে সে লোভ সামলাতে পারিনি। যখন অনুরোধ এল কিছু বলার জন্য, আমি সংক্ষেপে আমার মনের কথা হাজার হাজার মানুষের কাছে বলেছিলাম সেদিন। দর্শকদের দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। এমন শান্ত দর্শক আমি ইতিপূর্বে কমই দেখেছি।

জগৎবল্লভপুরের ছেলেরা যেন জগৎবল্লভপুরের পরিবেশের মতই শান্ত। আমি নির্বিঘ্নে ওখানে গেছি, আজও যাই। অথচ আমাকে কেন্দ্র করে ওদের কোন দৌরাত্ম্যপনা কোনদিনই দেখিনি।

সেদিন যাত্রার আসরেও কোন উচ্ছ্বাস ছিল না। আমি যেন ওদের কত কাছের মানুষ।

ওদের ব্যবহারে এত মুগ্ধ হয়েছিলাম যে সেই রাতটা এবং জগৎবল্লভপুর আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

১৩৭১ সালের ১৭ই নভেম্বর আমি হঠাৎ খবরটা শুনে চমকে উঠলাম। দেবকীকুমার বসু আর আমাদের মধ্যে নেই। খবরটা শুনে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। অনেক কথাই মনে পড়ল সেদিন। দেবকী বসুর মাত্র দু'খানা ছবিতে আমি অভিনয় করেছিলাম। 'চিরকুমার সভা' আর 'নবজন্ম'। মাত্র দু'খানা ছবিতে কাজ করলেও দেবকী বসুর ব্যবহার যে কী ছিল আমার প্রতি, তা একমাত্র আমিই জানতাম।

'দেবকীদার মৃত্যুতে মনটা ভেঙ্গে গেল।

দেবকীদাকে হারাবার ব্যথা বুকে নিয়েই কাজ করে যেতে লাগলাম।

'আলো আমার আলো', 'অন্ধ অতীত,' 'বিরাজ বৌ', 'স্ত্রী' আর 'বনপলাশীর পদাবলী' ইত্যাদি অনেকগুলো ছবিতে কাজ করতে করতে আমি যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছি। সেই সঙ্গে বনপলাশীর স্মৃতির নেশায় আমি যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম। যখন আমার সারা মন জুড়ে শুধু কাজ, ঠিক সেই সময় আর একটা অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর খবর এল কানে।

১৩৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের ১লা তারিখে ডাঃ দেবনাথ রায় মারা গেলেন। প্রযোজক দেবনাথ রায়ের সঙ্গে আমার বেশীদিনের সম্পর্ক না হলেও অল্প ক'টা দিনের মধ্যেই ভদ্রলোক তাঁর মিষ্টি ব্যবহারে আমার অনেকটা কাছে কাছেই ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মৃত্যুর খবরে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

এমনি করে একটার পর একটা প্রিয়জন হারাবার মধ্য দিয়ে, তপ্ত রাজনৈতিক আবহাওয়ার ভিতর দিয়ে, অনেকগুলো শুভ কাজ দিয়ে কেটে গেল ১৩৭১ সাল।

এরপর ১৩৭২ সাল।

ব্ল্যাক আউট আগেই উঠে গিয়েছিল। আমি কাজের আনন্দে মেতে গিয়ে শুধু কাজই করছি।

অনেক নতুন নতুন ছবির সঙ্গে 'মেমসাহেব' ছবির কাজ নতুন করে শুরু করলাম। মনে পড়ে, বেশ কিছুদিন আগে নিমাই ভট্টাচার্যের এই উপন্যাসের

চিত্ররূপ দিতে প্রযোজিকা অসীমা ভট্টাচার্য ছবির মহরৎ করেছিলেন টেকনিসিয়ান ষ্টুডিওতে। আমি নায়ক হিসেবে সেদিন উপস্থিত ছিলাম। কি জানি কেন তারপর প্রায় অনেকগুলো দিন ছবির কাজ বন্ধ রেখেছিলেন অসীমাদি। এত দিন পর আবার সেই ছবির কাজ শুরু হলো।

এইবার আমাদের যেতে হলো দিল্লীতে। গোটা দিল্লীতে এবং দিল্লীর আশে পাশে চুটিয়ে শুটিং করলাম। পার্লামেন্টের ভিতরে, নর্থ ব্লক, পালাম বিমান বন্দরে, আই-ই-এন-এস বিল্ডিং-এ, নিউজ এজেন্সীর অফিসে, এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনে, প্রেস ইনফরমেশান ব্যুরোতে, স্টেট অব ইণ্ডিয়ায়, কুতুবমিনারে, চাণক্যপুরী, তিনমূর্তি, জনপথ-ওয়েষ্টার্ন কোর্টে, সেণ্ট্রাল ভিস্তায় শুটিং করেছিলাম। এসব জায়গায়, বিশেষ করে পার্লামেন্টের ভিতরে অর্থাৎ গভর্নমেন্ট বিল্ডিং-এ শুটিং হচ্ছে দেখে, আমি নিজেও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। কী করে সম্ভব হলো!

পরক্ষণে আমার সব বিস্ময়ের অবসান। নিমাই ভট্টাচার্য সাহিত্যিক হিসেবে সকলের মন যেমন জয় করেছেন, তেমনি দিল্লীর মন্ত্রী-মহলেও যে সবার অতিপ্রিয় ও ঘনিষ্ঠ সে কথা আমার প্রায় জানাই ছিল না। ভদ্রলোক সব অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। গোটা পার্লামেন্টের ভিতরে এই 'মেমসাহেব'-কে নিয়ে ভদ্রলোক একটা ঝড় তুলেছিলেন। তারপর নিমাইবাবুর কাছ থেকে বিস্তারিত শুনেছিলাম। গভর্নমেন্ট বিল্ডিং-এ আজ পর্যন্ত কোন ছবির শুটিং করা দূরের কথা, সি. বি. আই. থেকে একটা ডকুমেন্টারী ছবি তোলার অনুমতি চেয়েও ব্যর্থ হয়েছিল। সেই গভর্নমেন্ট বিল্ডিং-এ 'মেমসাহেবের' শুটিং হলো নির্বিঘ্নে ঐ নিমাইবাবুর আন্তরিক চেষ্টায়।

এটা নিঃসন্দেহে একটা রেকর্ড।

নিমাইবাবু মানুষটি ভারী মিষ্টি। সদা হাস্যময়। যা হোক, বেশ কিছুদিন দিল্লীতে কাজ করে আবার ফিরে এলাম।

১৯৭২ সালের ১৪ই জানুয়ারী অনুভা গুপ্তা মারা গেলেন।

একজন সতীর্থকে হারাবার ব্যথায় আমি ঠিক সেই মুহূর্তে যে কতখানি ভেঙ্গে পড়েছিলাম তা আজ সঠিকভাবে বলতে পারব না! কত ছবিতে এক সঙ্গে কাজ করেছিলাম। অনুভা দেবী মাঝে মাঝে কাজ না থাকলে আমার ছবির ফ্লোরে আসতেন। গল্প করতেন, হৈ হৈ করে চলে যেতেন। এই অনুভাদিই আমার হিন্দি আর উর্দু শেখার যে মাষ্টার ঠিক করে দিয়েছিলেন, সেই মাষ্টারজীর কথা আগেই বলেছি। সেই অনুভা দেবীর মৃত্যু ১৯৭২কে কলঙ্কিত করে দিয়ে গেল।

রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। আবার দেশের পরিচালন ক্ষমতায় ফিরে এলেন কংগ্রেস সরকার। ১৯৭২ সালের এপ্রিল অথবা মে মাসে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রযোজনা বিভাগ নবনির্মিত মন্ত্রীসভাকে অভিনন্দন জানালেন একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

সেদিন মন্ত্রীসভার সব সদস্যরাই উপস্থিত ছিলেন। সভানেত্রী ছিলেন কানন দেবী। চলচ্চিত্র শিল্পের নানা সংকটের ওপর সংক্ষিপ্তভাবে বক্তৃতার মাধ্যমে আমি স্বয়ং একটা আলোকপাত করেছিলাম।

এরপর আবার আমার সেই ব্যস্ততা। ছবির পর ছবি করে চলেছি। বনপলাশীও একটু একটু করে শেষ হয়ে এসেছে। ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চলচ্চিত্র জগৎ যেন আশার আলো দেখতে পেল।

সরকারী মহল বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সংকট মোচনের জন্য সচেষ্ট হলেন।

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য ২৫ লাখ টাকা এবং একটা উন্নয়ন পরিষদ দেবেন। এই ঘোষণার কিছুদিন আগে আমন্ত্রণ পেয়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এ আমি, সুবোধ মিত্র, অসিত চৌধুরী, পারিজাত বসু গিয়েছিলাম সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের চেম্বারে। সেদিন অনেক আলোচনার পর আমি বলেছিলাম, আপনি film কে এই গ্রান্ট দিচ্ছেন এটা খুবই ভাল, কিন্তু এর চেয়েও ভাল হতো যদি গ্রান্ট-এর বদলে সেস্ ডিক্লেয়ার করতেন—যাই হোক সেদিন অনেক আশা নিয়ে ফিরে এসেছিলাম।

তারপর আবার ডুবে গিয়েছিলাম অফুরন্ত কাজের মধ্যে। এর মধ্যে একটু-একটু লোড শেডিং চলছিল।

১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে লোড শেডিং-এর মাত্রা চরমে পৌঁছুতে লাগল।

প্রায় প্রত্যেকদিন একটা তীব্র জ্বালায় গোটা চলচ্চিত্র শিল্প যেন ছটফট করতে লাগল। একটা ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা নিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত কাটে। কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার মুখে। এত সংকটের মধ্যেও আমি কাজ করে যেতে লাগলাম।

১৯৭২ সালে আমার জীবনে একটা খুশীর দিন এল।

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিষ্ট এ্যাসোসিয়েশন আমাকে 'স্ত্রী' ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে নির্বাচিত করলেন।

আমি শ্রদ্ধার সংগে পুরস্কার গ্রহণ করলাম। রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সেদিন সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অশোককুমার সরকার এবং প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন তুষারকান্তি ঘোষ।

এলো ১৯৭৩ সাল।

আমার অগণিত কাজের মধ্যে পারিপার্শ্বিক নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার চাপে একটা মানসিক অশান্তি থাকলেও নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনার কোন অভাবই ছিল না। একটা কথা বললে হয়তো বেশী বলা হবে না যে আমি কোন ব্যাপারেই হারবো না এমন একটা জেদ আমার বরাবরই ছিল। 'ছোটী সি মুলাকাৎ' ছবির পর সেই জেদ যেন আরও বেশী মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তাই ভিতরে ভিতরে একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম।

বম্বের প্রখ্যাত প্রযোজক-পরিচালক শক্তি সামন্ত যেন আমাকে সেই সুযোগ এনে দিলেন।

শক্তি সামন্ত অনেকদিন আগেই আমাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি একটা বড় ধরনের বাংলা ছবি করতে চান।

আমি কথাটা শুনে খুশী হয়েছিলাম। যে কথা সেই কাজ। কাহিনী নির্বাচন করে শ্রীসামন্ত তাঁর প্রথম বাংলা ছবি এবং সেই কাহিনীর হিন্দী চিত্ররূপে আমাকে নায়ক হিসেবে শুধু আহ্বান জানালেন না, অত্যন্ত দ্রুতলয়ে ছবির কাজও শুরু করে দিলেন। কাহিনীর নাম ছিল 'নয়া বসত'। শক্তিপদ রাজগুরুর একটা জনপ্রিয় উপন্যাস। যথাসময়ে চিত্রনাট্যের কাজ শেষ হলো। কাহিনীর নাম পাল্টে রাখা হল 'অমানুষ'। আমি বাংলা এবং হিন্দী উভয় ভাষার চিত্ররূপের নায়ক হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হলাম।

১৯৭৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে আমি সদলবলে গেলাম সুন্দরবন অঞ্চলে।

শক্তি সামন্ত তাঁর নির্বাচিত জায়গায় ছবির বেশীর ভাগটুকু শেষ করবেন বলে গোটা একটা গ্রামই তৈরি করে ফেলেছিলেন। ওখানে যাবার আগে জানতে পারলাম যে প্রসাদ পত্রিকা আমাকে 'স্ত্রী' ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে মনোনীত করেছেন।

এরপর ১৯৭৩ সালের ১৯শে মার্চ আর একটি মৃত্যু সংবাদ পেলাম। তাজা চকচকে মানুষটা চোখের সামনে থেকে অনেক দূরে সরে গেল। অনেক সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতি নিয়ে হারিয়ে গেলেন প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলী। আমি হেমেনবাবুর বন্ধুর মত ব্যবহারে অভিভূত হয়েছিলাম। তাঁর মৃত্যু সংবাদ আমাকে ভীষণ আঘাত করল।

১৯৭৭ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী বসুশ্রী সিনেমায় প্রসাদ পত্রিকার আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমি কথা দিয়েও উপস্থিত থাকতে পারিনি। সুন্দরবনে পর পর ক'দিন কাজ করবার পর এবং কমপ্যাক্ট প্রোগ্রাম থাকার জন্ম আমার পক্ষে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি। অনেক পথ, অনেক ঘাট-মাঠ পেরিয়ে কলকাতায় এসে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আবার সুন্দরবনে ফিরে গিয়ে 'অমানুষ' হওয়া কোনমতেই সম্ভব ছিল না। তাই অনুষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যে ভদ্রলোককে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম নিতান্ত অনিচ্ছাকৃত ভাবে।

এছাড়া আরও একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আমার সারা দেহ মন যেন ভেঙ্গে গিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বলি, সুন্দরবনে সেবার আমার পাশে বেণুও ছিল। আগেই বলেছি সুপ্রিয়ার ডাক নাম বেণু। সকলেই তাকে এই নামে ডাকে। আমিও ডাকি বেণু বলে।

বেণু আমার মানসিকতা বোঝে। বেণু আমার প্রতিটি মুহূর্তের অভিব্যক্তিকে জানে। আমি সুস্থ থাকলে বেণু যেন তৃপ্তিতে ভরে থাকে, আমি অসুস্থ হলে বেণুও যেন অসুস্থ হয়ে পড়ে।

বন্ধুর চেয়ে বেণু অনেক বড়। নিজের হাতে রান্না করে না খাওয়ালে যেন তার তৃপ্তি নেই। সেই বেণুই ১০ তারিখের সকালে আমাকে সেই মর্মান্তিক খবরটা দিল।

পাহাড়ীদা আর নেই। পাহাড়ী সান্যাল অপ্রত্যাশিতভাবে চলে গেছেন ৯ই ফেব্রুয়ারী মধ্য রাতে পরিচিত জগতকে পিছনে ফেলে রেখে।

আমি যখন এখানে অর্থাৎ সুন্দরবনে আসি, তখনও পাহাড়ীদা বহাল তবিয়তে বিশ্বরূপা থিয়েটারে অভিনয় করছিলেন। তিনি যে হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে যাবেন তা কি তখন জানতাম! পাহাড়ীদা ছিলেন রসিক বন্ধু, আবার অনেক সময় আমার অভিভাবকও। অগণিত ছবিতে আমরা একসংগে কাজ করেছি। পাহাড়ীদা আমাকে তুই-তুকারী করতেন। কত আপন হলে একজন আর একজনকে এই ধরনের সম্বোধন করতে পারে। বেণুর কাছ থেকে সেই পাহাড়ীদার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি সেই মুহূর্তে মূক হয়ে গিয়েছিলাম। 'প্রসাদ' পত্রিকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকার এও আর এক কারণ।

সময়ই মানুষকে সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। আনন্দ আর বেদনা পরস্পর একই সূত্রে গাঁথা। ভাবলে অবাক লাগে জীবনে এই পরস্পর বিরোধী অনুভূতিই

মানুষকে তার কর্মক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। তাই প্রিয়জন হারাবার বেদনা অচিরেই প্রশমিত হয়। দুঃখকে ভুলতে বেশী সময় লাগে না।

'বনপলাশীর পদাবলী' ছবিটি কর মুক্ত হলো। তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীর আন্তরিক চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছবিকে কর মুক্ত করলেন। ৯ই ফেব্রুয়ারী '৭৩ বনপলাশী মুক্তিলাভ করেছিল। মুক্তির দিন আমি শত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ম্যাটিনী এবং ইভনিং শো'তে ভারতী সিনেমায় দাঁড়িয়ে ছবি দেখছিলাম একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে। ছবিটি দর্শকদের কেমন লাগছে, কি ত্রুটি আছে দেখার জন্য আমাকে থাকতে হয়েছিল। সম্ভবতঃ সেইদিন রাত্রেই আবার আমি চলে যাই সুন্দরবনে।

আমি সুন্দরবনে বসে ছবির আশাতীত সাফল্যের কথা শুনেছিলাম। ছবি দেখে গত ১৬ ফেব্রুয়ারী '৭৩ তারিখে আনন্দবাজার মন্তব্য করেছিল—

"পরিচালক হিসেবে উত্তমকুমার এমনিতে নানা ব্যাপারে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন দৃশ্যরচনায়, নাট্যমুহূর্তের গঠনে, ডিটেলের কাজে ইত্যাদি। একাধিক ফ্লাশ ব্যাকের প্রয়োগেও নিপুণ।......পরিচালক স্বয়ং সুদক্ষ অভিনেতা, এ ছবির অভিনয়াংশ যে আকর্ষক হবে সে বিষয়ে দর্শকদের মনে সংশয় থাকার কথা নয়।......

......ছবির আবহসঙ্গীতে (উত্তমকুমারকৃত) সঙ্গতভাবেই গ্রাম্যসুরের ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করি।......এই ছবি নির্মাণে উত্তমকুমার এক সঙ্গে বহুবিধ দায়িত্ব পালন করেছেন। তৎসহ ছিল শিল্পীসংসদের সভাপতি হিসেবে তাঁর দায়িত্ব। দর্শকদের দাবী মেটানোও তাঁর এক প্রধান দায়িত্ব সে কথা তিনি নিজের বিচার মত মনে রেখেছেন।"

হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড তার সমালোচনাস্তম্ভে বলেছিল—

>......"Music (Five maestros and twelve songs) plays a major part in adding to the film's popular appeal. In Uttam Kumar we have found a director who shows his brilliance on diverse levels. That is the main again in Bon Palashir Padabali, whose 20,000 and odd feet are studded with sparklis of present achievement and future promise—

১৬ই ফেব্রুয়ারী' ৭৩

দেশ পত্রিকা ১৭ই ফেব্রুয়ারী' ৭৩ সংখ্যায় বলেছিল—

"শিল্পী সংসদের সভাপতি হিসেবে উত্তমকুমার সংস্থার প্রথম ছবি 'বনপলাশীর পদাবলী' পরিচালনা করেছেন। ফলে পরিচালকের

কাজও কিছুটা কঠিন হয়েছে। সব শিল্পীরাই সৎ উদ্দেশ্যে বিনা পারিশ্রমিকে ছবিতে অভিনয় করেছেন। ওদের অভিনীত অংশ-বিশেষ কিছুই পরিচালক উত্তমকুমার বাদ দিতে পারেননি। বাদ সেধেছে সভাপতির নৈতিক দায়িত্ব ও মমতা। তাই ছবিটি হয়েছে অতি দীর্ঘ, প্রায় দুটি ফিল্মের সমান। চিত্রনাট্যে উত্তমকুমার নিজের ভূমিকাকে প্রয়োজনের বেশী প্রাধান্য দেননি। সব শিল্পীকেই তিনি যথাসম্ভব জায়গা দিয়েছেন। এই উদারতা অবশ্য ছবির উপভোগ্যতার ক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষতির কারণ হয়েছে—"

এ সব মন্তব্যে আমি যতটা আনন্দে খুশীতে ভরে উঠেছিলাম তার চাইতে দ্বিগুণ গর্বিত হয়েছিলাম আমার দেশের দর্শকমণ্ডলী এই ছবির প্রতি যে ভালবাসা দেখিয়েছিলেন তার জন্য। তাঁদের অকৃপণ ভালবাসায় শিল্পী সংসদের একটা সৎ প্রচেষ্টা সার্থক রূপ পেয়েছে দেখে আমার গর্বের সীমা ছিল না।

এরপরও আমরা থামিনি। শিল্পী সংসদের অভিযান থামেনি। শিল্পী সংসদ ১৯৭৩ সালের একটি বিশেষ দিনে গুণীজন সম্বর্ধনার আয়োজন করলেন। আমি সানন্দে আমার মতামত পেশ করলাম। সংসদ প্রকৃত গুণী সর্বজনপ্রিয়া শিল্পী শ্রীমতী সুচিত্রা সেনকে সম্বর্ধনা জানালেন। আমি সেদিন যে কতটা খুশী হয়েছিলাম সে ব্যাখ্যা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

এরপর অগণিত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের অন্যান্য কাজও থেমে থাকল না।

ডাক এলো আবার রাইটার্স বিল্ডিং থেকে। চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠক বসল মহাকরণে। আমি সেই আলোচনায় যোগ দিলাম। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক চেষ্টায় চলচ্চিত্র সর্বদিক থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে এমন একটা ছবি আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বসুশ্রী চিত্রগৃহে শিল্পী সংসদের ত্রাণ তহবিলে অর্থ সংগ্রহের তাগিদে 'রৌদ্রছায়া' ছবির কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। অনুষ্ঠানে সেদিন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী এবং সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সংগে আমাকেও উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। সংসদ-সভাপতি হিসেবে আমি আমার অন্তরের সবটুকু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলাম। ছবির কর্তৃপক্ষ সেদিন পাঁচ হাজার টাকা দান করলেন আমাদের ত্রাণ তহবিলে। বলা দরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেদিন এই ছবিকে কর মুক্ত করে যে উদার মনের পরিচয় দিয়েছিলেন আর একবার, তার বুঝি তুলনা নেই।

'বনপলাশীর পদাবলী'কে কোন মতেই আমি ছোট ছবি করতে পারিনি শিল্পীদের মুখ চেয়ে। প্রত্যেক শিল্পী শুধু বিনা পারিশ্রমিকেই নয় এই ছবির জন্য প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করেছিলেন। আমি মাঝে মাঝে ওঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, ওঁদের এই সংসদের প্রতি যে প্রগাঢ় ভালবাসা, যে নিষ্ঠা, যে পরিশ্রম আমি দেখতাম তাতে সত্যিই গর্বে আমার বুক ফুলে উঠত। 'বনপলাশীর পদাবলী' ছবির যতটুকু সাফল্য তা অবশ্যই এঁদের সকলের জন্য। এই ছবির অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল শুধু নয় অঙ্কুর থেকে পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়েছিল আমাদের এই ময়রা স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে। প্রায় প্রতিদিন এখানে আমরা ছবির ভাবনা ভেবেছি। আমার অগ্রজপ্রতিম, যদিও মেলামেশার দিক থেকে আমরা ছিলাম বন্ধুর মত সেই প্রবীণ চিত্রপরিচালক অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী, সুখদা, অর্থাৎ সুনীল রায়চৌধুরী, বিকাশদা ছিলেন আমার বিশেষ নির্ভরস্থল। আমরা এই ছবির সময়ে বেণুর অর্থাৎ সুপ্রিয়ার যে নিদারুণ সহযোগিতা পেয়েছিলাম তা শিল্পী সংসদ ভুলবে না কোনদিন। এই বাড়িতে যখন ছবির নানা কাজ হয়, বেণু মনে করে যেন তার বাড়ির বড় কাজ। কে কখন কি খাবেন, কি করবেন তার তদারকি করে ও বড় আনন্দ পেত। আমি ওর চোখের ভাষায় তা বুঝতাম। শেষ পর্যন্ত নিতান্ত বাধ্য হয়ে প্রতিদিন ছুটি করে শো-এর ব্যবস্থা করতে হয়েছিল আমাদের। একটি সাংবাদিক সম্মেলনে আমাকে আমার পরিচালক-ভূমিকা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রশ্নটি কে করেছিলেন তা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তবে আমার মন্তব্য আনন্দবাজারের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই প্রকাশিত মন্তব্য এখানে হুবহু তুলে ধরছি—

> "একজন পরিচালকের কখনই এমন সব অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে নিয়ে কাজ করা উচিত নয়, অভিনয় সম্বন্ধে যাঁদের নিজেদের গোঁড়া একটা ধারণা রয়েছে। আমার বেলাতেও এটা খাটে। 'বনপলাশী' পরিচালনা করতে গিয়ে এ ব্যাপারটা আমি ভালভাবে বুঝেছি। পরিচালক হিসেবে আমি যা চেয়েছি, অভিনেতা হিসেবে তা না করে অন্যটা করেছি। সিনেমার অভিনয় সম্পর্কে ভেতরে একটা বদ্ধমূল ধারণা গেঁড়ে বসার জন্যেই এটা হয়েছে। আমার চরিত্রে যদি অন্য কেউ অভিনয় করতেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছবির পরিচালক হিসেবে আমি অধিক সফল হতাম।"

সেই 'বনপলাশী'র সাফল্যে আমি নিজেকে সত্যিই ধন্য মনে করেছি।

শক্তি সামন্ত এই প্রথম বাংলা ছবি করতে এগিয়ে এসেছেন, তাঁর সংগে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা আমার নৈতিক কর্তব্য মনে করে শুধু কাজ

করে চললাম। শক্তিবাবু তাঁর আরও পরিকল্পনার কথা শোনালেন। তিনি জানালেন এই ছবি দুটি ভাষাতেই এক সংগে তোলা হবে। একটা শট বাংলা ভাষাতে তোলার পরক্ষণেই সেম্ শট হিন্দি ভাষাতে নেওয়া হবে শুনে আমার ভালই লেগেছিল। সদা হাস্যময় নিরহঙ্কার এই মানুষটি চিরদিনই একটু বেশী মাত্রায় দুর্দান্ত। ছবি করতে নেমে কোন কিছুর সংগে তিনি যেমন আপোষ করতে জানেন না তেমনি তাঁর কাছে অসম্ভব বলে কোন কথা নেই। শক্তিবাবুর এই দুর্দান্ত মনের পরিচয় পেয়ে আমি নিজেও একটু বেশী মাত্রায় উৎসাহিত হয়ে পড়লাম। চিত্রনাট্য শুনেই মনে হয়েছিল চুটিয়ে কাজ করা যাবে। এই ছবিতে শক্তিবাবু আমাকে ইউটিলাইজ করেছেন নির্ভাবনায়, অন্যদিকে দুটি ভাষাতে মুহুর্মুহু একটা মুড থেকে আর একটা মুডে ফিরে এসে কাজ করতে পারার আনন্দে আমি মেতে রইলাম।

আমরা বন্ধুর মত কাজ করে চলেছি। কোলকাতায় একাধিক ছবির কাজ প্রতিদিনই লেগে আছে, তবুও তারই মধ্যে বোম্বাই আর কোলকাতা যাতায়াত শুরু করে দিলাম। দিনের চব্বিশটি ঘন্টার প্রায় সবগুলো যেন আমি হাসতে হাসতে বিলি করে দিলাম।

সব ছবিরই কাজ চলছে। এমন সময় আর একটা ভূমিকায় আমাকে অবতীর্ণ হতে হলো। সে ভূমিকা হলো ভাষ্যকারের ভূমিকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-দুহিতা অপর্ণা রায়ের পঁচাত্তরতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর জীবনালেখ্য অবলম্বনে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করা হচ্ছিল। আমন্ত্রণ পেলাম ভাষ্যকার হবার। তথ্যচিত্রের নেপথ্য থেকে কণ্ঠদান করার দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করা হলো। আমি আমার দায়িত্ব শ্রদ্ধার সংগে পালন করলাম। তথ্যচিত্রটি যেদিন দেখানো হয় সেদিন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় এবং আরও বহু গণ্যমান্য অতিথিদের সঙ্গে আমিও উপস্থিত ছিলাম।

১৯৭৩ সালের শেষ দিকে আমি গেলাম বোম্বাইতে 'অমানুষ' ছবির শুটিং করতে। পঁচিশে নভেম্বর থেকে ছয় ডিসেম্বর পর্যন্ত নটরাজ ষ্টুডিওতে একটানা শুটিং করলাম। বম্বের এই ক'টা দিন আমার কাছে সত্যিই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নটরাজ ষ্টুডিওতে প্রায় প্রতিদিন আমাকে দেখতে আসতেন, আমার অভিনয় দেখতে আসতেন, আলাপ করতে আসতেন বিখ্যাত বিখ্যাত শিল্পী এবং প্রযোজকরা। তাঁরা আমার কাজ দেখে আদৌ খুশী হয়েছিলেন কিনা তা জানি না, তবে তাঁদের সংগে আলাপ করে আমরা অর্থাৎ আমার সংগে বেণুও ছিল, এত খুশী হয়েছিলাম যা বলার নয়।

ডিসেম্বর মাসেই কোলকাতায় ফিরে এসে আবার কাজ শুরু করে দিলাম। অজাত ছবির পাশে পাশে আবার 'অমানুষে'র কাজ শুরু করলাম। এই সময়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট আমাকে শুধু নয় গোটা ষ্টুডিওর জীবনযাত্রাকে, দারুণ মানুষের জীবনযাত্রাকে যেন বার বার থামিয়ে দিতে লাগল। তবুও একদিনের জন্য কাজ থামাতে পারিনি। চলে গেলাম সুন্দরবনে। শুধু আমি নয়। শক্তিবাবু বাঙালী কলাকুশলীদের সুযোগ দিয়েছিলেন কাজ করার। আর আমার সংগে অনেক বাঙালী শিল্পীও বোম্বের শিল্পীদের সংগে মিলিতভাবে অভিনয় করেছিলেন। সবাই এক সংগে কাজ করছিলাম। একাত্মভাবে। গোটা ফেব্রুয়ারী মাসটা আমাকে সুন্দরবনেই কাটাতে হলো।

এর মধ্যে পেলাম এক একজন করে অনেকগুলি মূল্যবান মানুষকে হারাবার যন্ত্রণা। যাঁদের হারালাম তাঁরা এক একজন কৃতিমানুষ। হারালাম বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন বসুকে, হারালাম ওস্তাদ আমীর খাঁকে। হারালাম পৃথ্বীরাজ কাপুর, সৈয়দ মুজতবা আলী, ও, সি, গাঙ্গুলী, পণ্ডিত রতনঝঙ্কার, সুসাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু ও পাহাড়ীদাকে, যে কথা আগেই বলেছি।

এঁদের অনেকের সংগেই হয়তো সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, তবুও এঁরা কীর্তিমান বলেই বোধকরি আমার অনেক কাছের জন ছিলেন তাঁরা। তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে গোটা বছরটাতেই যেন এঁদের হারিয়ে আমাকে কাঁদতে হয়েছিল ভিতরে ভিতরে।

এমনি করেই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে আমি শেষ করলাম 'অমানুষ' ছবির কাজ। বাংলা ভাষায় তোলা ছবি মুক্তি পেল ১৯৭৫ সালের আঠারোই অক্টোবর। বাংলার লক্ষ লক্ষ দর্শক এবং প্রতিটি পত্রপত্রিকা 'অমানুষে'র প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। আমারও কম আনন্দ হয়নি ছবির এই সাফল্যে।

অপ্রত্যাশিতভাবে আর একটি মৃত্যু যেন আমার সব আনন্দ মুহূর্তে কেড়ে নিল। জানতে পারলাম নটসূর্য অস্তাচলে। অহীনদাকে হারিয়ে বুঝলাম, নাট্যদরদী মানুষদের কাছেই শুধু নয়, শিক্ষা জগতের প্রত্যেকের কাছেই কতখানি আপন ছিলেন তিনি। ব্যথা বুকে নিয়ে কাজ করছি। ছবির কাজ ছাড়া শিল্পী সংসদকে নিয়ে আমাদের সব ভাবনা ঠিক আগের মতই থেকে গেছে। দুঃস্থ শিল্পীদের, নিরাশ্রয় শিল্পীদের জন্য একটা আশ্রয় গড়ে তুলতে চাই আমরা আর সেই কারণে আমাদের এই ছবি তৈরি করা। 'বনপলাশী'র পর আমরা নতুন করে পরবর্তী অভিযানের কথা একদিকে যেমন ভাবছি, তেমনি দুঃস্থ মানুষকে সাহায্যের ব্যাপারে সংসদ মাঝে মাঝেই সাড়া দিয়ে চলেছে অক্তদের

ডাকে। এই তো সেদিন ৪ঠা অক্টোবর '৭৭ মালদহে বন্যাত্রাণ সমিতির উদ্যোগে (ডি. এম এ) ময়দানে শিল্পী সংসদের যৌথভাবে বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে একটি বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে আমি শুধু উপস্থিতই ছিলাম না, আমাকে একটা ভূমিকাও নিতে হয়েছিল। অনুষ্ঠানে সেদিন সানন্দে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, অরুণ মৈত্র, এ বি. এ. গনি খান চৌধুরী। বেণুও গিয়েছিল আমার সংগে। আরও ছিলেন তরুণকুমার, দেবদুলাল ব্যানার্জী, জহর রায় আরও অনেকে।

'অমানুষ' আমাকে যেন সব ব্যথা ভুলিয়ে দিল। পত্রপত্রিকার মন্তব্য আমাকে ধন্য করল। গত ৮ই নভেম্বর '৭৪ 'অমানুষ' প্রসঙ্গে আনন্দবাজার তাঁর সমালোচনা কলমে মন্তব্য প্রকাশ করল।

"মুখ্যভূমিকায় উত্তমকুমার আগাগোড়া রীতিমত দাপটের সংগে অভিনয় করেছেন। মারপিটের দৃশ্যগুলিতে তিনি বেশ সাবলীল। খল নায়কের সংগে সংঘর্ষের দৃশ্যে তাঁর কাজ অনেককেই অবাক করবে। আর শেষ দৃশ্যে তাঁর আবেগরুদ্ধ অভিনয়? এ অভিনয় (চাপা কান্নায় হঠাৎ এক লহমায় প্রকাশ করে দেওয়া) একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব"—

যুগান্তর পত্রিকা তার ১লা নভেম্বর '৭৪ তারিখে বলেছে—

"অভিনয়ের ব্যাপারে প্রথমেই যাঁর কথা মনে পড়ে তিনি উত্তমকুমার। বিভিন্ন এ্যাকশানের দৃশ্যে তিনি দর্শকদের মাতিয়ে দিয়েছেন। আবেগময় মুহূর্ত নির্মাণে কিংবা মনের বিশেষ একটি ভাব বা মুড থেকে নিমেষে অন্য একটি মুডে চলে যাওয়া এবং তার প্রকাশে তিনি যে অদ্বিতীয় তা আর একবার প্রমাণ করে দিয়েছেন"—

'অমানুষ' ছবিতে হিন্দিতেও পাশাপাশি অভিনয় করেছি। হিন্দি অমানুষ ছবিটি যথা সময়ে মুক্তি পেল। এ ছবিতে আমি কেমন অভিনয় করেছি দর্শকরাই সে কথা বারবার বলেছেন। তবে শক্তি সামন্ত যে কত বড় প্রয়োগ-শিল্পী তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি তাঁর সংগে কাজ করে, তাঁর সংগে চলতে চলতে।

১৯৭৪ সালে আবার আমার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ হলেন। আবার একের পর এক সম্মানে সবাই আমাকে ভূষিত করলেন। 'অমানুষ' ছবিতে

শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্ত বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিষ্ট এ্যাসোসিয়েশান আমাকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মানে ভূষিত করলেন। এই সালে এই একই কারণে চলচ্চিত্র প্রসার সমিতিও আমাকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দেন। আমার মন অবশ্যই কৃতজ্ঞতায় ভরে আছে। ১৯৭৪ সালে পার্থপ্রতীম চৌধুরীর 'যদুবংশ' মুক্তি পেয়েছিল। পার্থ এই ছবিতে আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে যে কতখানি যত্নবান হয়েছিল তা আমি উপলব্ধি করেছিলাম। ভাল কাজ করিয়ে নেবারও একটা দক্ষতা দরকার, পার্থর মধ্যে সেই দক্ষতা বেশীই ছিল।

১৯৭৫ সালে তৈরি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিপন্থী চলচ্চিত্র সমালোচক সংস্থা। এই সংস্থার পক্ষ থেকে 'যদুবংশ' ছবির জন্ত আমাকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে সম্মানিত করেছিল। এই পুরস্কারগুলো বার বার একটা উপকার করেছে আমার, তা হলো ভাল কাজ করতে যাওয়ার প্রেরণা জুগিয়ে গেছে মনে। আমার আত্মবিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছে।

আমি আগামী দিনে এর চেয়ে আরও অনেক বেশী কিছু দিতে পারব বলে আমার বিশ্বাস। আমার ভিতরে এই বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে সেদিন থেকে যেদিন থেকে আমি আমার উপযুক্ত চরিত্র নির্বাচনে নির্ভূত হতে পেরেছি। আমার ছবিবার আকর্ষণ চরিত্রাভিনেতা হিসেবে রোমান্টিক নায়ক চরিত্রের পরিবর্তে জটিল ভাবনাশ্রয়ী চরিত্রের প্রতি। পূর্ণতা সেইদিনই আসবে আমার, যেদিন অভিনয় জগৎ থেকে ছুটি নিয়ে শুধু প্রয়োগ প্রধানের পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন করে যেতে পারব; আর সেদিনের জন্ত আমি প্রতীক্ষা করছি। জানিনা অনাগত দিন শুভাশুভ কি সংবাদ বহন করে আনবে। তবে বিশ্বাস করি, যাঁদের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা আমি পেয়েছি—তাকেই পাথেয় করে এগিয়ে চলব নূতন আলোক স্পর্শে ধন্ত হবার জন্ত।

১৯৭৫ সালে পর পর কয়েকটি মৃত্যু—মহামূল্যবান জীবনের অবসান আমার মনটাকে ভীষণ আঘাত করতে থাকল। ১৫ই অক্টোবর ১৯৭৫ প্রখ্যাত শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী রাত একটা তিরিশ মিনিটে মারা গেলেন। সেই ব্যথা সামলে উঠতে না উঠতে ২৫শে অক্টোবর '৭৫ রাত দশটা চল্লিশ মিনিটে চলে গেলেন কবিশেখর কালিদাস রায়। আমি তাঁর গুণমুগ্ধ। সেই আঘাত তখনও সামলে উঠতে পারিনি, ২৭শে অক্টোবর '৭৫ প্রখ্যাত কার্টুনিষ্ট কাফি খাঁ অর্থাৎ প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী রাত ৯টা পনের মিনিটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। ৩১শে অক্টোবর '৭৫ সংগীত জগতের একটি উজ্জল এবং তাজা তারা খসে গেল, তিনি শচীন দেব বর্মন। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ আমাকে চরম আঘাত করল।

তবুও এখন আমি শুধু চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছি আর যন্ত্রচালিতের মত অভিনয় করছি। অভিনয় করছি, আরও নতুন কিছু শিখতে চাইছি। আরও অনেক শেখার বাকি। শিল্পের যেমন শেষ নেই—শিল্পীর তেমনি শিক্ষার শেষ নেই। আমি তাই নতুন করে অনুশীলন করে চলেছি। দেশের সমাজের শিল্পের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার মনের রং বদলাচ্ছি। তাই এখন আবার আমার সেই তৈরি হবার নেশা। আবার নতুন সৃষ্টির নেশায় মেতে গেলাম।

'বনপলাশীর পদাবলী' ছবিটির মাধ্যমে পরিচালক হিসাবে আমার হঠাৎ থেমে যাওয়া সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাকে যেমন নতুন করে বাঁচাতে পেরেছি, তেমনি 'অমানুষ' আমার শিল্পীসত্তাকে আবার বেশী করে উদ্দীপ্ত করেছে।

ইতিমধ্যে বিবেকানন্দ রোড আর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের মুখে আই ডি কোং নামে খুব বড় একটা ওষুধের দোকান বিক্রি হবে সেই খবর নিয়ে এল লালু। লালু ডাক্তার বলে এ সব খবর তার কাছে আসতেই পারে। এই ডাক্তারখানা ছিল ডাক্তার ইন্দুমাধব বসুর। ডাক্তার নিরাসক্ত-সর্বত্যাগী পুরুষ হয়ে পড়েছিলেন। আমরা একদিন দূর থেকে ডাক্তারখানাটা দেখে এলাম। সেদিন আমার সঙ্গে বোধ হয় আমার সেক্রেটারী মিষ্টার মজুমদার আর লালুও ছিল। ইন্দুবাবু তখন খড়দহের আশ্রমে থাকেন। আমরা একদিন সেখানে গেলাম। সব কথা পাকা করলাম। এবং সেই ডাক্তারখানা কিনেও ফেলা হলো। গৌতম স্বাধীনভাবে যদি ব্যবসা চালাতে পারে তবে ভালই হবে—ভেবে মনস্থির করে ফেলেছিলাম আমি। নতুন করে সাজানো হলো। কোন ওষুধ এমন কি গ্যাস সিলিণ্ডার পর্যন্ত বাদ যায়নি। সব রাখা হলো। এই অঞ্চলে এত বড় ডাক্তারখানা বিরল। সুন্দর চলছিল। তবে মাঝে মধ্যে পারিপার্শ্বিক অশান্তি তো ছিলই। একদিন একটি মহিলা দোকানে ওষুধ কিনছিলেন হঠাৎ তাঁকে লক্ষ্য করেই হোক কিম্বা অন্য কোন কারণ থাক গৌতমের দোকানের মধ্যেই বোমা ছুঁড়েছিল কারা যেন। সেই সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। আমাকেও বিব্রত হতে হয়েছিল। সে এক চরম অশান্তি। আমার ভাবনা বাড়ল। দিন কালের পরিবর্তনে একমাত্র ছেলের জন্য গৌরীরও দুর্ভাবনা কম হলো না।

দোষে-গুণে মানুষ।

আমিও রক্ত-মাংসের মানুষ। আমার গুণের পরিমাপ আপনাদের জানা, দোষের খবর তো আমিই রাখি।

গঙ্গার যেমন উৎস আছে কোথাও না কোথাও, তেমনি আমার মনে যেদিন

থিয়েটার-গানের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল সেদিন সেই বীজ বপনের দায়িত্ব কে নিয়েছিলেন নীরবে, তার হিসেব কষে দেখেছি। দেখেছি সেখানেও উৎস আছে। আমার মা। আমার মা হলেন আমার এই শিল্পী জীবনের মূলে মুখ্য উৎস। ভাল গাইতেন তিনি। আমি তাই বোধ হয় গানকে ভালবেসেছিলাম সেই কিশোর বয়স থেকেই। মায়ের অনুপ্রেরণা আমাকে প্রতিষ্ঠার এই স্বর্ণ সোপানে পৌঁছে দিয়েছে।

এগিয়ে চলার পথে হোঁচট খাইনি, কোন কলঙ্কিত পদচিহ্ন রেখে আসিনি তা নয়। যা করেছি তার মধ্যে দোষের ভাগ কতটুকু তারই বিচারপ্রার্থী হিসাবে আপনাদের বিচারশালায় আসব আবার। জীবনের অনেক একান্ত আপনার না-বলা কাহিনীর যবনিকা উত্তোলন করব সেদিন, যেদিন আত্ম-প্রস্তুতির পরিসমাপ্তি ঘটবে।

॥ পরবর্তী সংযোজন ॥

ছ'বছর কয়েক মাস আগে যখন "আমার আমি'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তখন আমার অগ্রজ উত্তমকুমার উপরের কথাগুলি বলে বক্তব্য তখনকার মত শেষ করেছিলেন। এরপর আমি মাঝে মাঝেই দাদাকে সময়ে, অসময়ে বিরক্ত করতাম। ইদানিং আমি যখনই দাদার সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম উনি অনায়াসেই বুঝতে পারতেন আমার কিছু বলার আছে। আমার মুখে ভাষা ফোটার আগে দাদা দু'চোখের দুটো ভ্রু নাচিয়ে জিজ্ঞাসা বোধক একটা অভিব্যক্তি নিয়ে নিজেই তারিখ ঠিক করে দিয়ে বলতেন, অমুক দিন বেলা এগারটায় এসো; অথবা বলতেন অমুকদিন একটা ফোন করে নিও. আবার নিজেই বলতেন, তোমার তো ফোন করার অসুবিধে আছে, ঠিক আছে অমুকদিন সন্ধ্যে সাতটায় এস, আমি থাকব বাড়িতে।

বাড়ি বলতে আমরা ৩নং ময়রা স্ট্রিট বুঝতাম সকলেই। এই বাড়িতেই দাদার জীবনের সতেরটি বছরের ইতিহাস ছড়ানো আছে। ভালবাসার ইতিহাস, মনুষ্যত্বের ইতিহাস, বিবেকের ইতিহাস আর শিল্পী ও স্রষ্টা হিসেবে তাঁর চেতনা বোধের ইতিহাস। সুতরাং যাঁর যেভাবে এই মানুষটিকে প্রয়োজন তাঁরা সেই ভাবেই এই ময়রা স্ট্রিটের শান্ত-স্নিগ্ধ অথবা বিলাসবহুল পরিবেশে এসে দাদার সংগে দেখা করেন। কাজ করেন, কথা বলেন, আলোচনা করে যান, কখনো গান বাজনার আসর আবার কখনো পার্টিতে এই ফ্ল্যাট মুখর হয়।

এঁদের সকলের মধ্যে আমি একজন, তাঁর নির্দেশমতই যথা দিনে, যথা সময়ে হাজির হয়ে বেল টিপলে বংশী দরজা খোলে। দাদার সংগে দেখা হয়। তিনি

কথা বলেন। গল্প করেন। গত ফেব্রুয়ারী '৮০ থেকে জুলাই '৮০র প্রায় ২০ তারিখ পর্যন্ত মাঝে মাঝেই দাদা শুনিয়েছেন তাঁর নিজের কথা। এখানে সংযোজিত করা হ'ল।

কথা দিয়েছিলাম অনেক একান্ত আপনার না বলা কাহিনীর যবনিকা উত্তোলন করব। আমি জানি, শ্রীমান গৌরাঙ্গর অনুরোধে ও প্রচেষ্টায় 'আমার আমি'র প্রথম অংশ যখন লেখা হয়েছিল তখন সব কথার মধ্যে বেণুর কথা কিছুই বলা হয়নি। মাঝে মাঝে যেটুকু বলা হয়েছে তা মোটেই যথেষ্ট নয়। এ ব্যাপারে বেণু বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট ছিল না। এই প্রথম খণ্ডটি কোন মতেই বেণুর মন জয় করতে পারেনি। সুতরাং এবার তার কথা বলা যাক।

বেণু অর্থাৎ সুপ্রিয়াকে নিয়ে শুরু করা যাক! এ কথা পরিষ্কার করে বলে রাখা যাক, আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল, আমি অটোবায়োগ্রাফি লিখব এ বিষয়ে অনেকেই আমাকে উৎসাহিত করেন। বেণুর ইচ্ছে ছিল, যে বিখ্যাত কোন সাহিত্যিককে অনুরোধ করবে আমার জীবনী লেখার। সেই ইচ্ছেগুলো এখনো মরে যায়নি। তবে সেখানে ভাবনা অনেক।

আমরা যে ভাবে, যে দেশে, যে পরিবেশের মধ্যে আছি সেখানে থেকে জীবনের সব কথা শতকরা শতভাগই সত্যি করে বলা মুশকিল!

শ্রদ্ধেয় অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিনের জীবনী আমি পড়েছি। সেই মহামূল্যবান জীবনীগ্রন্থ পড়েই আমার ইচ্ছে হয়েছিল আমি অটোবায়োগ্রাফি লিখি, পরে সেই উৎসাহ স্তিমিত হয়েছিল চার্লির জীবন দেখা ও জীবন নিয়ে বলার দুঃসাহস দেখে। যদি জীবনের কথা তাঁর মত করে বলতে না পারি, যদি সত্যের অপলাপ করি তা হলে কী বলা হলো! সত্যি কথা বলতে কি বেঁচে থেকে জীবনের সব কথা, চরম সত্যকথা বলার সাহস আমাদের নেই। তা ছাড়া এখনও আমি চরম খ্যাতি নিয়ে আর সবার প্রিয় হয়ে কাজ করে চলেছি। আমি মনে করি এখনও আমার আত্মপ্রস্তুতির পরিসমাপ্তি ঘটেনি। তবুও চেষ্টা করব এই গ্রন্থের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে আমার জীবনের কথা বলতে।

আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায় রচিত হতে শুরু করেছিল এই সাল থেকে। ১৯৬৩ সাল থেকে।

ঠিক এই সাল থেকেই আমার জীবনের আর একটি অধ্যায় রচিত হতে শুরু হয়েছে বোধ হয় ঠিক নয়, প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৮ থেকে '৫৯-এর মধ্যেই আমার জীবনের, এক নতুন জীবনের সূত্রপাত। সেই নতুন জীবন! এই নতুন জীবন!

মানুষ তো দোষে গুণেই মানুষ।

আমার দোষগুলির বিচারক অবশ্যই আমি নই। কিন্তু আমার বিবেক আমাকে যে ভাবে চালিত করে আমি সেই ভাবেই চলি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আমার আমিকে নিয়ে। সেখানে অবশ্যই একটা যুদ্ধ করতে হয় মাঝে মাঝে। মানসিক যুদ্ধ। আমি অনেক সময় দেখেছি একান্ত প্রিয়জন বিয়োগে কেউ কেউ কাঁদতে পারে না, কথা কইতে পারে না, সহজ দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে পারে না, শুধু ভিতরে ভিতরে সেই বিয়োগ ব্যথা নিয়ে ছটফট করে, তার ভিতরে সব কথা সব ব্যথা জমাট বেঁধে থাকে। লোকে বলে, তুমি কাঁদ, একটু কেঁদে হালকা হও—

এটা যে মনের সংগে কত বড় যুদ্ধ তা ঠিক বোঝান যায় না। আমার ভিতরে তেমনি একটা যুদ্ধ চলছে। আমি তো কোন মতেই একলা নই অথচ একাকীত্বের কেন জানি না একটা যন্ত্রণা আমার মধ্যে। রক্তে মাংসে গড়া মানুষ বলেই আমার দায়িত্ব কর্তব্যগুলোকে তো অস্বীকার করতে পারি না। সর্বস্তরেই সেই কর্তব্য করে চলেছি অথচ আমার কেন যেন মনে হয় কাউকে তৃপ্তি দিতে পারছি না। নিজেও মানুষ হিসেবে, সাংসারিক আর পাঁচজন মানুষের মত মানুষ হিসেবে নিজেকে তৃপ্ত করতে পারছি না।

প্রথমতঃ গৌরীর কথা আমার মনে হয়। গৌরী মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে বড় বেশী ভাবে। আমাকেও ভীষণ ভাবিয়ে তোলে। আমি বুঝি গৌরী আমাদের চাটুজ্জ্যে বাড়ির বৌ, অভিজাত ঘরের মেয়ে, সম্পূর্ণ আলাদা জগতের মানুষ। সুতরাং তার মানসিক গঠনটাকে সে পাল্টাতে পারে না। বুদ্ধিমতী বিচক্ষণ হয়েও সে তার নিজস্ব একটা গণ্ডীর মধ্যে, নিজের জগতের মধ্যে থাকতে ভালবাসে। তার প্রতি কোন কর্তব্য করিনি এমন অনুযোগ তবুও ছিল। আমি যখন নিউ আলিপুরের বাড়িতে থাকতাম তখনও প্রায় রোজই গিরীশ মুখার্জী রোডের বাড়িতে এসেছি। মা এবং অন্তদের মধ্যে যতটা সময় দেওয়া

যায় ততটাই দিয়েছি। ও বাড়ির সব ব্যাপারে বড় ছেলে হয়ে আমি থেকেছি, অথচ মাঝে মাঝে একটা মানসিক অস্থিরতা আমাকে কাতর করে রেখেছে। এখনও প্রতি মুহূর্তে আমায় সেই অব্যক্ত অস্থিরতা নিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। এরই মধ্যে গৌতম যখন আমার কাছে এসে দাঁড়ায় আমি স্বস্তি পাই। অনেকটা হাল্কা হই। বাড়ির এবং বাইরের অনেক বিষয় নিয়ে যখন বুড়োর সংগে, মায়ের সংগে আলোচনা করি তখন অনেকটা হালকা হই। আমার মেজভাই পেণ্ট অর্থাৎ বরুণ বরাবরই একটু মৌন, ও চিরকালই একটু স্বতন্ত্র। ওর জন্যে আমার তেমন কোন ভাবনা নেই। ওর নিজের জগতে ও একরাশ খুশি নিয়ে থাকে। এটা দেখলে আমার ভাল লাগে। তবুও মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমার সব আছে কিন্তু কোথায় যেন অনেক কিছুই নেই আমার।

দ্বিতীয়তঃ বেণু।

প্রথম প্রথম বেণু আমার চোখের সামনে যেন বিশেষ একটি রঙ হয়ে দেখা দিত, যে রঙের দিকে আমার নজর পড়ত, যে রঙ আমার ভাল লাগত অবশ্যই। পরে সেই বিশেষ রঙের আবির আমি মেখেছিলাম।

বেণুর সংগে কাজ করেছিলাম 'বসু পরিবার' ছবিতে।

আমার বোনের চরিত্রে অভিনয় করেছিল সে। সেই সময় থেকে বেণুকে আমি চিনেছিলাম তা নয়। তার অনেক আগে তাকে চিনতাম। বেণুকে তখন বালিকা বলা যায়।

সেটা বোধকরি ১৩৩৯ সাল।

বার্মায় তখন জীবনযাত্রা ছবিষহ। সবাই পালাচ্ছে। সবাই সব কিছু ফেলে শুধু জীবনটাকে বাঁচাবার তাগিদে চলে আসছে বার্মা ছেড়ে। বার্মায় বোমা পড়ছে।

বেণুরা সেই সময় চলে আসে কলকাতায়। ওরা তখন অনেক ভাই বোন। বড়দির বিয়ে হয়েছিল এখানে আসার পর। প্রখ্যাত সাহিত্যিক বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী ছিলেন বেণুর বড়দি। যা হোক, বার্মা থেকে ওরা এসে উঠেছিল গিরীশমুখার্জী রোডে গিরীশ মুখার্জীর বাড়ির উল্টোদিকে চৌধুরী-দের জমিদার বাড়িতে। এই বাড়িতে এক সময় জাপানী কনস্যুলেট থাকত।

এই সময়ে ওদের আর্থিক অবস্থাটা ভাল ছিল না।

যুদ্ধ যুগে যুগে যেমন মানুষকে ঘর ছাড়া করে, সর্বহারা করে, ওদের অবস্থাও তেমনি তখন।

আমি যখন প্রথম বেণুকে দেখি তখন ও ফ্রক পরতো। আমরা মাঝে মাঝে ওদের দেখতাম। পরে অবশ্য আমাদের সংগে ওদের পরিচয় হয়েছিল।

কিছুদিন বাদে সেই রেণু আমার সংগে অভিনয় করেছিল 'বসু পরিবার' ছবিতে। তারপর 'মর্মবাণী' নামে একটি ছবিতে কাজ করেছিল বটে কিন্তু সেই ছবি যেন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়। চন্দ্রাদি অর্থাৎ আমাদের শ্রদ্ধেয়া অভিনেত্রী চন্দ্রাবতী দেবীর সংগে রেণুদের পরিচয় ছিল, পরে শুনেছি রেণুর সিনেমায় অভিনয় করার ব্যাপারে চন্দ্রাদির সহযোগিতা ছিল। তারপর যে কী হয়েছিল জানি না। তবে এটা জানি রেণুরা বাসাবদল করেছিল। অনেকদিন বাংলা ছবির জগতের মানুষ রেণুর সন্ধান পায়নি। কোথায় গেল সে? আসলে রেণুর জীবনের পটপরিবর্তন হয়ে গেল অলক্ষ্যে। রেণুর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোকের নাম বিশ্বনাথ চৌধুরী। সেই থেকে ব্যানার্জীর পরিবর্তে চৌধুরী। সুপ্রিয়া চৌধুরী।

আমরা সবাই তাকে ভুলেই গিয়েছিলাম বলা যায়। কথায় বলে, আউট অব সাইট আউট অব মাইণ্ড। আসলে রেণু তখন সিনেমার পর্দায় কিংবা স্টুডিও মহলে এমন কোন সাড়া ফেলেনি বলে কেউ তাকে বিশেষ ভাবে মনে রাখেনি। হঠাৎ আবার তার আবির্ভাব ঘটল। তখন তার চেহারাও পাল্টে গেছে, মনটাও তখন তার অনেকখানি উজ্জ্বল হয়েছে। প্রাপ্ত মনস্ক বলা যায়। অত্যন্ত বলিষ্ঠ তার পদক্ষেপ। যুগের সংগে তাল দিয়ে চলার মত বিরাট মন তখন তৈরি হয়েছে তার। রীতিমত বেপরোয়া। এই যে সময়ের কথা বলছি তখন কাঁচুলী পরে কোন নায়িকার সিনেমায় কাজ করা মানে একটা বিপ্লব। এই ধরনের বিপ্লব টিপ্লব করতে তখনও এখানকার মেয়েদের দ্বিধা, সংকোচ। রেণু সে সবের বালাই না রেখে অভিনয় করেছিল "আম্রপালি" ছবিতে। তখন রমা অর্থাৎ সুচিত্রা সেন আর আমার রোমান্টিক যুগের সূচনা, সেই সময়ে রেণু একটা ব্রেক এনে দিল।

১৯৫৮ অথবা ৫৯ সাল। আমি একদিন আমার নিউ আলিপুরের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে গল্প করছি, আমার সংগে আছে প্রযোজক দেবেশ ঘোষ, লালু। দেবেশের সংগে তার "শুন বরনারী" নিয়ে কথা বলছি। এই ছবিতের হীরোয়িন কাকে করা যায় সেই নিয়ে কথা হচ্ছে, তা ছাড়া আরও নানা আলোচনা—হঠাৎ দেখা গেল এই বাড়ির নীচ দিয়ে যাচ্ছেন মনিবাবু। সুপ্রিয়ার ভাই মনি ব্যানার্জী। তাঁকে আমরা ডাকলাম। জানা গেল, মনিবাবু যাচ্ছেন বিমল রায়ের কাছে। বম্বের সেই স্বনামধন্য বিমল রায়। সুপ্রিয়ার একখানা ছবি নিয়ে চলেছেন বিমল রায়কে দেখাতে। আমরা সেই ছবি দেখতে চাইলাম। মনিবাবু ছবি দেখালেন। দেবেশ বলল, একে আমাদের ছবির জন্য ভাবলে কেমন হয়?

আমরা সবাই বেণুদেবেশের কথায় রাজী হয়ে গেলাম। আমি বললাম, বেণু এই ছবিতে কাজ করলে ভালই হবে—

আমরা সেই মুহূর্তে মনিবাবুকে নিয়ে বেণুদের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম। বেণুরা তখন বাড়ি বদল করেছে। থাকে সি, আই টি রোডে। তখন সন্ধ্যের অন্ধকার নেমেছে সেই সময় আমরা ওদের বাড়িতে গেলাম।

বেণু ইদানিং মাঝে মাঝেই স্মৃতি রোমন্থন করে বলত, আমি যখন নায়িকা হয়ে গেছি, বেশ কটা ছবি যখন আমার হয়ে গেছে, যখন মঙ্গলদার ছবি 'সোনার হরিণ' কিংবা 'উত্তরমেঘ' ছবিতে তোমার সংগে কাজ করছি, যখন 'শুন বরনারী' ছবিতে আমি তোমার নায়িকা—তখনও কিন্তু মনেমনে আমি তোমারপ্রেমিকা। তখন থেকেই তোমাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম কিন্তু কী আশ্চর্য কখনও তা প্রকাশ করতে পারিনি। তুমি আমার প্রথম যৌবনের দিন থেকে প্রেমিক।

সত্যি কথা বলতে কি আমিও সেই একই মন নিয়ে ঘুরছি। বেণুর সংগে যখন কাজ করছি তখন আমারও কিন্তু সেই একই ফিলিং। ওর সান্নিধ্য আমাকে যে খুশি করত তা বুঝতাম। আসলে সেটা বোধ হয় অন্য কিছুই নয়, বেণুর ব্যবহার, ওর মমত্ব বোধ, ওর কাজ করার প্রতি নিষ্ঠা, কাজ শেখার প্রতি আগ্রহ, ওর আন্তরিক অভিব্যক্তি, ওর মিষ্টি মিষ্টি একটা ভাব আমাকে খুশি করত। ওর সংগে কথা বলতাম—গল্প করতাম। শুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে ওর সংগে যদি দেখা হতো ভাল লাগত। ভীষণ ভাল লাগত।

এমন তো হয় মানুষের। জীবনে চলার পথে এমন একজনকে হয়তো পাওয়া যায় যাকে প্রথম দর্শনেই পরমবন্ধু মনে হয়। তাকে এক বেলা না দেখলে একটা অভাব বোধ হয়। যখন আমরা আলাদা ছবিতে, আলাদা স্টুডিওতে, আলাদা কোন জায়গায় আলাদা হয়ে কাজ করতাম তখন এই অভাব বোধ বেশী করে হতো। এটা যে আসলে কি তা বোঝাতে পারব না। এটাকে যদি প্রেম কিংবা ভালবাসা বলে কেউ, তা হলে বলতে দ্বিধা নেই আমার মনেও সেই প্রেম এসেছিল।

'শুন বরনারী' ছবিতে প্রথম বেণু আমার নায়িকা হয়। অন্য ছবিগুলোর কাজ যতদূর মনে হয় পরে আরম্ভ হয়েছিল, অথবা সমসাময়িক। এই সময়ে যদিও বেণুকে ঘিরে আমার মন দুর্বল হয়েছিল, যদিও একটা আকর্ষণ অনুভব করতাম তবুও এ কথা সত্য তখনও বেণুকে আমার অন্য নায়িকাদের থেকে আলাদা করে দেখতাম না। কিছুই প্রকাশ করতে পারিনি। আমার নায়িকারা তখন আমার কাছে যা বেণুও তাই। সতীর্থ। বন্ধুর মত বলা যায়। তবুও কেন জানি না আমার মনের ভিতরে ঐ ফিলিং হয়েছিল।

১৯৬২ সালে জানতে পারলাম বেণুর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে।

কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করতাম বেণু কেমন যেন অন্যমনস্ক। ভারাক্রান্ত। ওর মুখের দিকে তাকালে মনে হতো মানসিক কোন যুদ্ধ করছে। আমি জানতাম, অনেকদিন ধরে বেণুর সংসার জীবনে কোন শান্তি ছিল না। ওর স্বামীর সংগে কোথায় যেন একটা গরমিল চলছে। আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি ওকে সহজ করার। আমি মনেপ্রাণে চাইতাম বেণু তার স্বামী-সংসার নিয়ে সুখে থাক। বেণু তখন সবেমাত্র মা হয়েছে। ওদের নবজাতককে নিয়ে ওরা সংসারে সুন্দর করে দিনগুলো কাটাক। আমি মিটমাট করার জন্ত অনেক চেষ্টা করেছি ঠিকই আবার মাঝে মাঝে ওদের ব্যক্তিগত জীবন প্রসঙ্গে বিশেষ কৌতূহল দেখানো উচিত হবে না ভেবে চুপ করে থেকেছি। তবে ধরেই নিয়েছিলাম, সংসারে বেণু শত চেষ্টা করেও মানিয়ে নিয়ে চলতে পারছে না।

১৯৬২ সালেই তার পরিণতি। জানতে পারলাম ওর স্বামী বিশ্বনাথ চৌধুরীর সংগে সেপারেশন হয়ে গেছে। তখনই পরিষ্কার হয়েছিল আমার কাছে বেণুর যুদ্ধটা কোথায়।

এরপর বেণু তার একমাত্র কন্যা সন্তান সোমাকে নিয়ে দিনগুলো কোনক্রমে কাটিয়ে দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে যাদের ও একান্ত ভাবেই আপন মনে করত তাদের কাছে মনের কথা ব্যক্ত করে দিত। বলত একটা আশ্রয় দরকার, বলত, ছেলেবেলা থেকে নানা ভাবে ভাগ্যের সংগে লড়াই করে চলছি বলে আমি নিজে ভাল করে পড়াশোনা করতে পারিনি, এবার অন্ততঃ মেয়েটাকে পড়াশোনা শিখিয়ে বড় করার ভীষণ ইচ্ছে আমার—

এই সেপারেশনের পরে বেণুকে আমার আরও বেশী অসহায় মনে হতো। আমার মনের ওপর ওর সংগ্রামী জীবন, ওর বড় হবার আকাঙ্ক্ষা, একটা মর্যাদা নিয়ে আর পাঁচজন মেয়ের মত সাজানো সংসারে হাসিতে খুশিতে বেঁচে থাকার বাসনা একটা রেখাপাত করেছিল। মাঝে মাঝে মনটা দুর্বল হতো, আবার পরক্ষণেই নিজেকে সহজ করে নিতাম। কাজ করতাম। ঘরে ফিরে আসতাম। ফিরে আসতাম আমার ঘরের সেই পুরনো বৃত্তের মধ্যে।

বেণু স্মৃতিচারণ করত। বলতো, জানো যখন 'উত্তরায়ণ' ছবি করি তখন একদিন সত্যি সত্যি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখ তখনও তা তোমার কাছে প্রকাশ করতে পারিনি।

যে কোন কারণেই হোক বেণু সত্যিই তখন তার মনের অবস্থাটা আমার কাছে প্রকাশ করেনি। আমারও সেই একই অবস্থা। বেণু একদিন বলল, আমি কলকাতা থেকে চলে যাব, বম্বে গিয়ে সেটেলড হবো—

এই মনোভাবের কথা জানতে পেরে আমার মনে হয়েছিল, বেণু যদি এই ভাবে চলে যায় তা হলে ওর অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। অভিনয়ের যে ক্ষমতা ওর মধ্যে আছে তা নষ্ট হয়ে যাবে। বাংলা দেশের ছবির জগতে বেণুর মত নায়িকার প্রয়োজন আছে বৈকি; ও চলে গেলে সেটাও একটা বড় রকমের ক্ষতি বাংলা ছবির। ও হেরে যাবে এবং এটাই হবে তার বড় হার। আমি সেদিন ওকে বুঝিয়েছিলাম। অনেক বুঝিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত বেণু তার সিদ্ধান্ত বাতিল করেছিল।

একবার আমরা 'লাল পাথর' ছবির শুটিং করতে বেশ কিছুদিনের জন্য আগ্রায় গিয়েছিলাম। এ ছবির পরিচালক ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় সুশীল মজুমদার। ওখানে গেছি আমরা। ক'টা দিন শুটিং হবার পর বেণু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সেদিন তার জন্য যা করেছিলাম, যতটুকু সেবা-যত্ন করেছিলাম তা যে কোন মানুষই করে থাকে। সুতরাং সেই ঘটনা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। এটাকে আমার পক্ষ থেকে মনে রাখার দরকার হয়নি কখনও। কিন্তু বেণু ভোলেনি। বেণু ভুলতে পারেনি কিছু। সেই স্মৃতিও বেণু রোমন্থন করত। সে মাঝে মাঝেই বলত, তুমি সেবার যে সেবা-যত্ন করেছিলে আমার—তা পেয়েছিলাম বলে এক মুহূর্তের জন্যও তখন আমার মনে হতো না যে আমি একলা। আমি বন্ধুহীন। আমার সব কিছু ফাঁকা। জানো, সেইদিনই আমি তোমার ওপর অনেকটা নির্ভর করে ফেলেছিলাম—

সেদিন বেণু আমার ওপর কতখানি নির্ভর করেছিল তা আমি জানি না, তবে এইটুকু বলতে পারি প্রায় সতের বছর প্রতি মুহূর্তের জন্যে সে আমাকে লতার মত জড়িয়ে রেখেছে। কোন অবসর মুহূর্তে ওর মুখের দিকে যখন তাকাই একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে, সংসারের আর পাঁচজন পুরুষ মানুষের মত, তখন ওর মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারি না।

একরাশ ভাবনা এসে আমার মনকে ভরিয়ে দেয়। যখনই বেণুর মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়েছি তখনই মনে হয়েছে, বেণু আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছে। বেণু আমাকে ওর অন্তরের সবটুকু দিয়ে ভালবাসে। ও জীবনের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে আমাকে ভালবাসে। আমি জানি না, পরলোকের ডাকে সাড়া দিয়ে কে আগে যাবে, আমি না বেণু!

যদি আমি যাই তাহলে সেই পরপারে গিয়েও আমি জানবো বেণু আমাকে ভোলেনি। ময়রা স্ট্রীটের এই সব কিছুর ভিতরেই আমি থাকব, সব কিছুর মধ্যেই সে আমাকে কাছে পাবে। একটা দুটো বছর তো নয় এই সতেরটি বছর ওদের নিয়ে আছি এখানে। এটাই আমার তীর্থ।

এই মানসিকতার ভিতর দিয়ে একের পর এক ছবিতে কাজ করে চলেছি। এই ১৯৬২ সালে আমার ন'খানা ছবি মুক্তি পেয়েছিল। তখন আমি জনপ্রিয়তার একেবারে শিখরে পৌঁচেছি কিনা জানি না, তবে একটা বিশেষ জনপ্রীতি যে পেয়েছি তা বলতে পারি। এই ন'খানা ছবির মধ্যে তিনখানা ছবিতে বেণুই আমার নায়িকা। সেদিক থেকে এ সময়ে বেণু আর আমি মনের দিক থেকে অনেকটা কাছে এসেছি বলা যায়। এতদিনে আমি অনেকটা কাছ থেকে ওকে দেখবার ওকে বুঝবার চেষ্টা করেছি।

ইতিমধ্যে ১৯৬১ সালে বিধানচন্দ্র রায়, আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী "ভারতরত্ন" উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৯৫৪ সাল থেকে ভারত সরকার প্রতি বছর প্রজাতন্ত্রের দিনে দেশের জ্ঞানী গুণীদের সম্মানজনক উপাধিদানের প্রথা চালু করেছিলেন। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের আমল পর্যন্ত এই প্রথা চালু ছিল। কিন্তু কেন জানি না জনতা সরকার ক্ষমতায় এসেই এই প্রথা তুলে দিয়েছিলেন। সেই কারণে ১৯৭৮ আর '৭৯ সালে এই উপাধি কাউকে দেওয়া হয়নি।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় 'ভারতরত্ন' উপাধি যখন পেয়েছিলেন এবং ১৯৬২ সালে যখন আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিরাজেন্দ্রপ্রসাদ এই সম্মানে সম্মানিত হয়েছিলেন তখন গর্বে আমার বুক ফুলে উঠেছিল। আমি ভীষণ খুশি হয়েছিলাম।

এল ১৯৬৩ সাল।

এই ১৯৬৩ সালে আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়ে গেল।

আমি বিশ্বাস করি অলক্ষ্যে এমন একজন আছেন কিংবা এমন একটি শক্তি আছে যিনি বা যা প্রতি মুহূর্তে আমাদের চালিত করছেন। তা না হলে আমিই বা ঘর ছাড়ব কেন!

কিছুদিন ধরে শুধু কাজ আর কাজ নিয়ে অস্বাভাবিক পরিশ্রমের মধ্যে একটা মানসিক অস্থিরতা আমার ছিল। বার বার আমার মনে হতো, হয়তো সংসার ক্ষেত্রে আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে উঠছি। কাউকে আমি কোনকিছু দিয়েই তৃপ্ত করতে পারছি না অথবা আমার কোন কারণে কেউ তৃপ্ত হতে পারছে না! সে এক মহা অশান্তির মধ্যে দিনগুলো শুধু পার করে দিচ্ছিলাম আমি। সংসারের প্রতি দায়িত্ব কিংবা কর্তব্য অবশ্যই পালন করে যাচ্ছিলাম।

১৯৬৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে আমাদের ভবানীপুরের বাড়িতে

ছিল গৌরীর জন্মদিন। প্রতিদিন এই দিনটি এখানে পালন করা হয়। সকলের মত আমারও জন্মদিন পালিত হয় প্রতিবছর। সেদিন ছিল গৌরীর জন্মদিন। মোটামুটি একটা পার্টিও দেওয়া হতো। এই দিন অন্য বছরের মত আমিও বাড়িতে ছিলাম, সেই উৎসবের আমিও অংশীদার ছিলাম। হঠাৎ একটা মন কষাকষি হয়ে গেল। সেই মন কষাকষি কিন্তু চরমে পৌঁছে গেল। আমি অনেক চেষ্টা করেও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারলাম না। সে এক বিশ্রী ঘটনা। শেষ পর্যন্ত আমি সেই বাসর থেকে এক জামা কাপড়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। বাড়ির সংগে সব সম্পর্ক সেই মুহূর্তে সম্পূর্ণ ছিন্ন করে দিয়ে যে চলে গেলাম তা নয়, তবে এই গিরিশ মুখার্জী রোডের বাড়িতে আর থাকব না এমন একটা প্রতিজ্ঞা নিয়েই পথে নেমে পড়লাম।

নিজের মনের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে করে সেদিন মনটাকে ক্ষতবিক্ষত করেছিলাম। তবে আমার বার বারই মনে হয়েছিল, আমার অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব। বাংলা চিত্রজগত আমাকে যেমন দিয়েছে সব তেমনি তার অনেক প্রত্যাশা আমার কাছে।

দর্শক, প্রযোজক, পরিবেশক, প্রদর্শক মহল আমার কাছে অনেক প্রত্যাশা করেন, তাই প্রথমেই আমি চাইলাম মানসিক প্রশান্তি। যে প্রশান্তিটুকু পেলে আমি কাজ করে যেতে পারি।

মনের সংগে যুদ্ধ করে করে শেষ পর্যন্ত হাজির হয়ে গেলাম ময়রা স্ট্রীটে।

আমাকে ঠিক এইভাবে দেখলে তা বেণুর স্বপ্নেও ছিল না। আমাকে দেখে ও যে অবাক হয়েছিল, বিস্ময়ে প্রথমটা চমকে উঠেছিল তা ওর চোখ মুখের চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম।

বেণুকে সব কথা খুলে বলেছিলাম আমি।

বলেছিলাম, তুমি ময়রা স্ট্রীটের এই ফ্ল্যাট নেবার পর থেকে অনেকদিন আমাকে আসতে বলেছিলে, আসা হয়ে ওঠেনি, আজ এসেছি—তুমি আমাকে আশ্রয় দেবে?

তৎক্ষণাৎ বেণু আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। বেণু বিস্ময়-মমতা দুই নিয়ে হাসি মুখে দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। সেই থেকে এই ময়রা স্ট্রীটে আমি সতেরটি বছর আছি। ময়রা স্ট্রীটের এই ফ্ল্যাট আমার প্রথম প্রথম মানসিক শান্তির স্থল হিসেবে তুলনাহীন। ইদানিং অবশ্য মাঝে মাঝে মানসিক অস্থিরতা দেখা দেয়। অবশ্য জানি, কয়েকটা কাপ এক জায়গায় থাকলে তাতে ঠোকা-ঠুকি লাগে, তেমনি সংসার পাতলে সেখানে খটামটি লাগবে বৈ কি! তবুও এই ময়রা স্ট্রীটেই আমার সব কাজ।

এখানে বসে শিল্পীসংসদের প্রতিষ্ঠা দিয়েছি আমরা, এখান থেকেই জন্ম নিয়েছে 'বনপলাশীর পদাবলী' ; আবার এই ঘরেই 'দুই পৃথিবী'র জন্ম। চোখের সামনে আমাদের দু'জনার অর্থাৎ বেণু আর আমার উজাড় করা ভালবাসা আর স্নেহ ছায়ায় একটু একটু করে বড় হয়েছে সোমা। আমার কোন কন্যা সন্তান ছিল না বলে সোমাকে পেয়ে আমি সেই ব্যথাও ভুলেছিলাম। সোমা যখন বাপী বাপী বলে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত আমি কোনদিনই ভাবতে পারিনি সে আমার নিজের মেয়ে নয়। সে গৌতমের চাইতে আপনার এ কথা নয়, ওরা দু'জনেই আমার কাছে সমান আপনার। সোমা কোনদিন দুঃখ পাক, সে আমাকে তার একান্ত আপনার মনে করতে না পারুক তা আমি চাইনি বলে তাকে দত্তক কন্যার মর্যাদা দিয়েছি এই বাড়িতে, আবার তার বিবাহ দিয়েছি নিজের মনের মত করেই। কোন কার্পণ্য রাখিনি তার বিয়েতে। মেয়ে বড় হলে বাবা-মা আত্মীয় স্বজনদের যে দায়িত্ব থাকে, যে কর্তব্য থাকে, মেয়েকে সুখী করার ব্যাপারে যে চেষ্টা থাকে আমারও তাই ছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৩৭৬ সালের ২৬শে জানুয়ারী শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীমান প্রসূনের হাতে যখন আমি কন্যা সম্প্রদান করেছিলাম তখন নিজেকে ভীষণ হাল্কা মনে হয়েছিল আমার। সব বাবা-মা-অভিভাবকদের যেমন হয় তেমনি। বেণুও গৌতমকে কখনও আলাদা করে দেখেনি। এই ময়রা স্ট্রীটের বাড়িতে গৌতম আসে। গল্প করে। কিছু সময় আনন্দে খুশিতে কাটায় আবার চলে যায় আজও। গৌতম যখন সোমার সঙ্গে কথা বলে আমি যেন সে আনন্দ ধরে রাখতে পারি না।

প্রথম যখন সোমা সন্তান পেল আমরা সেদিন আনন্দে খুশিতে ঝলমল করে উঠেছিলাম। আমি দাদু হয়েছি সেটা কি আমার কম আনন্দ ! থাক এসব কথা। আরও একটু পিছিয়ে যাই আমি।

এই ময়রা স্ট্রীটে আসার পর থেকে আমি আবার মানসিক অনেকটা স্বস্তি পেতে থাকলাম। শুধু কাজ আর কাজ। একদিকে ছবির কাজ অন্যদিকে আনুসঙ্গিক সব কাজ। আগের বার সে সব কথা অনেকটাই বলেছি। যে কথা বলা হয়নি তা হলো বাংলা চলচ্চিত্র ক্ষেত্রের সংকটের কথা।

একজিবিউটর্সদের সংগে ডিষ্ট্রিবিউটর্সদের বিরোধ। বলা যেতে পারে, ডিষ্ট্রিবিউটর্সদের সংগে এক সর্বনাশা বিরোধ বাধিয়ে বসল একজিবিউটর্স মহল।

এই প্রসঙ্গে ১৯৬৮ সালের ৭ঠা জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল সেইটুকু যদি পড়া যায় তা হলে তখনকার অবস্থাটা মোটামুটি ভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

সংবাদটি ছিল এই রকম :

"পশ্চিমবঙ্গ চিত্রশিল্প সংরক্ষণ সমিতির সংগে
সিনেমা প্রদর্শকদের বিরোধ এক নতুন সঙ্কটের
সৃষ্টি করতে চলেছে। বুধবার টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে
এক সাধারণ সভায় স্থির হয়েছে যে 'বাঘিনী'
চিত্রটির মুক্তির জন্যে যে শর্ত সংরক্ষণ সমিতি
দিয়েছে তা যদি সংশ্লিষ্ট সিনেমা মালিক
মেনে না নেন তবে ১২ই জুলাই থেকে
কোলকাতার কোন প্রেক্ষাগৃহে যাতে বাংলা ছবি
(নতুন বা পুরাতন) না চলে সেই চেষ্টা করা হবে।
এই তারিখ থেকেই চলবে প্রদর্শকদের সংগে সংরক্ষণ
সমিতির "অসহযোগ আন্দোলন"।

আবার ১৭ই জুলাই তারিখে আর একটা সংবাদের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাংলা ছবির যখন নিদারুণ সংকট চলছে, যখন বাংলা ছবির সংগে জড়িত প্রত্যেক শিল্পী এবং কলাকুশলীরা পিকেটিং করছেন জীবন-মরণ পণ করে তখন এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারও নীরব ছিলেন না এই সংবাদে সেটুকু জানা যায়।

সংবাদটি ছিল এই রকম :

॥ দশ সপ্তাহ বাংলা ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক প্রস্তাব ॥

পশ্চিমবঙ্গে যে সব বাংলা ছবি তোলা হয় সেগুলি বছরে অন্যূন দশ সপ্তাহকাল এই রাজ্যের হাউসগুলিতে প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করার জন্য রাজ্যসরকার এক প্রস্তাবের কথা বিবেচনা করে দেখছেন।

মঙ্গলবার রাজ্যসরকারের এক মুখপাত্র বলেন যে, বাংলা চলচ্চিত্রের বাজার সীমাবদ্ধ বলে একে রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থার কথা তাঁদের ভাবতে হচ্ছে।

বহু চেষ্টা চালিয়েও যখন প্রদর্শকদের সন্তুষ্ট করা বা সমঝোতায় আনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল ,তখন চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টরা অর্থাৎ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্টুডিও-ল্যাবরেটরীগুলো বন্ধ করে দিলেন। এই সংবাদও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

ইতিপূর্বে আমি যে অভিনেতৃ সংঘের সভাপতি ছিলাম তা সকলেই জানেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধ'রে সংঘের অনেকের ব্যবহারে আমি মানসিক অশান্তিতে

ভুগছিলাম। আমার সতীর্থ সব শিল্পীদের সংঘ এটা, আমি সেই সংঘের সভাপতি। এটা আমার কাছে গর্বের ছিল বৈকি। অথচ আমার সতীর্থদের কিছু কিছু মন্তব্য আমাকে নিদারুণ আঘাত হানতে থাকল।

সৌমিত্র, অনুপ এঁরা সেই সব মন্তব্যে প্রতিবাদ করেছিলেন কিনা অথবা প্রতিবাদ করার পরিবর্তে এই সব মন্তব্যের সংগে তাঁরা পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন কিনা তা আমি নাই বা বললাম, শুধু এইটুকু বলতে পারি, তখনকার সংঘের সংগে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত এবং জড়িত অনেকের ব্যবহারে আমি আর আমার ভিতরকার মানুষটা ভীষণ আঘাত পাচ্ছিলাম।

শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম আমি অভিনেতৃ সংঘ থেকে মুক্তি না নিলে উপায় নেই। অর্থনৈতিক ব্যাপারে কোন সভাপতি জড়িত থাকেন না এটাই সর্বজন বিদিত অথচ সেই অর্থনৈতিক ব্যাপারে আমার ওপর একটা কলঙ্ক দেবারও চেষ্টা করা হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে ১৭ই জুলাই '৭৮, বুধবারের আনন্দবাজার এবং অন্য সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তা হলো এই রকম :—

উত্তমকুমার এখন অভিনেতৃ সংঘের সভাপতি নন ?

অভিনেতা উত্তমকুমার কি অভিনেতৃ সংঘের সভাপতির পদ ত্যাগ করেছেন ? এই অভিনেতার ঘনিষ্ঠ মহলের সূত্রে প্রকাশ, কয়েকদিন হ'ল তিনি নাকি অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সংঘের কার্যকরী সমিতির কাছে পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। শোনা যায়, সম্প্রতি তিনি টালীগঞ্জের এক স্টুডিওতে বলেন, কয়েকটি জটিল পরিস্থিতির জন্য অভিনেতৃ সংঘের সভাপতিরূপে তাঁর পক্ষে কাজ করা কঠিন এবং অস্বস্তিকর। এই দায়িত্ব থেকে তিনি মুক্ত হতে চান।

স্টুডিও মহলে কারও কারও ধারণা, অভিনেতৃ সংঘের কয়েকজন সদস্যের আচরণ ইঙ্গিতে উত্তমকুমার প্রতিকূল মনোভাবের আভাস পান। মানসিক শান্তির জন্যই নাকি তাঁর সভাপতির পদ ত্যাগের সিদ্ধান্ত।

এরপর অনেক জল্পনা কল্পনার পর আমরা কয়েকজন স্থির করেছিলাম বঙ্গ সংস্কৃতি ক্ষেত্রের সব বিভাগের সব শ্রেণীর শিল্পীদের জন্য একটা নতুন সংস্থার প্রতিষ্ঠা দেব আমরা। কেউ বিশ্বাস করুন আর না করুন, আমি আমার অন্তরের গভীরতম স্থান থেকে বলছি, আমি বরাবরই জীবন প্রসঙ্গে সজাগ। আমি বিশ্বাস করি মনুষ্য দেহ ধারণ করেছি যখন তখন একদিন না একদিন আমাদের পৃথিবীর মায়া-মমতা বন্ধন সব রেখে চলে যেতে হবে। তাই দুঃস্থ শিল্পীদের জন্য—মলিন মুখগুলোর জন্যএকটা কিছু করার দরকার তা সব সময়েই মনে হতো আমার। আর সেই কারণেই, একটা মহৎ কিছু করার আকাঙ্ক্ষায় পরিকল্পনা

অনুসারে মাত্র ক'দিনের মধ্যেই আমরা একটা সংস্থা গঠনের কাজ শুরু করে দিলাম।

মারা স্ট্রীটের বাড়িতে আমরা প্রথম এই ব্যাপার নিয়ে যে সভা করেছিলাম তার তারিখ ছিল ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ সাল! সভায় সংস্থার ভবিষ্যৎ কাজ কি হবে এবং কাদের নিয়ে সংস্থা গঠন করা হবে, কি নামকরণ হবে সংস্থার—সব ঠিক হয়ে গেল। মূলত এই দিনই জন্ম নিল শিল্পী সংসদ।

১২৫ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের দপ্তরেই অরোরার কর্তৃপক্ষ অজিত বসুরা আমাদের অফিস করার সুযোগই শুধু দিলেন না সেই সঙ্গে তিনি সর্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করতে লাগলেন। এই সালের ৬ই নভেম্বর আমাদের এই শিল্পী সংসদ রেজিষ্ট্রী করা হলো। সর্বসম্মতিক্রমে আমি সভাপতি আর সহ-সভাপতি হন, মলিনাদি, গুলালদা (জহর গাঙ্গুলী) ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য আর যাত্রা জগতের স্বনামধন্য অভিনেতা পঞ্চু সেন। সাধারণ সম্পাদক হন, প্রবীণ পরিচালক আমাদের শ্রদ্ধেয় কালাচাঁদদা, অর্থাৎ অর্ধেন্দুদা। অর্ধেন্দু মুখার্জী। শুরুতেই আমাদের সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল দেড়'শ।

শিল্পীসংসদ সৃষ্টি করেই আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য কাজ শুরু করে দিলাম। সংস্থার মূল উদ্দেশ্য দুঃস্থ শিল্পীদের জন্য শুধু নয়, আমাদের দেশের কল্যাণকর কাজে সব সময় আমরা সাহায্য করব। ১৯৬৯ সালে আমরা রবীন্দ্রসদনে একটা বিচিত্রানুষ্ঠান করলাম। উদ্দেশ্য, মেয়রের রিলিফ ফাণ্ডে টাকা দেওয়া। সব রকম খরচ বাদ দিয়ে সাত হাজার তিন'শ আট টাকা আমরা তুলে দিয়েছিলাম মেয়র গোবিন্দ দে'র হাতে। এরপর আমরা পরিকল্পনা নিয়েছিলাম, যে সব শিল্পী কর্মীদের মাসিক আয় আড়াইশ টাকার মধ্যে আমরা তাঁদের পরিবারের যার যা অসুখ বিসুখ করবে তার চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করব।

শিল্পী সংসদের রেজিষ্ট্রী হবার আগে অর্থাৎ ২১।১০।৬৮ তারিখে আমরা আমাদের নটশেখর পরম শ্রদ্ধেয় নরেশ মিত্র মশায়ের মৃত্যুতে এক শোক সভার আয়োজন করেছিলাম, সেখানে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল বেলতলা রোডের (নরেশদা থাকতেন) নাম পাল্টে নরেশ মিত্র সরণি করার জন্য মেয়রের কাছে অনুরোধ জানানো হবে। আমাদের এই প্রস্তাব মেয়র গ্রহণ করেছিলেন এবং সংগে সংগেই নামও পাল্টে দিয়েছিলেন।

এরপর ১৯৬৯ সাল এল।

আগেই বলেছি যে আমি 'ভরত' পুরস্কার পেয়েছিলাম। আমার এই পুরস্কার পাবার ব্যাপারে শিল্পী সংসদ এবং আমার পরম সতীর্থরা আমাকে সম্বর্ধনা জানালেন নারকেল ডাঙ্গা নর্থ রোডে অরোরা স্টুডিওতে। এই সময় চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির কাজ চলছিল পূর্ণোদ্যমে। আমি এই সমিতির বিশিষ্ট সদস্য ছিলাম। অরোরা স্টুডিওতে যেদিন আমাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় সেইদিন আমি তদানীন্তন আই. জি. উপানন্দ মুখার্জীর গাড়িতে গিয়েছিলাম। আমার নিরাপত্তার জন্যই সেইদিন উপানন্দবাবু আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী আমাদের শ্রদ্ধেয়া বৌদি। এইদিন অরোরাতে মধ্যাহ্ন ভোজনের একটা বিরাট আয়োজন হয়েছিল। সে এক এলাহি কাণ্ড! যখন আমাকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছিল তখন আমি কিছুতেই যেন সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। এর কারণ হলো, যাঁরা আমার চাইতে পুরোনো-প্রখ্যাত এবং প্রবীণ তাঁরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সবার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় মালা পরতে ভীষণ লজ্জা হচ্ছিল আমার।

এর ক'দিন পর কলকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমাকে নাগরিক সম্বর্ধনা জানানো হয়। কর্পোরেশনের ভিতরের অঙ্গনে আমার জন্যে আসর তৈরি হয়েছিল। মেয়র স্বর্গ গোবিন্দ দে মশাই আমাকে সেই সম্মানে ভূষিত করেছিলেন।

আমি একটা কথা বুঝি, তাহ'ল শিল্পীদের কোন জাত নেই। সুতরাং সব শ্রেণীর শিল্পীদের নিয়ে আমাদের এই সংস্থা গঠিত হয়েছিল। যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা, সংগীত, নৃত্য, বেতার, দূরদর্শন সব জায়গার শিল্পীরাই আমাদের সভ্য হয়েছিলেন। আমরা তাঁদের মতামতের মূল্য দিতাম। দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্য করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তাও বাড়ানো দরকার এবং তার পাশাপাশি শিল্পীদেরও আনন্দ বিনোদন দরকার মনে করে আমরা একের পর এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে থাকলাম।

১৯৬৯ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্র ক্ষেত্রের জন্য ভারত সরকার আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। এই সালেই দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। খবরটি পেয়ে যতটা খুশি হয়েছিলাম, তার চাইতে অনেক বেশী গর্বিত হয়েছিলাম দেবিকারাণীর কথা শুনে। এই পুরস্কার প্রবর্তন করার সংগে সংগে সেই সম্মানে

ভূষিত হলেন দেবিকারাণী এটা আমাদের গর্বের ব্যাপার বৈকি! ফালকে পুরস্কারের সম্মানে যাঁরা ভূষিত হবেন তাঁরা পাবেন নগদ ৪০ হাজার টাকা, একটা সোনার পদক, একখানা শাল আর মানপত্র। দেবিকারাণী রোয়েরিক তাই পেলেন।

এপ্রিল ১৯৭০।

আমরা এগিয়ে চলেছি। একদিকে ছবির কাজ অন্যদিকে সংসদের কাজ সব নিয়ে এগিয়ে চলেছি। আমাকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে বেনু। আমি বম্বে-কোলকাতা সমানে চালিয়ে যাচ্ছি। এমন সময় আমরা বন্যাত্রাণের কাজে নেমে পড়লাম। C. A. B.-র সহযোগিতায় আমরা ইডেন উদ্যানে বম্বে-কোলকাতার বিখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে এক প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার আয়োজন করলাম।

আশাতীত সাফল্য লাভ করলাম আমরা। এ সব ব্যাপারে বম্বের শিল্পীরা বেশ দরদী-মরমী। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেকের সংগে যোগাযোগ করেছিলাম। কেউ আমাদের প্রত্যাখ্যান করেননি। এই খেলা থেকে ৮৬০০০ টাকা আমরা রাজ্যপালের ত্রাণ তহবিলে দিতে পেরেছিলাম। এই সালেই অর্দ্ধেন্দুদারা অর্থাৎ অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী এবং আরও কয়েকজন দু হাজার টাকার জামা-কাপড় বন্যাপীড়িতদের মধ্যে দিয়ে এসেছিলেন শিল্পী সংসদের পক্ষে। আর আমরা নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতিকে ৫০০ টাকা দিয়েছিলাম।

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একেবারে গোড়ায় বোধ হয় ১লা কি ২রা তারিখে সংসদের ফাণ্ড বাড়াবার জন্যে আমরা নাটক করেছিলাম রবীন্দ্র-সদনে। আলিবাবা। এই নাটকে বাবা মুস্তাফার রোলে অভিনয় করেছিলাম আমি। মর্জিনা হয়েছিলেন জয়শ্রী সেন। এই নাটক সবার ভাল লাগল, সেলও ভাল দেখে আমরা রিপিট শো করলাম ১১ই সেপ্টেম্বর '৭০ কলামন্দিরে।

এর মধ্যে আমরা অনেক গুণীজন সম্বর্দ্ধনারও আয়োজন করেছিলাম। তারিখ সন দিয়ে বিস্তারিত বলার কোন প্রয়োজন নেই। তবে যেটুকু না বললে আমাদের সংসদের ভাবমূর্তি তুলে ধরা যাবে না সেইটুকু এখানে উল্লেখ করছি। আসলে আমি এখানে যা স্পষ্ট করে তুলতে চাইছি তা হলো, অভিনেতৃ সংঘ ছেড়ে এসে মানুষের কল্যাণে যে কাজটুকু আমরা করতে চেয়েছিলাম তা আমরা করেছি এবং জীবন দিয়ে করে যাব।

রবীন্দ্র সদনে গুণীজন সম্বর্ধনায় যাঁকে বরণ করেছিলাম তিনি উদয়শঙ্কর। উদয়শঙ্কর যখন পদ্মভূষণ পেলেন তখন আমরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। এই অনুষ্ঠানে আমাদের সংসদের সহ-সভাপতি বিকাশদা অর্থাৎ বিকাশ রায় এই মহান শিল্পীর হাতে মানপত্র তুলে দিয়েছিলেন। এই বছরে নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার বি. এন. সরকার পান দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার।

এই রবীন্দ্র সদনেই আমরা নাট্য সম্রাজ্ঞী সরযূ মাকে অর্থাৎ সরযূবালা দেবীকে সম্বর্ধনা জানাই। সেদিন এই শিল্পীর হাতে মানপত্র তুলে দিয়েছিলেন আমাদের সংসদের সহ-সভাপতি শ্রীমতী অমলাশঙ্কর। আমার অভিনেতা জীবনের প্রথম লগ্নে প্রতি মুহূর্তে যাঁর সঙ্গে কথা বলেছি—গল্প করেছি—নাট্য জ্ঞান আহরণ করেছি—নিতান্তবাধ্য ছাত্রেরমত যাঁর পাশে বসে একদিন উপদেশ নিয়েছি, যাঁদের দেখে আমি বার বার অনুপ্রাণিত হয়েছি, পরবর্তী সময়ে আমিই তাঁদের গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছি। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁর কথা মনে পড়ছে তিনি অহীন্দ্র চৌধুরী। শিল্পী সংসদ আয়োজিত নটসূর্য সম্বর্ধনায় সংসদের সভাপতি হিসেবে আমিই অহীনবাবুর গলায় মালা পরিয়েছিলাম। আবার আমরাই রবীন্দ্রসদনে আর এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বরণ করেছিলাম শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রকে। সেদিন সংসদের সহ-সভাপতি শ্রীমতী মলিনা দেবী মানপত্র তুলে দিয়েছিলেন শ্রীমতী মিত্রের হাতে।

১৩৭১ সালে মাধবী মুখার্জী যখন 'উর্বশী' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন আমরা তাঁর বিশেষ সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলাম। মাধবী তখন মুখার্জী থেকে চক্রবর্তী। আমাদের বন্ধু নির্মলকুমারের তিনি জায়া হয়েছেন। এঁরা দু জনেই সংসদের সদস্য।

আমরা সম্বর্ধনা জানিয়েছি উৎপল দত্তকে। উৎপলবাবু সেবার 'ভরত' পুরস্কার পান। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সংগে, ভারাক্রান্ত মন নিয়ে প্রবীণ অভিনেতা ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ যখন মারা যান তখন, আবার যখন দুলালদা অর্থাৎ জহর গাঙ্গুলীকে হারালাম তখন শোকসভার আয়োজন করে নিজেদের কৃতার্থ করেছি। আমরা একটার পর একটা নাটক করি, একটার পর একটা বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করি, আমরা একাঙ্ক নাট্য উৎসব করে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থাও করেছি, আবার পিকনিকও করি, ভবিষ্যতেও করব।

আমাদের শিল্পী সংসদের সদস্যরা এই সামান্য ক' বছরে যে ক'টি অনুষ্ঠান করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, গীতিনাট্য ঋতুরঙ্গ, কৌতুক নক্সা দুগ্ধ বিচার, নাটক—পরপক্ষ, নীলদর্পণ, সাজাহান, আলিবাবা। এর মধ্যে কোন নাটকে আমি অভিনয় করেছি আবার কোন নাটক আমি পরিচালনা করেছি।

রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নক্সা স্বর্গে বিচার করেছিলাম আমি আর বিকাশদা। সে এক হিলারিয়াস ব্যাপার।

এই সালে খবর পেলাম পৃথ্বিরাজ কাপুর পেয়েছেন দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার।

তবে সংসদ জন্ম নেবার পর ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্র সদনে আমাদের প্রথম অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে ছিল অলীকবাবু নাটক আর অভিসার নামে গীতিনাট্য। এই গীতিনাট্যে আমি ছিলাম নায়ক। আর আমার যে তিন নায়িকা, তাঁরা ছিলেন বাসবী নন্দী, লিলি চক্রবর্তী আর জ্যোৎস্না বিশ্বাস।

এই গীতিনাট্যের গীতিকার ছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুরকার শ্যামল মিত্র। অপূর্ব হয়েছিল সেটি। আমার চরমতম ব্যস্ততার মধ্যে যখন এই গীতিনাট্য নিয়ে বসতাম তখন যে কী তৃপ্তি পেতাম তা আজ আর বোঝাতে পারব না।

১৯৭০ সালে আমরা সংসদের পক্ষে প্রথম শুরু করি কবিপ্রণাম। এই কবিপ্রণাম অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল কবির ঋতুরঙ্গ। দ্বিজেন মুখার্জী, বাসবী নন্দী আরও অনেকেই চমৎকার গেয়েছিলেন সেদিন। মনে আছে, আমাকে প্রায় দশখানা গান গাইতে হয়েছিল। এই সালের ৮ই মে তারিখটি আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে বোধ করি সেই কারণে।

এ সব কাজের মধ্যে যেমন মনটা একরাশ খুশিতে ঝলমল করে উঠেছিল তেমনি ১৯৭৩ সালে আমাদের প্রাণের কবি, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের মৃত্যু সংবাদ আমাকে চরম ব্যথিত করেছিল।

১৯৭২ সালের একটি খবর এখানে বলা দরকার।

এই সালে দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছিলেন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় পঙ্কজকুমার মল্লিক মশাই। সংবাদটি পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলাম। খুশি হয়েছিলাম এই ভেবে যে প্রকৃত গুণীর মর্যাদা পেয়েছেন পঙ্কজদা। তবে এই মর্যাদা তাঁর পাওয়া উচিত ছিল আরও ক'বছর আগে। যা হোক, আগে শিল্পী সংসদের সব কথা এখানে বলে নিয়ে তারপর আবার ফিরে আসব আমার কথায়। ফিরে আসব আমার ব্যক্তিগত অনেক কথায়।

১৯৭৫ সালে আমরা গেলাম মালদহে।

এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল সেখানে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আমাকে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানালেন। বন্যাত্রাণে এই অনুষ্ঠানের টাকা ব্যয় করা হবে। আমরা গেলাম। পরে শুনেছিলাম প্রায় দেড় লক্ষ টাকা তাঁরা ত্রাণ তহবিলে দিতে পেরেছিলেন।

আমার ডায়রী লেখার অভ্যাসটা নিতান্ত গৌণ, তাই আগেই বলেছি সব সাল তারিখ মাঝে মাঝে বিস্মরণ হতে পারে, তাই আমি একটি করে পর্ব শেষ করতে চাই। এখন আমাদের শিল্পী সংসদের পর্ব চলছে। সেই পর্ব এখানে শেষ করা যাক।

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশ্বরূপা থিয়েটারে আমরা তিনদিন নাট্যোৎসব করেছিলাম। বাংলা নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্তি উৎসব সমিতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে একটি নাটক আমরা মঞ্চস্থ করেছি। পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেস আয়োজিত ভারতের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উৎসবে এবং নাট্য সম্মেলনের আমন্ত্রণে জ্ঞান জোয়ারে দেশ ও দশের সেবায় আর সব শ্রেণীর শিল্পীদের মঙ্গল কামনায় আমরা নাটক করেছি। বার বার সাড়া দিয়েছি। যাঁদের সাহায্য পেয়েছি তাঁরা চিরকালের জন্ত আমাদের ধন্ত করেছেন। বসুশ্রী সিনেমার কর্ণধার মন্টু বসু রবীন্দ্র জন্ম বার্ষিকী উৎসব পালনের সময়ে কোন খরচ না নিয়ে আমাদের প্রেক্ষাগৃহ ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। বিশ্বরূপা থিয়েটারের কর্ণধার রাসবিহারী সরকার মশাই নাট্যোৎসবের জন্ত অল্প টাকায় তাঁর হাউস ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। এটাও আমাদের অনেক বড় পাওয়া।

আমরা চেয়েছি শিল্পীরা বাঁচুন। দুঃস্থ, অক্ষম, নিরাশ্রয় শিল্পী যাঁরা জীবন সংগ্রামে হেরে গিয়ে সকলের চোখের আড়ালে ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছেন, আমরা চেয়েছি তাঁরা বাঁচুন। জীবনের স্বাদ উপভোগ করুন। আর তাই যেদিন সংসদের কার্যনির্বাহক সমিতি 'বনপলাশীর পদাবলী' সংসদের প্রযোজনায় চিত্রায়িত করার দুঃসাহসিক প্রস্তাব নিয়েছিলেন সেদিন প্রতিটি সদস্য আনন্দে

খুশিতে ভরে গিয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। আনন্দ ও শঙ্কা যুগপৎ আমাকে, আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। সংসদের সভাপতি হিসেবে আমি শঙ্কিত হয়েছিলাম কারণ আমার ওপর অনেকটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। যখনই ভাবলাম আমার ওপর নির্ভর করবে এতগুলো ক্ষুধার্ত লোকের অন্ন—তাদের জীবন-মরণ তখনই মনে মনে অনেকখানি শঙ্কিত হয়েছিলাম। সংসদের ফাণ্ড বাড়াবার জন্য সংসদ ছবি করতে নামছে আর সেই ছবির সব দায়িত্ব আমার ওপরে, সুতরাং তখন যে কী মানসিক অবস্থা আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। ছবি যদি মার খায় তা হলে ভরাডুবি হয়ে যাবে সব আর তা হলে আমার চরম পরাজয়। তবুও সব দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়েছিলাম। বেণু আমাকে সেদিন যে ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, যেভাবে সাহস জুগিয়েছিল তা সত্যিই স্মরণীয়। অবশেষে ব্যক্তিগত সুখ আহ্লাদ সব ভুলে গিয়ে আমি সত্যিকারের বলিষ্ঠ পরিচালক হবার সঙ্কল্প করেছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমার প্রিয় দর্শকদের একটি নিটোল সুন্দর ছবি উপহার দেবই। তার জন্যে যে সাধনা আমাকে করতে হয়েছিল, যে নিদারুণ পরিশ্রম আমাকে করতে হয়েছিল পরবর্তী সময়ে তার পুরস্কার আমি পেয়েছিলাম 'বনপলাশীর পদাবলী' ছবির সাফল্যে। এই সাফল্যের মূলে শুধু একা আমার সাধনা পরিশ্রম ছিল না, সংসদের সব সদস্যরা, ছোট বড় সব শিল্পীরা যে নিষ্ঠা আর পরিশ্রম ঢেলে দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তা চিরকাল আমি স্মরণ করব।

আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি ধন্য এই কারণে যে এই ছবি আপনাদের খুশি করতে পেরেছিল।

আমি এবং আমাদের সংসদ ঋণী তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, অর্থমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, পুলিশ, তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং পার্লামেন্ট সদস্য আমাদের প্রিয় প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর কাছে। এঁদের প্রচেষ্টা আর পূর্ণ সহযোগিতায় এই ছবি প্রমোদকর মুক্ত হয়েছিল।

আমাদের এই ছবির পরিবেশক শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্সের কর্ণধার রঞ্জিৎমল কাঙ্কারিয়ার কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ, এই কারণে তিনি পরম সুহৃদ হিসেবে সেদিন এই ছবির ডিস্ট্রিবিউশন নিতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং সুবিধাজনক শর্তে এই ছবির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ছবির কাজ যখন চলছিল তখন অবশ্য এই ছবির স্বার্থে আমি দু'একবার এই পরিবেশক সংস্থার নামে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলাম। পরে অবশ্য সব সহজ হয়ে গিয়েছিল। এই ছবি থেকে পরে যে টাকা এসেছিল তা আমাদের সংসদের দুঃস্থদের জন্য যে তহবিল ছিল

তাতে জমা হলো। এরপর আমরা থেমে থাকিনি একদিনের জন্যও। পরিকল্পনা মত আবার আমরা যে ছবিটি তৈরি করেছি তার নাম 'ছুই পৃথিবী'। সে তো পরের কথা, এবার অন্য কথায় আসি।

গত ৯।৫।৭৯ তারিখে আমি, সুহৃদা অর্থাৎ আমাদের পরম সুহৃদ, আমাদের সব সময়ের বন্ধু সুনীল রায় চৌধুরী আর বর্তমান সম্পাদক আমাদের প্রিয় গোপাল সিংহ রায় রাইটার্স বিল্ডিং যাই এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হাতে চার লক্ষ বার হাজার বিরানব্বই টাকা ছই পয়সার একটি চেক তুলে দিই বন্যাত্রাণ তহবিলের জন্য। এই টাকাটি আমরা সংগ্রহ করেছিলমে বিরাট প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার মাধ্যমে। এবারও C. A. B. মাঠ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এবার আমাদের সংগে হাতে হাত মিলিয়ে অভিনেতৃ সংঘের সবাই এই মহৎ কাজে অংশ নিয়েছিলেন। বম্বে-মাদ্রাজ আর আমাদের এখানকার বিখ্যাত শিল্পীরা অংশ নিয়েছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে, আন্তরিকভাবে, ওখানকার শিল্পীদের আনবার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম। সেই বিরাট প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা থেকে এই টাকা এসেছিল এবং মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিতে পেরেছিলাম। শিল্পী সংসদের এই ভূমিকাকে সভাপতি হয়েও মনে মনে তারিফ করেছিলাম আমি। গর্বে আমার বুক ফুলে উঠেছিল। যা হোক, একটা কথা অবশ্যই বলা যেতে পারে, এই টাকা এদেশের সাধারণ মানুষের টাকা, এই সাধারণ মানুষরা সেদিন খেলা দেখে এই অর্থ দিয়েছিলেন বলে আমাদের ইচ্ছে ছিল একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, সকলের সামনে এই টাকা আমরা তুলে দেব মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। আমরা জ্যোতিবাবুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম কিন্তু সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করার মত সময় বা সুযোগ তিনি করে উঠতে পারেননি, অগত্যা রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে টাকা দিয়ে আসতে হয়েছিল আমাদের।

শিল্পী সংসদ দুঃস্থ শিল্পীদের খাতে এ পর্যন্ত যে অর্থ ব্যয় করে দুঃস্থ হতে পেরেছে তার হিসাবটা এই রকম—

১৯৭৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ১২,৬৭৮ টাকা
১৯৭৬ „ „ „ " „ ১০,১২৬ „
১৯৭৭ „ „ „ „ " ১৯৭৬ সালের অনুরূপ
১৯৭৮ „ „ " „ „ ২৯,৩৩১ টাকা
১৯৭৯ „ „ „ „ „ ৪৮,৬৭০ টাকা ৩০ পয়সা।

শিল্পী সংসদের এত কাজ—এত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সংসদের সবার সংগে হাসিতে খুশিতে দিনগুলো কাটাচ্ছি ওদিকে একটার পর একটা ছবির কাজ।

দিনের পর দিন প্রতি মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎচালিত পুতুলের মত আমি শুধু কাজ করে চলেছি। এর মধ্যে মানসিক অস্থিরতাকে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারতাম না। মাঝে মাঝে নিজেকে ভীষণ একলা মনে হতো আমার, মাঝে মাঝে মনে হতো আমি ভীষণ অসহায়। এর মধ্যে আবার পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলো ভাবিয়ে তুলত।

তার মধ্যে অন্যতম হলো আসামের 'বিদেশী' বিরোধী আন্দোলন!

আমাদের বাংলা ছবির ব্যবসার বাজার কোনদিনই বিরাট নয়, সীমিত। তার মধ্যে এই আসাম আন্দোলনের ফলে আসামের বাজারও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে সেখানে, যাতে বাঙালী হয়ে আমিও ভিতরে ভিতরে কষ্ট পাচ্ছি।

আসামে অনেকদিন ধরে যে 'বিদেশী' বিরোধী আন্দোলন চলছে তার ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের সব মানুষের জীবনের নিরাপত্তা, সংহতি, সংস্কৃতি আর সমৃদ্ধি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। আমরা দেখছি আসামে বহিরাগত সমস্যা নতুন নয়, এই নিয়ে অতীতে অনেক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছে এখনও সমানে চলছে। শুধু বাঙালী নিধন যজ্ঞ চলছে সেখানে। এতে আমার মন আহত হচ্ছে বার বার। তবুও কাজ করে যাচ্ছি।

হঠাৎ একদিন সোমার জীবনেও একটা বিপর্যয় এল। আমি এই ঘটনায় যতটা আঘাত পেলাম তার চাইতেও মা হয়ে বেণু আঘাত পেল চরম। বেণু ভীষণ মুষড়ে পড়ল। আমরা কিন্তু সোমাকে বুঝতে দিলাম না। আমাদের ছায়ায় আমাদের মধ্যে কল্যাণীয়া সোমা তার সদ্যজাত সন্তানকে নিয়ে থাকল। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকালে আমরা ভীষণ কষ্ট পেতাম। সোমার এই বিপর্যয় আমাকে আর বেণুকে ভীষণ বিব্রত করেছিল।

আগেই বলেছি চন্দননগরের বর্ধিষ্ণু গোঁসাই পরিবারে বিয়ে হয়েছিল সোমার। বিয়েতে বোধহয় আমরা কোন কার্পণ্য করিনি, তা ছাড়া আমি তাকে আমার দত্তক কন্যার মর্যাদাও দিয়েছিলাম, তাকে বুঝবার সুযোগ দিয়েছিলাম সে কোন ভাবেই একলা নয়। তার মনে কোন দুঃখ থাকুক তা আমরা কেউ চাইনি। অথচ ঈশ্বর তাকে সেই দুঃখই দিলেন। তবুও লক্ষ্য করেছিলাম, অল্প সময়ের মধ্যে সোমা তার মনকে শক্ত করে সহজ হয়ে উঠতে পেরেছিল।

আমি সংসারের কোন কর্তব্যই অবহেলা করিনি কখনও। মাঝে মাঝে গৌতমের জন্য ভাবনা আমার কম ছিল না। গৌতম বড় হয়েছে, ওর জন্যে একটা কিছু করা কর্তব্য, সেই ভাবনা আমাকে গ্রাস করেছিল। একমাত্র

ছেলের বিয়ে দিয়ে পুত্রবধূর মুখটি দেখার ইচ্ছে আমার হতো বৈ কি! তাই ঈশ্বর বোধহয় আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন সহজেই। তখন আমার মা, গৌরী সবাই কিন্তু গৌতমের ভাবনায় কাতর।

আমার এক মামা তখন চাকরি করতেন আই, সি, আই কোম্পানিতে। মামার সঙ্গে চাকরি করতেন কালীনাথ চ্যাটার্জী নামে একজন ভদ্রলোক। অত্যন্ত সহজ-সরল-অমায়িক ভদ্রলোক, এটা পরে উপলব্ধি করেছিলাম। আমাদের বাড়িতে বরাবরই লক্ষ্মীপুজো হয় ঘটা করে। পরে অবশ্য বাড়িতে কালীপুজো হতে আরম্ভ করে। আমাদের বাড়ির লক্ষ্মীপুজো দেখার আগ্রহ অনেকেরই। কালীবাবু একদিন তেমনি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন মামার কাছে। বাড়ির সকলকে নিয়ে ভবানীপুরের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাই হলো। ১৯৭৭ সালের পুজোয় কালীনাথবাবু পরিবারের সবাইকে নিয়ে এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে।

কালীনাথবাবুর কন্যা কল্যাণীয়া সুমনাকে দেখেই আমার মা এবং অন্যদের এমন কি আমারও খুব পছন্দ হয়ে গেল। সংগে সংগে সুমনাকে পুত্রবধূ করার প্রস্তাব দিলাম। এবং ১৯৭৮ সালের ১লা মার্চ বুধবার আমার একমাত্র ছেলে গৌতমের সংগে সুমনার বিয়ে হয়ে গেল। এই উপলক্ষে ৫ই মার্চ আমি মাণ্ডেভিলা গার্ডেনস্-এ এক প্রীতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। সেইদিন একরাশ তৃপ্তিতে আমার মন ভরে গিয়েছিল।

একটু পিছিয়ে যাই। একটু চলে যাই ১৯৭৫ সালে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৬শে জানুয়ারী তারিখে রবীন্দ্রসদনে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার প্রদাননীতি ঘোষণা করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যা বলেছিলেন তা হলো এই রকম—

"চলচ্চিত্র নিয়ে কালোবাজারী রুখতে হবে। যে বছরে যে ছবি তৈরি হবে সেই বছরেই যাতে সেই ছবি রিলিজ হয় সে জন্য আমি আইন করব।"

সিদ্ধার্থবাবু সেদিন এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ বছর শরৎচন্দ্রের তিনটি ছোটগল্প নিয়ে তিন জন প্রখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, পূর্ণেন্দু পত্রী একটি করে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি করছেন। তার প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছে রাজ্যসরকার। শ্রীরায় আরও একটি ঘোষণা করেছিলেন তা হলো ১৯৭৬ সাল থেকে যাঁরা আর্থিক অনটনের মধ্যে আছেন এমন দশজন টেকনিশিয়ানকে দশ হাজার টাকা করে দেবেন। এইদিনই রাজ্যসরকার শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে সত্যজিৎ রায় এবং শ্রেষ্ঠ প্রযোজক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনা বিভাগ এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে আমাকে

ও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে অর্পণা সেনকে পুরস্কৃত করেন। এই দিন আমি প্রকাশ্যে বলেছিলাম, আগে ঠিক ছিল টেকনিসিয়ান এবং মেক-আপ ম্যানদেরও পুরস্কার দেওয়া হবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কাজে তা করা হলো না—

সেদিন পুরস্কার নিতে গিয়ে কথায় এক আর কাজে আর এক এই নীতির ব্যাপারে আমার মন প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল। রাজ্যসরকার আমার পুরস্কার হিসেবে আমাকে ৫০০০ টাকা দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি সেই টাকা দুঃস্থ কলাকুশলীদের সাহায্য তহবিলে দিয়ে নিজেকে ধন্য করেছিলাম।

এই সালের ৩০শে এপ্রিল গ্র্যাণ্ড হোটেলে ফিল্ম ফেয়ার পারিতোষিক বিতরণ উৎসব হয়েছিল। কোলকাতায় এই সময় অনুষ্ঠিত হলো ফিল্ম ফেয়ার কাপশান। 'অমানুষ' ছবির শ্রেষ্ঠ প্রযোজক হিসেবে শক্তিবাবু অর্থাৎ শক্তি সামন্ত এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে আমি পুরস্কার গ্রহণ করেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী মায়া রায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আবার এই সালের জুন মাসে চলচ্চিত্র প্রসার সমিতি ঐ 'অমানুষ' ছবির জন্য আমাকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান দিয়েছিল রবীন্দ্রসদনে। বেণুও পুরস্কৃত হয়েছিল। আমি আর বেণু গিয়ে সেই পুরস্কার গ্রহণ করেছিলাম। আগেই বলেছি, বেণু সব সময় আমাকে লতার মত জড়িয়ে রেখেছিল আর আমিও তাকে রেখে বিশেষ কোথাও যেতাম না।

১৯৭৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী টালিগঞ্জের টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে চলচ্চিত্র শিল্প সংক্রান্ত একটি সম্মেলন ডাকা হয়। সেই সম্মেলনে আমরা সকলেই উপস্থিত ছিলাম। উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রতবাবু অর্থাৎ সুব্রত মুখার্জী ও সংসদ সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী। সুব্রতবাবু বলেছিলেন, চলচ্চিত্র উন্নয়ন পরিষদ তৈরি হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। এই পর্ষদ তৈরি করেছিলেন তদানীন্তন রাজ্যসরকার। সুব্রতবাবু বলেছিলেন, এই পর্ষদের পুনর্গঠন করা হবে। পর্ষদের কলেবর ছোট না করা পর্যন্ত নাকি কোন গঠনমূলক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি আরও বলেছিলেন, রাজ্যে বাংলা ছবি বাধ্যতামূলক প্রদর্শনের যে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল সেই প্রস্তাব মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়েছে। একটা বিলও বিধান সভায় আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই সময়ে দুটি সিনেমা হাউস বন্ধ ছিল, সেই দুটি সিনেমা হাউস রাজ্যসরকার হাতে নেবেন বলেছিলেন। বেঙ্গল মোশান পিকচার্স এমপ্লইজ ইউনিয়নের সভাপতি, সংসদ সদস্য হীরেন মুখার্জী মশাই ছিলেন সেদিনের সম্মেলনের প্রধান অতিথি। হীরেনবাবু বলেছিলেন, এই শিল্পের সংগে জড়িত কর্মীদের জন্যে রাজ্যসরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা যেন রাখা হয়।—

আমিও সেদিন পরিষ্কার বলেছিলাম, প্রমোদকর থেকে সরকার যে রাজস্ব পান তার পঞ্চাশ শতাংশ চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের কাজে যদি ব্যয় করেন তবেই এই শিল্পের উন্নতি অন্তত কিছুটা সম্ভব, সেদিন রাজ্যসরকারের কাছে এটাই ছিল আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।

অথচ আমি জানি আমরা যত কথা বলি তার চাইতে কাজ করি অনেক কম। আমরা প্রতিশ্রুতি যত সহজে দিতে পারি ঠিক তত সহজে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারি না। আমরা সামগ্রিক কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারি না, কিন্তু ক্ষমতা থাকলে স্বজন-পোষণ করি। আমাদের চলচ্চিত্র জগত নিয়ে এমনি কত ভাষণ—কত প্রতিশ্রুতি শুধু দেওয়া চলছে অথচ এর সামগ্রিক উন্নতির ব্যাপারে বিশেষ কিছু আজও হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

ছবির কাজ আবার তারই মধ্যে শিল্পী সংসদের কাজ আর এরই মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিজের একান্ত নিজের জগতের কাজ নিয়ে আমি দিশেহারা। আমার প্রতিটি মুহূর্ত যেন বিক্রি হয়ে গেছে। একটি মুহূর্ত যে আমার নিজস্ব মুহূর্ত যে মুহূর্তটিতে আমি নিজেকে নিয়ে ভাবতে পারি, নিজেকে নিয়ে বিভোর থাকতে পারি এমন অবস্থা নেই। এরই মধ্যে আমি আছি—এটাই বড় কথা। সব সময় একটা মেকি হাসির আবরণ মুখে টেনে থাকতে হচ্ছে আমাকে। মাঝে মাঝে একটু মানসিক শান্তির জন্য, একটু রিলিফের জন্য আমার ভিতরটা ভীষণ ছটফট করত। তাই কোথাও কোন পার্টি থাকলে আমি তা বাদ দিতাম না বললেই হয়। আমাদের জগতের মানুষরা, যে মানুষদের সংগে আমার ব্যবসার সম্পর্ক, আমার অর্থনৈতিক সম্পর্ক—তাঁরা যদি কোন পার্টিতে আমাকে চান আমি কখনই তাঁদের মুখের ওপর না বলতে পারি না। আমি কারও মুখের ওপর না বলতে পারি না। কি জানি কেন আমি পারতপক্ষে কাউকে আঘাত করতে পারি না। মাঝে মাঝে এই পার্টিতে আমি নিজেকে অসুস্থ করে তুলি।

মাঝে মাঝে যখন শরীরটা খারাপ হতো বেলভিউতে চলে যেতাম। প্রয়োজন হলে সুনীলদাকে অর্থাৎ ডাক্তার সুনীল সেনকে ডেকে পাঠাতাম।

মাঝে মাঝেই আমি শুনতে পেতাম আমাকে কেন্দ্র করে কিছু রটনা চলছে। মাঝে মাঝেই রটত—উত্তমকুমার মরে গেছে—,মাঝে মাঝে রটত—উত্তমকুমার অসুস্থ—।

এই সব রটনায় সংবাদপত্রগুলো ভীষণ বিব্রত হতো। আমি বুঝতে পারতাম, এটা খ্যাতির বিড়ম্বনা। ভাবতাম, কেন রটে এ সব! কে রটায় এ সব।

১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন আনন্দবাজার পত্রিকায় বেরুল—"উত্তমকুমার ভাল আছেন—"

আগের দিন গোটা শহরে রটে গিয়েছিল আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। সব কাগজে ঘন ঘন ফোন গিয়েছিল। ঘন ঘন বেলভিউতেও ফোন গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আনন্দবাজারের সাংবাদিকরা ডাক্তার সুনীল সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার কথা কাগজের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

এবার কিন্তু সত্যি সত্যিই আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।

ইদানিং আমাদের দেশে অনেক নতুন নতুন রোগ আসছে। কিছু কিছু মানুষ অসময়ে মারা যাচ্ছেন—অথচ এই সায়েন্সের অত্যুজ্জ্বল যুগে, এই বিরাট শহরে চিকিৎসার তেমন কোন সুব্যবস্থা নেই। না আছে ওষুধ, না আছে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি। বিশেষ করে যারা গরীব তাদের জন্যে তো কিছুই নেই হাসপাতালগুলোতে, এটা মাঝে মাঝেই শুনতে পাই। কাগজে হাসপাতালের সব রকম অব্যবস্থার কথা পড়ি। যাঁরা প্রভূত অর্থের অধিকারী তাঁরা তো তুড়ি মেরে বিলেত-আমেরিকা থেকে ওষুধ আনাতে পারেন, কিন্তু যাঁরা তা নন তাঁদের মরতে হয়। এই তো আমাদের দেশ! এসব আমি ভাবি আর আমার মন খারাপ হয়; তবুও এই আমি একটু অসুস্থ হলেই চলে যাই বেলভিউতে। আমি অনায়াসেই বেলভিউ-এর মত স্বর্গে রোগ সারাতে যেতে পারি আর ওঁরা যান নরকে চিকিৎসার আর্জি নিয়ে। অথচ আমি কোন মতেই ওঁদের মত হতে পারি না, কারণ আমার অসুস্থতা মানে অরুণকুমার অথবা ছোটবেলার উত্তমের অসুস্থতা নয়, উত্তমকুমারের অসুস্থতা; যে উত্তমকুমার প্রযোজকদের টাকা নিয়ে কাজ করে, যে উত্তমকুমারের ওপর বাংলা ছবির অনেকটা নির্ভর করছে; সুতরাং উত্তমকুমার কথায় কথায় বেলভিউতে যেতে পারে তাই বলে তার ভিতরকার মানুষটা যারা বিনা চিকিৎসায় মরে তাদের কথা ভাবে না তা নয়। ইদানিং আমি দেখতাম কত লোকের গলায় চামড়ার কলার বাঁধা। পরে জেনেছিলাম ওটা নার্ভের অসুখ। স্পনডালাইটীজ। একদিন হঠাৎ এই সালের জুন মাসে ঐ রোগ আমার কাঁধে-ডান হাতে এসে ভর করল। ঘাড়ে-ডান হাতে ভীষণ যন্ত্রণা। মুখটা না পারি এ দিকে ঘোরাতে না পারি ওদিকে ঘোরাতে ঘাড় সমেত। কটা দিন কাজ করতে পারলাম না। অগত্যা চিকিৎসাও শুরু হ'ল—তারপরই ঐ রটনা।

সবাই বিব্রত হলেন। ডাক্তার সুনীল সেন শেষ পর্যন্ত সেই রোগ থেকে আমাকে সুস্থ করে তুললেন। সুনীলদাই কাগজে স্টেটমেন্ট দিলেন—"হি ইজ অ্যাবসোলিউটলী অল রাইট"—

এর মধ্যে আমার মারাত্মক পক্সও হয়ে গিয়েছিল।

মাঝে মাঝে আমি আমার বাল্যবন্ধু লালুর চেম্বারের গোড়ায় গাড়ি থামিয়ে ওর কাছে গিয়ে বলতাম,—লালু প্রেসারটা একবার দেখে দে—

লালু প্রেসার দেখে দিত। অনেক জ্ঞান দিত। আমি মনে মনে হাসতাম আর বলতাম, তুই যদি উত্তমকুমার হতিস আর আমি যদি লালু ডাক্তার হতাম তা হলে তুইও আমার জ্ঞান শুনে হাসতিস—

এই সালে অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিল শনিবারটি সত্যিই স্মরণীয়। যে হেতু আমি ভারতবাসী সেই হেতু ভারতের অগ্রগতিতে আমার গর্বিত হবার কথা। এই দিনটি ভারতের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে চিরকাল সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। এইদিন ভারতের প্রথম উপগ্রহ "আর্যভট্ট" মহাকাশের দিকে যাত্রা করে।

ভারতের এই অগ্রগতি আমাকে যেমন তৃপ্তি এনে দিয়েছিল তেমনি এই সালে ভারতের কৃতি সন্তান সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মৃত্যু-সংবাদ আমাকে ব্যথিত করেছিল চরম। আবার এই বছরেই যখন আমাদের বাংলা ছবির জনক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে জানতে পারলাম তখন খুশি হয়েছিলাম। একটা কথা ভেবে দুঃখ পাই, আমাকে দেশে গুণীর মর্যাদা দেওয়া হয় বটে, তবে কেউ কেউ সেই মর্যাদা—সেই স্বীকৃতি পান এত দেরীতে যখন তাঁর জীবন অবসানের মুহূর্ত! ধীরেন্দ্রনাথ তেমনি। ধীরেন্দ্রনাথ ফালকে পুরস্কার পেয়েছিলেন কিন্তু উপভোগ করতে পারেননি।

একদিকে ছবির কাজ অন্যদিকে বম্বে-কোলকাতা তার মধ্যে কখনও আউট-ডোর আবার কখনও ইনডোর এর মধ্যে ময়রা স্ট্রীটের বাড়ির অভ্যন্তরীণ আর ওদিকে ভবানীপুরের বাড়ির নানা ভাবনা নিয়ে আমার দিনগুলো কেটে যেতে লাগল। আমার অনেক কাজ অনেক ভাবনার অংশীদার হিসেবে অসীমকে অর্থাৎ অসীম সরকারকে অনেক কাছে পেয়েছি। তেমনি আর যাদের অনেক কাছের মানুষ হিসেবে আমার মনে হয়েছে তাদের দু'একজনের কথা এখানে বলা দরকার বৈকি।

প্রথমেই মণ্টুদির কথা বলি। একবার আমরা অর্থাৎ আমি আর বেণু গিয়েছিলাম নৈনিতাল। সেই নৈনিতালে একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে এই ভদ্রমহিলার সংগে আলাপ। মহিলার আসল নাম সুচিত্রা চক্রবর্তী। ইনি পাহাড়ীদার, পাহাড়ী সান্যালের বিশেষ পরিচিতা। ভাগ্নী। ভদ্রমহিলার বোধহয় তখন সবে বিয়ে হয়েছে এবং স্বামীর সংগে গেছেন বেড়াতে।

রাশীকেতের ওয়েষ্টার্ণ হোটেলে আমরা উঠেছিলাম, ভদ্রমহিলারাও ওখানে গিয়েছিলেন। আমরা আমাদের রুমে আছি, পাহাড়ীদা এবং আর দু'একজন সেই সংগে এই ভদ্রমহিলা এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। যদিও বিস্তারিত কিছুই বলতে পারছি না, তবুও এইটুকু বলতে পারি ভদ্রমহিলাকে প্রথম দেখেই আমি চমকে উঠেছিলাম। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়েছিলাম তাঁর দিকে। বুঝতে পারছিলাম আমার এইভাবে তাকিয়ে থাকা দেখে মহিলা মনে মনে আমাকে ভীষণ নির্লজ্জ ভাবছিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন উনি কিছুতেই আমার সামনে সহজ হতে পারছিলেন না, তখন আমিই ভদ্রমহিলাকে বলেছিলাম, আমার এইভাবে তাকিয়ে থাকাটাকে নিশ্চয়ই আপনি বরদাস্ত করতে পারছেন না—

মহিলা তখন বিশেষ কথা বলেননি। বুঝতে পেরেছিলাম, উত্তমকুমার নামে এই সিনেমার বিরাট লোকটি তাঁর চোখে যতখানি ভাল আবার এই উত্তমকুমার প্রসঙ্গে তাঁর মনে ততখানি আতঙ্ক! আমি নাকি মানুষটা খুব ভাল নই এমন একটা ধারণাও ছিল। ভদ্রমহিলাকে বলেছিলাম, আমি আপনাকে দেখে অমন করে তাকিয়ে ছিলাম কেন জানেন? আপনাকে এই ঘরে ঢুকতে দেখেই আমি চমকে উঠেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল আমার এক দিদি ছিল পুতুলদি, সে আসছে আমার দিকে, আপনাকে ঠিক আমার পুতুলদির মত দেখতে!

সেই থেকে ভদ্রমহিলা অর্থাৎ মন্টুদি আমার সঙ্গে এমন করে মিশতে শুরু করেছিলেন যা এখনও ভাবলে অবাক হতে হয়! এই মন্টুদি এখন আর তেমনি নতুন বৌটি নন, তিনি ঘোরতর সংসারী অথচ আমার প্রতি তাঁর যেন জন্ম-জন্মান্তরের টান। আমি যেন তাঁর আপন ভাই। ইনিও আমার কম সেবা-যত্ন করেননি। ইদানিং প্রতিদিনই আমি যখন শুটিং করতে স্টুডিওতে যাই মন্টুদিও সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে থাকেন। মন্টুদি যেহেতু আমার মন্টুদি সেইহেতু আমাদের স্টুডিও মহলেও তিনি সবার জানা-চেনা মন্টুদি! আমার একটা ভয় হয়—এই মন্টুদির সংগে আমার যে সম্পর্ক তা বেণু জানে বলে বেণুর কাছে মন্টুদি অবশ্যই মন্টুদি হতে পেরেছেন, কিন্তু সবাই তাঁকে সেই শ্রদ্ধার সংগে দেখেছেন কিনা আমি তা জানি না।

পৃথিবীতে জন্ম নিলে এই পার্থিব জীবনে এমন অনেককিছু আছে যা চাইলে পাওয়া যায় না, এমন অনেকেই আছে যাকে আপন করতে চাইলেই আপন করা যায় না, আবার এমন কিছু আছে যা না চাইতেই পাওয়া যায়। এমন অনেকেই আছেন যিনি অতি সহজে আপন হয়ে যান। সংসারের আর পাঁচজন

আপনজনের চাইতেও বেশী! মন্টু দি তেমনি! জানি না মন্টুদিকে আমি আমার পুতুলদির মতই ভালবাসতে শ্রদ্ধা করতে পেরেছি কিনা। অনেকেই হয়তো আমাদের এই সম্পর্ক প্রসঙ্গে ভিন্ন ধারণা করতে পারেন, কিন্তু আমি তো জানি মন্টুদি কতখানি আপন আমার কাছে।

এই ১৯৭৫ সালের একটি মধুর স্মৃতির কথা বলি। মাঝে মাঝে এইসব ঘটনা আমার জীবনে ঘটে বলেই বোধহয় আমি মানসিক যন্ত্রণাগুলো থেকে মুক্তি পাই। সেদিনের তারিখটা ছিল ২১শে সেপ্টেম্বর। বম্বের বিলাসবহুল হোটেল সান এ্যাণ্ড স্যাণ্ডের পাশে জুহু বীচে এক বর্ণাঢ্য উৎসবের আয়োজন। চোখের সামনে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ আর মাথার ওপরে তখন ক্যাকাশে ধূসর আকাশ। ভরা বর্ষা। তবুও নানা রঙের আলোকমালায় চতুর্দিক আলোকিত। মুখর উৎসব। 'অমানুষ' ছবির সর্বভারতীয় হিন্দি ভার্সানের রজত জয়ন্তী উৎসব। সেই সংগেই 'আনন্দ' ছবিরও রজত জয়ন্তী। এই ছবির প্রযোজক গিরিজাবাবু। গিরিজা সামন্ত। পরিচালক শক্তিবাবু। শক্তি সামন্ত। একই পরিচালকের দুটি ছবির রজত জয়ন্তী একই দিনে একই জায়গায় হওয়াটা যেমন নতুন তেমনি অভিনব বৈকি। একটি ছবিতে আমি আর শর্মিলা, অন্য ছবিতে রাজেশ খান্না আর জীনত আমন। আমরা এবার সবাই এই একই উৎসব আঙ্গিনায়। শুধু আমরা কেন, বম্বের চিত্রজগতের দিকপালেরা সবাই আমন্ত্রিত অতিথি। রোশনলাল মালহোত্রা, বি. আর. চোপড়া, মোহনকুমার, প্রমোদ চক্রবর্তী, শ্রীরাম ভোরা, ধর্মেন্দ্র, হেমা মালিনী, দিলীপকুমার, অশোককুমার, সায়রা বানু, ডিম্পল খান্না, রাজকুমার, বিনোদ খান্না, অমিতাভ বচ্চন, এফ. সি. মেহেরা, রামানন্দ সাগর, জীনত আমন, প্রেমনারায়ণ, প্রেম চোপড়া, অসিত সেন, ব্রিজ, গুলশান নন্দা, কমলেশ্বর, গৌরীদা অর্থাৎ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, গিরিজা সামন্ত, দাদাজী, নিরুপমা রায়, সিপ্পল কাপাডিয়া, রঞ্জন বসু, শচীন ভৌমিক, তরুণ ঘোষ, মদনমোহন, দেবেশ ঘোষ, বেচু, সোমা আরও অনেকেই। সে যেন মহা সম্মেলন। এই বিরাট এবং বর্ণাঢ্য উৎসবে দিলীপকুমার, শক্তিবাবু আর আমাকে নিয়ে যে বক্তৃতা দেন তা সকলেই উপভোগ করেন। আমার বেশ মনে আছে, দিলীপবাবু বলেছিলেন, Uttam is Uttam। উত্তমকুমারের মত মহান শিল্পীকে আজ এই মঞ্চে সর্বসমক্ষে অভিনন্দন জানাতে পেরে আমি খুশি, আমি প্রায় ওঁর সব বাংলা ছবি দেখেছি—It is simply wonderful—সচমুচ উত্তমসাহাব-না জবাব কলাকার হ্যায়—; এই ভাষণের পর সবাই হাততালি দিয়ে সেদিন যেভাবে অভিনন্দিত করেছিলেন তা কখনই বিস্মৃত হব না। সেই দিন সেই অভিনন্দনের উত্তরে আমি যা বলেছিলাম তা হলো এই রকম—

আপনারা জানেন দীর্ঘদিন আগে 'ছোটাসি মুলাকাত' নামে একটি ছবি করেছিলাম এখানে। ছবিটির প্রযোজকও ছিলাম আমি এবং সেই ছবি করতে গিয়ে সম্পূর্ণ অসফল হই প্রযোজক এবং অভিনেতা হিসেবে। হিন্দি ছবির দর্শক মোটেই আমাকে গ্রহণ করেন নি, তাই শক্তিবাবু হিন্দির জগতে আমার মত ফ্লপ নায়ককে যখন দীর্ঘদিন বাদে আবার হিন্দিতে কাজ করতে বলেন তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম, জীবন মধ্যাহ্নে আমি কি আপনার সম্মান রাখতে পারব? তখন তার জবাবে শক্তিবাবু বলেছিলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি শ্রেষ্ঠত্বেরই সম্মান পাবেন—আজ সে সম্মান আমি সত্যিই আমার ঈশ্বর আর শক্তিবাবুর কৃপায় পেয়েছি—চিরকৃতজ্ঞ এই সুযোগের জন্যে—

এই অনুষ্ঠানেই শক্তিবাবু ঘোষণা করেছিলেন, শক্তি ফিল্মস, সামন্ত এন্টারপ্রাইজ ও শক্তিরাজ ডিষ্ট্রিবিউটার্স-এর পক্ষ থেকে এক্মাস করে বোনাস ও নটরাজ স্টুডির কর্মী ফাণ্ডে দশ হাজার টাকা দান করব। আমি আর শর্মিলাও শক্তি ফিল্মস-এর সব কর্মীদের এক মাস করে বোনাস দিতে পেরে ধন্য হয়েছিলাম।

'ছোটাসি মুলাকাত' ছবির সময় আমার মানসিক যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে আমাকে কথায় কথায় প্লেনে করে বম্বে-কোলকাতা করতে হতো। সেই সময় একবার প্লেন প্রসঙ্গে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল আমার। সেই থেকে তের বছর আমি প্লেনে চড়িনি। ইদানিং আমি আবার খুব প্লেনে চড়ছি।

এরপর একের পর এক ছবির অফার আসতে থাকল। আমিও শুধু কাজের নেশায়, টাকার নেশায় একের পর এক ছবিতে সাইন করতে থাকলাম। ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর '৭৪ আমি যে ছবিগুলির জন্য চুক্তিবদ্ধ হই সেগুলি হচ্ছে—'ডাক্তার' (ডবল ভার্সান)। এ ছবির প্রযোজক, পরিচালক শক্তি সামন্ত। 'এখানে পিঞ্জর'-এর হিন্দি। প্রযোজনা-পরিচালনা অরবিন্দ সেন। এফ. সি. মেহেরা ও আলো সরকার একটি ছবির জন্য আমাকে চুক্তিবদ্ধ করেন। সেই ছবির নায়িকা ছিলেন হেমা মালিনী। সত্যেন বসুর ছবি 'অপরাহ্নের আলো'। এর কাহিনীকার ছিলেন স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। শক্তি সামন্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত 'স্ত্রী'। আমার অত্যন্ত প্রিয় একদিকে ভাই অন্যদিকে প্রিয়তম বন্ধুর মত সাংবাদিক-পরিচালক অজয় বিশ্বাসও তাঁর ছবির জন্য আমাকে চুক্তিবদ্ধ করেন এই ৬ দিনের মধ্যেই।

আবার কোলকাতায়। আবার কোলকাতায় এসে কাজ করছি। এই সালের ১৩ থেকে ২৭শে ডিসেম্বর কোলকাতার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গ্লোব সিনেমায় মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন মানিকবাবু অর্থাৎ সত্যজিৎ রায়। মমতাশঙ্করের ভারতনাট্যম্ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এইদিন উপস্থিত অভ্যাগতদের মধ্যে ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, এস. এল. জালান, কানন দেবী, হরিদাস ভট্টাচার্য, কানাই বসু, সুব্রত মুখার্জী, ফুলু অর্থাৎ সৌমিত্র চ্যাটার্জী, ভূপেন হাজারিকা, তরুণ মজুমদার, সন্ধ্যা রায়, হৃষিকেশ মুখার্জী, প্রণব বসু, আমিও। আমাদের বাংলা চলচ্চিত্র জগতে দু'জন প্রণব বসুর নাম অনেকেই জানতে পেরেছেন। এই প্রণব আমার অত্যন্ত স্নেহের, সত্যিকথা বলতে কি আমার ভাই। আমি ওকে আন্তরিক ভালবাসি তার একমাত্র কারণ, ওর মত পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান, হৃদয়বান ছেলে আমার নজরে বিশেষ পড়েনি। ও যখন কাজ করে তখন যদি কড় ওঠে ইচ্ছে করলে কড় থামিয়ে কাজ সেরে নিতে পারে! মাঝে মাঝে আমি দেখেছি প্রণব হয়তো আমার ময়রা স্ট্রীটের বাড়িতে এসেছে—আমি হয়তো দু'মিনিট সময় চেয়ে নিয়েছি—এসে দেখি ঐ দু'মিনিটের মধ্যে প্রণব ঘুমিয়ে পড়েছে। অতবড় পরিশ্রমী ছেলে দেখিনি। একদিকে চণ্ডীমাতা ফিল্মসের যাবতীয় দায়িত্বপূর্ণ কাজ অন্যদিকে আবার প্রসাদের মত বড় কাগজের সর্বেসর্বা। তার ভিতরে একাধিক ছবি আবার প্রযোজনাও করেছে! যা হোক, এই চলচ্চিত্র উৎসবে ইউকের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন জন ওয়ারিংটন; বিল ডগলাস। কানাডার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ডঃ সহদেব গুপ্ত। ইতালীর প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন—নিকো জুকেলি।

এই সময় বিদেশী প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনার জন্য ই. আই. এম পি. এ. একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করেছিলেন। এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সেদিন উপস্থিত ছিলেন বসু চ্যাটার্জী, মৃণাল সেন, সারদা প্রভৃতি। বেণু ও আমিও ছিলাম বৈকি! এসবের মধ্যে আবার সমানে শুটিং চালিয়ে গেছি 'ভোলা ময়রা' ছবির। এর কাহিনী ও চিত্র নাট্যকার ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর বিভূতি মুখোপাধ্যায়। পরিচালক ছিলেন পীযূষ গাঙ্গুলী। এর মধ্যে আউটডোর তো আছেই। 'ভোলা ময়রা'র শুটিং করতে করতেই ঝাড়গ্রাম। ঝাড়গ্রামে 'রাজবংশ' ছবির শুটিং করেছি। এই ছবির পরিচালক পীযূষ বসু।

আরও অনেক অনেক ঘটনার ভিতর দিয়ে শেষ হয়ে গেল ১৯৭৫ সাল। এল ১৯৭৬। কিন্তু এর মধ্যে অনেক কথাই আগে বলা হয়েছে। সব কথার মধ্যে যে কথাটি বলা দরকার আবার নতুন করে তা হলো সোমার বিয়ে। আমি কন্যা সম্প্রদান করেছিলাম সেদিন। ও যখন আমাদের প্রণাম জানিয়ে শ্বশুর-বাড়ির ঘর করার জন্যে চলে যাচ্ছিল আমার দু'চোখে সেদিন জল এসেছিল। এই বিবাহ অনুষ্ঠানে সেদিন আমাদের চলচ্চিত্র ক্ষেত্রের অনেকেই এসেছিলেন নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে। কারা কারা এসেছিলেন তার বিস্তারিত তালিকা দেবার প্রয়োজন বোধ করছি না, তবে এই মুহূর্তে যাঁদের কথা মনে করতে পারছি তাঁরা হলেন, মাণিকদা অর্থাৎ সত্যজিৎ রায়, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, চণ্ডীমাতা ফিল্মসের কর্ণধার সত্যনারায়ণ খাঁ, প্রণব বসু, দিলীপ খাঁ, মিঠু মুখার্জী, মঙ্গল চক্রবর্তী, রঞ্জিত মল্লিক, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী, সলিল দত্ত, সলিলবাবুর স্ত্রী সীতালি দত্ত, সন্ধ্যা রায়, দেবেশ ঘোষ আরও অনেকে।

সোমা চলে যেতে আমাদের ময়রা স্ট্রীটের ফ্ল্যাটটা ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। বেণু বেশ মুষড়ে পড়েছিল। বেণুর ঐ একমাত্র সন্তান। চোখে চোখে রেখেছিল; ওকে হাসিতে খুশিতে ভরিয়ে রাখার কোন ত্রুটিই সে রাখেনি। আমরা যেখানে যেতাম সোমাও আমাদের সংগে যেত। সেই সোমা শ্বশুর বাড়িতে চলে গেছে এতে মা হিসেবে বেণু যে মনঃকষ্ট পেয়েছিল তা বলার নয়। তারপর নিজেকে সহজ করে নিয়েছিল।

২৬শে জানুয়ারী সোমার বিয়ে হয়ে গেল, তার মাত্র দু'দিন কাটতে না কাটতে শুনতে পেলাম অচিন্ত্যবাবু মারা গেছেন। ২৯শে জানুয়ারী সুসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মারা গেলেন। মনটা ভীষণ ব্যথিত হ'ল এই সংবাদে। আরও বেশী ব্যথা পেয়েছিলাম সেইদিন যেদিন চাসনালা খনি দুর্ঘটনায় ৩৭১ জন মানুষের মারা যাবার খবর পেলাম। এক সংগে এতগুলো তাজা প্রাণের মৃত্যু-সংবাদে আমি কিছুতেই মন দিয়ে কাজ করতে পারিনি।

যখনই কাজ করি তখনই একটা করে মৃত্যু-সংবাদ আমাকে আঘাত করে। আবার সহজ করি নিজেকে এই ভেবে, মৃত্যু একমাত্র সত্য। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বাংলা চলচ্চিত্রের দিক্‌পাল চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটক, গোষ্ঠ পালের মতো খেলোয়াড়, বম্বের প্রখ্যাত প্রযোজক গিরিজা সামন্ত, আমাকে যিনি সবচাইতে বেশী আপন করে নিয়েছিলেন, জগৎবল্লভপুরে যাঁর

বাড়িতে আমি বার বার যাই, মানুষের কল্যাণে যিনি অনেক কল্যাণকর কাজ করেছেন সেই নারায়ণ খাঁ অর্থাৎ আমার অগ্রজপ্রতিমের মৃত্যু আমাকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে। তবুও তারই মধ্যে কাজ করে গেছি।

এর মধ্যে আমার পারিবারিক কর্তব্যের কোন অবহেলা ছিল কি না আমি জানি না। প্রতি বছর হোলির দিন সবাই আমাকে নিয়ে যেমন আনন্দ করে আমি সবাইকে নিয়ে যেমন করে আনন্দ করি তাও করেছি এবার। গিরিশ মুখার্জী রোডের বাড়িতে রঙে রঙে রাঙিয়েছি সবাইকে। গৌতম, শুব্রতা, আমার ভাই পেল্টু অর্থাৎ বরুণ, বুড়ো, গৌরী সবাইকে রঙে রঙে রাঙিয়েছি। মায়ের পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করেছি।

১৯৭৬ সালের ৯ই মে আমি বসুশ্রী সিনেমায় গিয়ে প্রসাদ পত্রিকার গিরীন্দ্র ও দেবকী বসু স্মৃতি পুরস্কার অনুষ্ঠানে আমার শ্রদ্ধেয়া শিল্পী কানন দেবীর হাতে তুলে দিয়েছি দেবকী বসু স্মৃতি পুরস্কার। আবার প্রতি বছরের মত এবারও বসুশ্রী সিনেমায় ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠানে গিয়ে সবার সংগে মিলিত হয়েছি। এরই মধ্যে আবার আমার অত্যন্ত প্রিয় অজয় বিশ্বাসের আমন্ত্রণ রক্ষা করেছি। গেছি বসন্ত মিলনীর বাৎসরিক অনুষ্ঠানে। হাত পেতে গ্রহণ করেছি নারায়ণ খাঁ স্মৃতি পুরস্কার। তারই মধ্যে সমানে অভিনয় করে চলেছি একটার পর একটা ছবিতে। এই বছরে শুরু হয়েছিল 'ধনরাজ তামাং', 'ব্রজবুলি', 'রাজবংশ'। শুটিং পূর্বোক্তমে চলছিল 'সেই চোখ'-এর। আর সবে শেষ করেছি প্রণব বসুর 'অসাধারণ', 'হোটেল স্নো ফক্স', 'বহ্নিশিখা', 'মোমবাতি', 'ভোলা ময়রা', 'চাঁদের কাছাকাছি', 'সিস্টার', 'আনন্দমেলা'। ওদিকে ছুটছি বম্বে। এই সময় খালো সরকারের 'বন্দী' ছবিতে কাজ চলছিল। ৬ই নভেম্বর আন্ধেরীর নটরাজ স্টুডিওতে শুটিং করেছি 'বন্দী' ছবিতে, আবার ৭ই নভেম্বর এই একই স্টুডিওতে শুটিং করেছি 'আনন্দ আশ্রম'-এর ডবল ভার্সান। দিন আর রাত শুটিং। আমি দিশাহারা! আমি যেন টাকার পিছনে ছুটছি।

এই বছরটা তবুও আমার বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকল। এই বছরের শেষ দিক থেকে আমার ভাগ্যের আকাশে জমা হতে থাকলো কালো মেঘ।

হঠাৎ অনেক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকল "বয়কট উত্তমকুমার"। আমি ব্যাপারটা একদম বুঝতে পারিনি প্রথম প্রথম। আমি বুঝতে পারিনি বম্বের নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে বয়কট করেছেন। আমি কোন ছবিতে থাকলে তাঁরা সেই ছবিতে কাজ করবেন না। ইতিমধ্যে আমার কানে এল, 'বন্দী'র নায়িকা রাখীর পরিবর্তে কাজ করবেন সুলক্ষণা পণ্ডিত! আমি তখনও এ সবের খবর রাখতাম না। একদিন অজয় বিশ্বাসই আমাকে

খবরটা দিল। সে জানাল, বম্বের অনেকেই নাকি আমাকে বয়কট করেছেন! বোম্বাইয়ের চিত্র জগতে আমার আধিপত্য বিস্তার লাভ করুক তা ওখানকার শিল্পীরা চান না বলেই নাকি এই বয়কট!

প্রথম প্রথম আমি বিশ্বাস করিনি। অজয় বলাতেও বিশ্বাস করিনি, এমন কি আজও আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি না এই কারণে যে, আমি ভাবতেও পারি না কোন শিল্পী কোন শিল্পীর শত্রু হতে পারে!

তবে এই খবরে আমি গর্বিত হয়েছিলাম। আরও বেশী গর্বিত হয়েছিলাম এই বছর কানন দেবী দাদাভাই ফালকে পুরস্কার পেয়েছেন শুনে।

২৭শে আগস্ট মুকেশের মৃত্যু আমাকে ভীষণ কষ্ট দিল। ৩১শে অক্টোবর শচীনদেব বর্মণের মৃত্যুও তাই।

২৬শে নভেম্বর মারা গেলেন বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় সন্তোষ মজুমদার, যাঁকে আমরা ছোনেদা বলে ডাকতাম! ছোনেদার মৃত্যুতেও আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম।

এরপর আমার মন ভাঙ্গার পালা আসতে থাকল। একটা করে ছবি রিলিজ হয় আর সেই ছবি বিন্দুমাত্র সাড়া তুলতে পারে না। সত্যি করে বলতে গেলে, একটা করে ছবি রিলিজ হয় আর ফ্লপ করে! ছবিগুলো তো ছোটখাট নয়, বড় ছবি। আমাকে নিয়ে ছবি করলে নাকি সেই ছবিকে বড় ছবি বলা হয়। তার উপরে কটা রঙিন। এই একটি করে ছবির অসাফল্য আর আমার একটি করে সোপান নেমে আসা। ভীষণ ভয় পেতে থাকলাম। 'অসাধারণ' সম্পূর্ণ ফ্লপ করল শুনতে পেলাম। তারপরই একে একেই অনেক ছবি। 'হোটেল স্নো ফক্স', 'সিস্টার', 'আনন্দমেলা', 'চাঁদের কাছাকাছি' এই ছবিগুলো আমার মনটাকে ভেঙ্গেচুরে তালগোল পাকিয়ে দিতে থাকল! আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর কোন ছবিটাই খারাপ হয়নি। তবুও আমি ধৈর্য হারাইনি। আমার বাংলা ছবির কোন প্রযোজকরাই আমাকে ভুলে যাননি। তবে অনেকের মনেই সংশয় দেখা দিয়েছিল নিশ্চয়ই!

উত্তমকুমার ডেড্ এমন একটা সংশয়! যা হোক নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে আমি শেষ করে দিলাম ১৯৭৬ সাল!

❋

তিরিশ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বকালের অবসান হয়ে গেল। কেন্দ্রে জনতা সরকার আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। ৩১শে মে আমরা হারালাম আমাদের শ্রদ্ধেয় জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। ওদিকে কেন্দ্রে জনতা সরকার এসেই নতুন লেভী বসালো। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার প্রতি বছর প্রজাতন্ত্রের দিনে আমাদের দেশের জ্ঞানীগুণীদের যে সম্মানজনক উপাধি দেবার প্রথা চালু করেছিলেন, জনতা সরকার এসেই তা বন্ধ করে দিল। তাই ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী উপাধিগুলো বন্ধ হয়ে গেল ১৯৭৭ সাল থেকেই। কিন্তু ১৯৮০ সালে আবার ইন্দিরা গান্ধী ফিরে এসে সেই উপাধি দেবার প্রথা চালু করেছেন। নতুন করে চালু করার সংগে সংগে মাদার টেরেসা পেলেন সেই বিরাট সম্মান। যা হোক, এই সর্বনাশা লেভীর বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্য সারা ভারতের চিত্র জগতের দিকপালেরা জমায়েত হয়েছিলেন দিল্লীতে। এই প্রসঙ্গে ফিল্ম ইনকরমেশন ২৫শে জুনের সংখ্যায় লিখেছিল—

> "The Hon'ble Finance Minister, while presenting the budget in the Parliament on June '17, said, "The present system of taxing Cinematograph films is based primarily on the length and nature of the film and the number of Prints. I intend changing the basis and adopting the valuable Criterion, the revised duty being 10 percent adralorem. This is much fair Criterion."

নানা দিক থেকে চলচ্চিত্রের সংকট বিশেষভাবে আমার মনের ওপর একটা চাপ সৃষ্টি করতে থাকল। সেই সংগে বম্বে-কোলকাতায় Day and Night শুটিং। এর উপর আমার উপরি পুরস্কার শুধু একের পর এক ছবির অসাফল্য। এবার খবর পেলাম প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক আমার পরম শ্রদ্ধেয় নীতিন বসু পেয়েছেন দাদাভাই ফালকে পুরস্কার সেই সংগে আর একটি চমকপ্রদ সংবাদে আমার মন আনন্দে খুশিতে ঝলমল করে উঠল, তা হলো সোমা সন্তান লাভ করেছে। সোমা, আমাদের সেই চোখের মণি, আদরের কল্যাণীয়া সোমা মা হয়েছে! এর পাশাপাশি যখন শুনলাম প্রখ্যাত শিল্পী অতুলবাবু মারা গেছেন, আমি কষ্ট পেয়েছিলাম ভীষণ; কারণ আমি যে অঙ্কন শিল্পের একজন অন্ধভক্ত। ছেলেবেলায় ছবিও আঁকতাম আমি, সেই থেকে সব শিল্পীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা। এই সালটি যেন মৃত্যুর সাল। ১৫ই জুলাই হারিয়ে গেলেন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত সুরকার অনিল বাগচী, ১৯ জুলাই

আমাদের রেখে চলে গেলেন মলিনাদি—মলিনা দেবী ; ১লা আগস্ট চলে গেলেন জহর রায়—এক হাসির রাজা চলে গেলেন, চলে গেলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় সঙ্গীতজ্ঞ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়—চলে গেলেন ৮ই আগস্ট। ২৬শে সেপ্টেম্বর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন উদয়শঙ্কর, ২২শে নভেম্বর প্রখ্যাত তবলচী ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ সাহেব, কানাই দত্ত, ২৫শে ডিসেম্বর বছরের শেষ মুহূর্তে চলে গেলেন আমার প্রণম্য অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন ! এই একটা করে মৃত্যু আমার মনটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে থাকল। আমি এঁদের অনেকের সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম সেটাই আমার বড় পাওনা !

'৭৭-এর শেষ দিকে আমরা 'ধনরাজ তামাং' ছবির শুটিং করতে গিয়েছিলাম দার্জিলিঙ-এ। কিন্তু অসম্ভব কুয়াশা আর প্রাকৃতিক বিড়ম্বনায় যে কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে আসতে হয়েছিল সেই কাজ সমাপ্ত করার জন্ত আবার অসীম সরকার সদলবলে দার্জিলিঙ গেল, এবার অনেকদিনের জন্ত সেখানে থাকবার ব্যাপার। বলা দরকার আমরাও গেলাম। ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে টানা ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আমি দার্জিলিঙে শুটিং শেষ করে ফিরে এলাম।

এবার ১৯৭৮ সালের কথায় আসা যাক।

এই সালটি আমার কাছে স্মরণীয় অনেক কারণে, তার মধ্যে একটি হলো আমার ছেলে গৌতমের বিয়ে, যে বিয়ের কথা বলেছি আগেই। আমি বা আমরা কেউ আমার এই একমাত্র পুত্রের বিবাহে কোন কার্পণ্য করিনি। গৌতমের শ্বশুরবাড়ির তরফ থেকেও নিমন্ত্রণ পত্র ছাপা হয়েছিল। আগেই বলেছি আমার পুত্রবধূ কল্যাণীয়া সুমনা ছিলেন কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা, আবার এই সুমনাকে দত্তক কন্যা নিয়েছিলেন শ্রীশঙ্করকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। এই বিয়ের সময় কালীনাথবাবুর মা—শ্রীমতী পারুল দেবীই নিমন্ত্রণ পত্রে স্বাক্ষর করেন। বিয়ের বাসর ছিল ৫২ই, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড। কলকাতা-১৯।

গৌতমের বিয়ে হয় ১৯৭৮ সালের ১লা মার্চ!

আবার আমার সেই ব্যস্ততা। দশদিন কোলকাতায় থাকি তো বিশদিন বম্বে। দেখলাম, এইভাবে কাজ যখন করতেই হবে তখন বম্বেতে একটা স্থায়ী বাসস্থানের দরকার। এই সময়ে একাধিক ছবির শুটিং চলছিল আমার। তার মধ্যে অন্যতম হলো 'দেশপ্রেমী,' 'নিশান', 'খুদা', 'গঙ্গাহার'।

বম্বেতে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। হোটেলের যেমন অভাব নেই

তেমনি কারও টাকারও অভাব নেই। অভাব শুধু বাসস্থানের। তারই মধ্যে একটু চেষ্টা চালিয়ে আমি বাসস্থান কিনেই ফেললাম। পালি হিল-এ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে আবার এমন কেউ কেউ আছে, যাদের কোন আব্দার ফেলতে পারিনি। আমি কাউকে আঘাত করতে চাইনি কখনো। কারও মুখের ওপর না বলতে পারি না, আর এই না বলতে পারি না বলেই মাঝে মাঝে আর এক ধরনের মানসিক অস্থিরতা আমার দেখা দেয়। অনেক সময় অনেককে হয়তো বলি, অমুক সময়ে এস—তারা আসে, কিন্তু আমি তাদের সংগে দেখা করতে পারি না। আবার দেখা করি ক'দিন ঘুরিয়ে। বুঝতে পারি, যাদের ঘোরাচ্ছি অথবা বাড়িতে থেকেও যাদের জানিয়ে দিই আমি বেরিয়ে গেছি, অথবা যাদের ঘোরাই তাদের প্রতি অবিচার করছি, কিন্তু আমার মানসিক আর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির জন্যেই এটা করেছি। করে থাকি। আবার অনেক সময় টাকার প্রয়োজনটাকে উপেক্ষা করতে পারিনি, আবার সম্পর্কটাকেও না। এত ব্যস্ততার মধ্যে অজয় বিশ্বাসের ডায়মণ্ডহারবারের ইয়ং ফাইটার্সদের অনুষ্ঠানে অর্থাৎ কিশোরকুমার নাইটেও হাজিরা দিয়েছি। নিয়মিত শিল্পী সংসদের সভায় যোগ দিয়েছি। আবার কিছু কিছু যাত্রা-থিয়েটারও দেখতে গেছি আর পাঁচজন দর্শকদের মত!

যাই হোক, এই সালের যে মাসে খবর পেলাম অবধূত মারা গেছেন। আমার শ্রদ্ধেয় কালিকানন্দ অবধূত। অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজ' কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়েছিলেন বিকাশদা, অর্থাৎ বিকাশ রায়। এই ছবিতে কাজ করতে গিয়ে অবধূতের সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম আমি। তাঁর সেই ব্যবহার সেই আপন করে নেবার রূপটিকে আমি ভালবেসেছিলাম বলেই বোধকরি তাঁর মৃত্যু-সংবাদ আমাকে ভীষণ আঘাত করেছিল। তেমনি আঘাত করেছিল যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক সুকোমলকান্তি ঘোষের মৃত্যু-সংবাদ।

১৯৭৮ সালের জুন মাস থেকে সর্বগ্রাসী লোডশেডিং আমাদের চরমতম ক্ষতি করতে লাগল!

সে এক সর্বনাশা অবস্থা। প্রোগ্রাম অনুসারে স্টুডিওতে গিয়েছি, মেক-আপ রুমে পা রাখতে না রাখতে হঠাৎ আলো নিভে গেল। অথবা শুটিং জোনে হয়তো চরিত্রের মধ্যে ডুবে আছি, আলো তৈরি। মনিটার দেব—ঠিক সেই সময় আলো চলে গেল। টুপ করে সব অন্ধকারে ডুবে গেল। সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা হয় তখন যখন, ফাইন্যাল টেকিং-এ সংলাপ বলছি—হয়তো প্রচণ্ড ইমোশন্যাল একটা ব্যাপার হঠাৎ লোডশেডিং। মুড চলে যায়। প্রোডিউসার ডিস্ট্রিবিউটরের টাকার শ্রাদ্ধ।

যখন 'দেবদাস' ছবির শুটিং করছি তখন তো আমরা প্রতিদিনই প্রায় ওই সর্বনাশা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতাম মাঝে মাঝেই! এরই মধ্যে লক্ষ্য করতাম—এই লোডশেডিং-এ বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে আনন্দবাজারের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে! এমনি একদিন, টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে কাজ করছি, হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। ফ্লোর থেকে বেরিয়ে এসে সবুজ ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় আমার এই অনুলেখক ভাইটি আমার সংগে আলাপ করিয়ে দিল একজন সাংবাদিকের। তিনি পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সাংবাদিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সংগে আমার পূর্বে আলাপ ছিল না, কিন্তু আনন্দবাজার পত্রিকায় এই সময়ে ঘন ঘন তাঁর লেখা দেখতাম। লোডশেডিং-এ কার কতখানি সর্বনাশ হচ্ছে বোধহয় তাই নিয়ে লিখছিলেন। আজও পার্থবাবু আমার কাছ থেকে আমাদের চলচ্চিত্র জগতের সামগ্রিক অবস্থা জেনে নিলেন। তাঁকে সব বললাম আর সেই দিন টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে এই লোডশেডিং-এর ব্যাপারে আমাদের একটা জরুরী মিটিং আছে সে-কথাও বললাম।

যথাসময়ে টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে গাছতলায় মিটিং হলো। চলচ্চিত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট সকলেই জমায়েত হয়েছিলেন। বলা দরকার সত্যজিৎ রায় সেই লোডশেডিং-এর ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংগে কি আলোচনা করেছেন তাও বিস্তারিত বলেছিলেন। পরের দিন আনন্দবাজারের প্রথম পৃষ্ঠায় এবং তার দু'দিন আগে সেই একই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় লোডশেডিং-এ দেবদাস (সৌমিত্র) আর চুনীলালের (আমি) কি হাল তার বিস্তারিত সংবাদ বেরিয়েছিল! এর পর কিছুদিন স্টুডিও পাড়ায় লোডশেডিং নির্দিষ্ট হয়েছিল! কোন কোন প্রযোজক আবার জেনারেটর দিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করলেন!

এই সালেই প্রসাদ পত্রিকা আমাকে আবার শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মানে ভূষিত করল। ১৯৭৭ সালে 'আনন্দ আশ্রম' মুক্তি পেয়েছিল, সেই ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে আমার এই স্বীকৃতি।

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম।

আগে কয়েকবারই বলেছি মাঝে মাঝে যখন পদ্মপুকুরের ভিতর দিয়ে যেতাম গাড়ি থামিয়ে লালুর চেম্বারে ঢুকে বলতাম,—লালু প্রেসারটা দেখ তো—

লালু প্রেসার দেখত আর সংগে সংগে বিজ্ঞের মত জ্ঞানও দিত। বরাবরই আমার ব্লাড-প্রেসার ভীষণভাবে ওঠানামা করত। বলত রেষ্ট নিতে। আমি বুঝতাম, লালু মিথ্যে বলছে না। রেষ্ট নেওয়া দরকার আমিও মনে করেছিলাম,

কিন্তু আমার রেষ্ট নেওয়া মানে একাধিক মানুষের ক্ষতি! তাই রেষ্ট নেওয়া হতো না!

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম! শরীরটা আনচান করে উঠতেই আমি সুনীলদার কাছে গেলাম। সুনীলদার চোখে মুখে কয়েকটা ভাবনার রেখা দেখেছিলাম। বুঝেছিলাম আবার আমি কার্ডিয়াক অ্যাজমায় আক্রান্ত হয়েছি! তা নাহলে ডাঃ সুনীল সেনের চোখে মুখে এমন ভাবনা দেখা দিত না!

১৩৮৭ সালের ২৬শে এপ্রিল ঠিক এমনি ধরনের একটা অস্বস্তিকর অবস্থাতে আমি সুনীলদার শরণাপন্ন হয়েছিলাম। সেদিন দুপুরে সত্যজিৎ রায়ের 'চিড়িয়াখানা' ছবিতে শুটিং করছিলাম আলিপুর চিড়িয়াখানার ভিতরে। হঠাৎ বুকের ভিতরটাতে বিশ্রী রকমের একটা ব্যথা-অস্বস্তি। মানিকদাকে ব্যাপারটা বললাম, সংগে সংগে আমাকে উনি ছেড়ে দিলেন। আমি সরাসরি ডাক্তার সুনীল সেনের চেম্বারে এসেছিলাম। সুনীলদা আমাকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করেছিলেন। বলেছিলেন কার্ডিয়াক অ্যাজমা। সেই সঙ্গে আমার পেটে আলসারও ছিল। তাই বোধহয় পেটে হাত বুলোনটা আমার ম্যানিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুনীলদা আমাকে বাড়িতে রেখেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। সংগে সংগে ডেকে আনিয়েছিলেন ডাক্তার জে· সি· ব্যানার্জীকে। সেই রাতে আমার কোন জ্ঞান ছিল না, তবে পরে শুনেছিলাম অবধারিত মৃত্যুর মুখ থেকে সেদিন ওঁরাই আমাকে ফিরিয়ে এনে এক অসাধ্য সাধন করেছিলেন। মৃত মানুষকে যে আবার বাঁচানো যায় সেদিন সেই ব্যাপারটাই প্রমাণ করেছিলেন ওঁরা! শুনেছিলাম, সেই ২৬শে এপ্রিল তারিখে আমার লেফট ভেনট্রিকুলার ফেল করে গিয়েছিল। তার মানে আমার হৃদপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুনীলদা ম্যাসেজ করে সেই বন্ধ হৃদপিণ্ডটাকে আবার চালু করে দিয়েছিলেন। সেবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে তিন মাস সময় লেগেছিল আমার।

আর এই তিনমাস বেণু দিনরাত যে ভাবে আমার সেবা করেছিল তার নজির নেই বোধহয় কোথাও, অন্তত আমার জীবনে।

এবার আবার সেই কার্ডিয়াক অ্যাজমা। আবার সুনীলদা আমাকে সুস্থ করে তুললেন, আবার ঈশ্বরের করুণায় আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম! কিন্তু তাই বলে আমি তো চুপ করে থাকতে পারি না। আমার অনেক কাজ। তার মধ্যে গোপার নববিবাহিত জীবনেও চরম আঘাত এসেছে। সে মা হয়েছে কিন্তু সংসারী হতে পারেনি।

আমি কাজ করছি আর ওদের নিয়ে দিনগুলো কাটিয়ে যাচ্ছি বলা যেতে পারে! এইবার আমি নিজেই একজন ডাক্তার হয়ে গেছি। এত বছর ধরে

যত ওষুধ খেয়েছি—তার মধ্যে মোটামুটিভাবে কিছু ওষুধকে চিনেও রেখেছি। শরীরটাতে এই এই উপসর্গ দেখা দিলে এই এই ওষুধ খেতে হবে জানতে পেরে, আমি আমার ছোট মেক আপ বক্সকে একটা মিনি ডাক্তারখানায় রূপান্তরিত করেছিলাম। সেই ওষুধগুলো হলো, SORBITRET, SEGONTINE, কাম্পোজ, ইথোব্রাল, এ্যান্টিওমিড (এস)। তাছাড়া হজমের ওষুধ। এই এ্যান্টিওমিড (এস) আমি বিলেত থেকে আনিয়েছিলাম। আমি এখন কথায় কথায় এই ওষুধগুলো খাই। কোন ওষুধ চায়ের সংগে আবার কোন ওষুধ কিছু খেয়ে।

এসবের মধ্যে গৌতমের জন্য একটা কিছু করার কথা ভেবেই বিবেকানন্দ রোড আর সিমলা ষ্ট্রীটের মুখে আই,ভি, কোং কিনেছি। এবার একদিন ডাক্তার মুরারী মুখার্জীর সংগে আলোচনা করলাম আরও বড় কিছু—মহৎ কিছু করা যায় কিনা! ডাক্তার মুরারী মুখার্জী বলেছিলেন গ্লুকোজ সালাইন এবং আরও কিছু ভাল ওষুধ তৈরির কারখানা করা যেতে পারে। উনি এই ব্যাপারে আমাকে বারবার অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কয়েকবারই আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম তাই করবো। স্থির করলাম, আমতলায় (মোল্লারচক) আমি যে বাগানবাড়ি করেছিলাম, যে বাগানবাড়িতে অবসর মুহূর্তগুলো কাটাবো স্থির করেছিলাম, সেই কারখানাটা ঐ বাগানবাড়িতেই করবো। মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছি কিন্তু তখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। এর মধ্যে গৌতমের ইচ্ছে হয়েছিল প্লাষ্টিক কারখানা তৈরি করবে। আমি সে ব্যাপারেও তাকে আশ্বাস দিয়েছি! আমার ইচ্ছে অন্তত আগামী বছরের মধ্যে গৌতমের জন্য একটা বড় কিছু গড়ে তুলব।

এর মধ্যে আমার মাঝে মাঝেই মনে হতো আমাদের স্বার্থপর ভূমিকাগুলোর কথা!

আমি বেশ বুঝতে পারতাম যে আমাদের এই জগতের মানুষগুলো কেমন সহজ সুন্দরভাবে নিজেদের নির্লজ্জের মত প্রকাশ করতে পারে!

এই মানুষগুলো কেমন অদ্ভুত মানসিক বিকারগ্রস্ত। আমি অবশ্যই সকলের কথা বলছি না, যাঁরা আমাকে প্রতি মুহূর্তে পরোক্ষভাবে আঘাত করে চলেছেন শুধু তাঁদের কথা বলছি।

ইদানিং কয়েকটা ছবি ব্যবসায়িক সাফল্য আনতে পারছে না বলে, আমি বুঝতে পারছি কয়েকজন প্রোডিউসার ডিরেকটর যাঁরা ভয়ে ভক্তিতে অথবা যে কারণেই হোক আমার ছায়ার দূরে থাকতেন, অথবা যাঁরা আমার সান্নিধ্যটাকে বড় করে দেখতেন তাঁরা কেউ কেউ আমার প্রতি করুণা দেখাচ্ছেন। আমার বিরুদ্ধ সমালোচনা, আমার ছবির কিছু কিছু অসাফল্যে আমাকে যেন পরোক্ষ-

ভাবে উপেক্ষা করার একটা টেনডেন্‌সি কারও কারও। এই ব্যাপারগুলো আমাকে যে কি নিদারুণ আঘাত করেছে, এখনও করছে তা আমি আর আমার ভিতরকার মানুষটা ছাড়া কেউ জানে না। তবুও সহ্য করছি। ভীষণ সহ্য করছি। ভেবে নিচ্ছি আমার এখন সময়টা ভাল যাচ্ছে না তাই এই পুরস্কার। এই সময় ভাল না যাবার যে তীব্র যন্ত্রণা, আমি আমার দর্শকদের মন ভোলাতে অক্ষম হয়ে পড়ছি তার যে জ্বালা—সেখানে পরম বন্ধুর মত যে কাউকে পাইনি তা নয়। তাঁরা আমার কাছে এগেছেন আমাকে সাহস দিয়েছেন, আমাকে বারবার বলেছেন—তুমি এত ভাবছ কেন দাদা! তুমি আমাদের দিয়েছ এত বেশী—প্রতিদানে যদি আমরা তোমাকে উপযুক্ত মর্যাদা-শ্রদ্ধা দিতে ভুলে যাই, তোমাকে উপেক্ষা করি তা হলে সেটা আমাদের মনুষ্যত্বহীনতার পরিচয় দেওয়াই হবে। তোমার দু'চারখানা ছবির অসাফল্য তো তোমার ত্রুটি না— আমি সান্ত্বনা পেয়েছি। আবার কাজ করে গেছি। আবার কাজ করে যাচ্ছি।

এই সালের সেপ্টেম্বরে একাধিক ছবির কাজ চলছিল তার মধ্যে আমার অত্যন্ত প্রিয়—অত্যন্ত স্নেহের সুখেন দাস আমাকে তার 'সুনয়নী' ছবিতে নিয়ে কাজ শুরু করে দিল টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে। কাজ করছি সেই চরমতম ব্যস্ততা আছেই আবার তার মধ্যে মাঝে মাঝে মানসিক অশান্তিগুলো কাটিয়ে উঠতে পারছি না।

সেপ্টেম্বর মাসে ঠিক পুজোর সময় প্রতিবারের মত আবার বন্যায় চারিদিকে হাহাকার ছড়িয়ে পড়ল! পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গা জলময় হলো। হাজার হাজার মানুষ গৃহহারা-সর্বহারা হলো! মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। আমি এবার শিল্পী-সংসদের সদস্যদের নিয়ে আলোচনায় বসলাম। কেমন করে বন্যাদুর্গতদের সাহায্য করা যায়। আলোচনায় স্থির হলো ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে পথে পথে ঘুরলে বিশ-তিরিশ হাজার টাকা হয়তো তোলা যাবে কিন্তু তাতে কতটা সাহায্যের হাত বাড়ানো যাবে? সুতরাং একটা বড় কিছু করার ইচ্ছে হলো আমাদের। ঠিক হলো কোলকাতার ইডেন গার্ডেন যদি পাওয়া যায় তা হলে বৃহত্তর প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার আয়োজন করব। এই ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগত-ভাবে বম্বে-মাদ্রাজের অনেক দিক্‌পাল শিল্পীর সংগে আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকলাম।

আমি কাজ করছি। ভীষণ ব্যস্ততা। পরিচালক ভীম স্বানের "দুরীয়"।" ছবির কাজ করছি বম্বেতে—শুনলাম 'ধনরাজ তামাং' হিট করেছে। আমার মনটা সেদিন কম আনন্দিত হয়নি।

আবার এই মনটাই ব্যথায় টন টন করে উঠেছিল যখন শুনলাম আমাদের

পরম শ্রদ্ধেয় ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মারা গেছেন। বাংলা ছবির জনক ডি-জি-র এমন কিছু গুণ ছিল যা আমি মনে মনে অবশ্যই গ্রহণ করেছিলাম। সেই গুণগুলির মধ্যে প্রধান হলো তাঁর সময়ানুবর্তিতা জ্ঞান। কাউকে যদি তিনি কথা দিতেন যে সকাল আটটায় যাব, তা হলে সেটা আটটা দু'সেকেণ্ড হতো না। এটা আমি কারও মধ্যে দেখিনি বলা যায়! আমার একটা দুঃখ থেকে গেছে তা হলো, মৃত্যুর কিছুদিন আগে ধীরেনবাবু চোখ নিয়ে খুব ভুগছিলেন। শুনেছিলাম তিনি পাইকপাড়া সরকারী ফ্ল্যাটে আছেন—শারীরিক খুবই অসুস্থতার মধ্যে আছেন, তখন আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেখা করতে যেতে পারিনি। ব্যস্ততার জন্যেই একবার গিয়ে সেই চিত্রজগতের সব চাইতে প্রাচীনতম মানুষটার প্রতি একটা প্রণাম জানিয়ে আসতে পারিনি। পরে শুনেছিলাম তিনি ঐ পাইকপাড়ার ফ্ল্যাটেই মারা গেছেন। মনে মনে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়েছিলাম।

আমার ব্যস্ততা আছে কিন্তু কোথায় যেন কিছুটা ফাঁকা শে! কিছু কিছু পত্রপত্রিকা আমার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। আমার প্রতি কিছু কিছু সাংবাদিকরা উপদেশমূলক লেখা লিখছেন এমন একটা ভাব নিয়ে প্রকারান্তরে আমার ইমেজকে খর্ব করার চেষ্টায় নেমেছেন বলে বুঝতে পারছি।

তবুও আমি কাজ করে যাচ্ছি! পলাশের অর্থাৎ পলাশ ব্যানার্জীর 'নবদিগন্ত' ছবির শুটিং ওদিকে বম্বের কিছু কিছু ছবির কাজ চলছে, তার মধ্যে আমরা শিল্পীসংসদের সবাই ভাবতে শুরু করেছি পরবর্তী ছবির কথা! আমার একটা ভাবনা সারা মন জুড়ে ছিল, তা হলো দুঃস্থ শিল্পীদের জন্য অনুদানের মাত্রা আমরা প্রতি বছর বাড়াচ্ছি এবং এটা বাড়াতেই চাই। আর তা সম্ভব আমাদের ফাণ্ড যতক্ষণ পারমিট করবে। সুতরাং সেই ফাণ্ড বাড়াবার জন্য আমরা মরীয়া হয়ে উঠেছি। সেই ফাণ্ড বাড়াতে হলে আমাদের একের পর এক অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে হবে, ছবি করে যেতে হবে; আর এই ছবি করার ব্যাপারে ঝুঁকি থাকবেই। আমরা আবার সেই ঝুঁকি নেবার জন্যে আলোচনায় বসলাম। আমরা কাহিনী পেলাম। গৌনক গুপ্তের কাহিনী। 'দুই পৃথিবী'। আমরা 'দুই পৃথিবী' ছবির প্রাথমিক কাজ আরম্ভ করে দিলাম। পীযূষ বুঝেছিল এই ছবি সে সবটুকু চেতনা—সবটুকু সাধনা দিয়ে এমন করে তৈরি করবে যা দর্শকরা ফেলে দিতে পারবেন না কিছুতেই। তার এমন আত্মবিশ্বাস আমি বার বার দেখেছি, কিন্তু এই ছবির ব্যাপারে যেন সেই আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ়। আমিও চিত্রনাট্য শুনে সেই আশাই পোষণ করেছিলাম!

তারপর যথাসময়ে পীযূষ আমাদের সবাইকে নিয়ে কাজ শুরু করে দিল।

এটা '৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা বলছি। এর মধ্যে আবার দু'বার আমার বুকের যন্ত্রণা হয়েছিল। সেই কার্ডিয়াক অ্যাজমা। এই রোগটা মাঝে মাঝে আমার মনটাকে বড় দুর্বল করে দিত।

এই সালে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সুরকার-সংগীতজ্ঞ রাইচাঁদ বড়াল দাদাভাই ফালকে পুরস্কারে সম্মানিত হলেন। খবর পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। আর খুশি হই এই ভেবে যে রাইচাঁদবাবু আজও আমাদের মধ্যে আছেন। তিনি ঈশ্বরের করুণায় আজও এই সুন্দর ভুবনে বেঁচে আছেন। যা হোক, নানা ভাবনা, নানা মানসিক অস্থিরতা আর অনেক ব্যস্ততার মধ্যে ১৯৭৮ সাল শেষ হয়ে গেল।

এসে দাঁড়ালাম ১৯৭৯ সালের সোপানে।

বছরের শুরু খুব একটা শুভ বলে আমার মনে হলো না। আমাদের একান্ত প্রিয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক বনফুল মারা গেলেন। বছরের শুরুতেই একটি মূল্যবান জীবনের অবসানে মনটা খারাপ হয়ে গেল! বেণুর মনটাও বিশ্রী রকমের খারাপ। বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সংগে বেণুর সম্পর্কের কথা সবার জানা। মধুর সম্পর্ক। বড় জামাইবাবু। বেণুর সবাই আছেন; অন্য দিদিরা আছেন, মা আছেন, দাদা আছেন অথচ এই জামাইবাবুর জন্যে যেন একটু বেশী মাত্রায় ওরা নিজেদের গর্বিত মনে করে। সেই জামাইবাবুর মৃত্যুতে সবাই ভেঙে পড়েছিল। এমন আর একবার বেণু খুব মানসিক কষ্ট পেয়েছিল যখন তার দিদি অর্থাৎ বনফুলের স্ত্রী-র হার্ট এ্যাটাকড্ হয় এবং তিনি বনফুলের আগেই এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন। আমরা জানতাম লীলা ছিলেন তাঁর পথের দিশারী। শুধুমাত্র স্ত্রী নন, তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অনুপ্রেরণাও। এই লীলার কথা বনফুলের অজস্র রচনায়—তাঁর শেষের দিকের দিনলিপির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। সেই শোক কাটিয়ে উঠে আমরা শিল্পীসংসদের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার বিরাট আয়োজন পর্ব নিয়ে মেতে গেলাম! দায়িত্ব অনেক, কর্তব্য আরও বিরাট এবং তা পালন করতে হবে সহিষ্ণু হয়ে—দুঃখ শোক সব কিছুকে মানিয়ে নিয়েছি।

আমার নেতৃত্বে আমাদের এখানকার সব শিল্পী আর দিলীপকুমারের নেতৃত্বে বম্বের প্রখ্যাত শিল্পীরা জমায়েত হলেন ইডেনে! সে এক দারুণ ব্যাপার! সে এক অভিনব চিত্রতারকা সমাবেশ। ছিলেন আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন, দিলীপকুমার, কপিল দেব, সায়রাবানু, অমিতাভ বচ্চন, জিতেন্দ্র, শ্যামল মিত্র, পার্থ মুখার্জী, তনুশ্রী শংকর, সঞ্জীবকুমার, কল্যাণ চ্যাটার্জী, মিঠুন চক্রবর্তী, শিবাজী গণেশন, সত্যজিৎ রায়, সৌমিত্র চ্যাটার্জী, মিঠু মুখার্জী, রেখা, অনিল চ্যাটার্জী, সুজিতকুমার, সোমা, পরভিন বাবি, বিনোদ, সীতা দেবী, আসরানি প্রভৃতি এবং আমি নিজে। এইদিন আমাদের এই প্রদর্শনী খেলার অগণিত দর্শকদের মধ্যে দর্শক আসনে ছিলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আর তাঁর স্ত্রী।

বুড়ো ধারাবিবরণী দিতে পটু। বলেও চমৎকার। পুষ্পেন সরকার, কমল ভট্টাচার্যর মতই দ্রুতলয়ে বলে। ভাষায় জ্ঞানও বুড়োর অর্থাৎ তরুণকুমারের যথেষ্ট আছে। বুড়ো, আসরানি আর রবি ঘোষ সেদিন খেলার ধারাবিবরণী দিয়েছিল। এইদিন শিবাজীবাবু অর্থাৎ শিবাজী গণেশন বন্যাত্রাণ তহবিলের জন্য পঁচিশ হাজার টাকার একটা চেক আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

আরও একটা বড় খবর হলো, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসারদা পাওয়ার আমাদের জ্যোতিবাবুর বন্যাত্রাণ তহবিলে দ্বিতীয় কিস্তিতে পঁচিশ লক্ষ টাকার একটা চেক দিয়েছিলেন।

আমরা জ্যোতিবাবুর কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে এসে আমাদের চেকটা যেন নেন। কিন্তু তিনি আসার সুযোগ করতে পারেননি সে-কথা আগেই বলেছি।

কাজ করে যাচ্ছি আর আমার ভিতরে একটা নিদারুণ অস্থিরতা আমাকে মাঝে মাঝে কাতর করে তুলেছে। আমার এই মানসিক যন্ত্রণার কথা মাঝে মাঝে একান্ত কাউকে বলেও ফেলছি! আমার যেন বার বার মনে হচ্ছে, আমার চারিদিকের আলোর বৃত্তের মধ্যে যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অনেকেই যেন সেই বৃত্তের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে করুণার দৃষ্টি মেলে তাকাতে চাইছে! তবুও আমার কাজ অনেক। ওদিকে সুখেনের 'রাজ নন্দিনী'র শুটিং চলছে, অন্যদিকে 'পৃথ্বীরাজ', 'সমাধান' ইত্যাদি শেষ। বধূ পাড়ি জমানও আছে!

এই সালের ৪ঠা এপ্রিল শুনলাম জুলফিকর আলি ভুট্টোর ফাঁসী হয়ে গেল। মনে মনে বলেছিলাম হায়রে রাজনীতি! এই সময়ে টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়া একদিকে যেমন লোডশেডিং-এর যন্ত্রণায় ভুগছে, অন্যদিকে ইউনাইটেড সিনে ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে ছমাস ধরে স্ট্রাইক। তার উপরে বাংলা ছবির বাজারও মন্দা। দু'একটি ছবি ছাড়া কোন ছবিই ব্যবসায়িক সাফল্য এনে দিতে পারছে না। এমনকি আমার ইমেজও কোথায় যেন বেশ টোল খেয়ে গেছে! একদিন আমি আর শুভেন্দু যাচ্ছিলাম একটা ছবির ডাবিং করার ব্যাপারে, আমরা

ল্যাবরেটরীতে ঢুকতে পেলাম না। ধর্মঘটীরা আমাদের ঢুকতে দিল না। এটাও আমার কম বড় পাওনা নয়।

এর মধ্যে একদিন টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে আবার গৌরাঙ্গ এল। দীর্ঘ বছর ধরে আমি গৌরাঙ্গের যে স্বভাবটি দেখে আসছি এবারও তাই দেখলাম। গৌরাঙ্গ পারতপক্ষে ফোনে কথা বলতে চায় না, আমি বুঝি, হয়তো তার মনে হয় টেলিফোন করলে আমি যদি না বলি কিংবা যদি ঘোরাই সেই ভয় থেকে সে আমাকে ফোন করে না। সোজা চলে আসে স্টুডিওতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে, তারপর আমি যখন ভ্রু নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করি কি খবর? তখন ও আমার কাছে আসে, সব জানায়। এবারও তাই হলো। সুযোগ করে নিয়ে গৌরাঙ্গ একটা ডেট চাইল দেখা করার। আমি ডেট দিয়েছিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করেছিলাম কারণ কি? আমি ওকে সুযোগ দিতেই আমতা আমতা করে, রীতিমত ভয়ে ভয়ে আমার কাছে পেশ করল—আমার নামটি সে একটি যাত্রা দলে লাগাতে চায়। পরিচালক শুধু নয় সুরকার হিসেবে সে আমাকে পেতে চায়। আমি একদিন ময়রা স্ট্রীটের ঘরে বসে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিলাম। তারপর ওকে বলেছিলাম অমুক তারিখে (তারিখটা খেয়াল নেই তবে দিনটা মনে আছে) বুধবার তুমি সন্ধ্যে সাতটায় এসো, যে দলে তুমি আমাকে জড়াতে চাও সেই দলের কাউকে সংগে এনো। আমার সম্মতি আছে বুঝতে পেরে গৌরাঙ্গ বিরাট আনন্দ নিয়ে চলে গেল। তারপর আর দেখা করেনি। আমিও ব্যাপারটা আর মনে রাখতে পারিনি।

আমি কাজ করছি। অনেক কাজ। এর মধ্যে পীযূষ আবার আর একখানা ছবির মহরৎ করল নিউ থিয়েটার্সে। ছবির নাম 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী'। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী। ওদিকে 'রাজনন্দিনী'র শুটিং চলছে! লোড-শেডিং চরমে উঠেছে। একাধিক জেনারেটারে কাজ চলছে। এই সময়ে আমাদের রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিবৃতি দিলেন, প্রায় আড়াই কোটি টাকা খরচ করে সরকারী ব্যবস্থাপনায় সল্টলেকে একটি কালার ল্যাবরেটরী তৈরি হবে। এসব ঘোষণায় আমাদের মনের ভিতরে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি, শুধু একবার মনে হয়েছিল, হলেই ভাল।

কাজের মধ্যে খবর পেলাম সোহরাব মোদী দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

এসবের মধ্যে একদিন আমার আমন্ত্রণ এল। টেগোর সোসাইটি অব নিউইয়র্ক থেকে আমাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হলো। ওখানকার বাঙ্গালীরা আমার সংগে আলাপ করবেন, আমাকে সম্বর্ধনা জানাবেন। বিদেশে

আমি যাব আমার সাধের বাংলাদেশের সমস্ত শিল্পীদের পক্ষ থেকে, এটা আমার কম আনন্দের বিষয় হলো না। এই সম্মান শুধু আমার নয়, এ সম্মান আমার বাংলা ছবির জগতের সকলের প্রাপ্য বলে আমি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম হাসি মুখে। নিউইয়র্কের ভারতীয় দূতাবাসে আমার সম্বর্ধনার আয়োজন! এরপর প্রায় ছ সপ্তাহ ধরে আমেরিকা, কানাডা আরও কয়েক জায়গা ভ্রমণ; সেই সংগে ওখানে 'স্ত্রী' আর 'লাল পাথর' ছবি দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

এই সালের ১৫ই আগস্ট আমরা রওনা দিলাম এখান থেকে সংগে ছিল বেণু। দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছোবার পর একটা ভাবনা আমাকে সব সময় জড়িয়ে রেখেছিল। প্রায় দেড়মাস আমি থাকব না, এই দেড়মাসের মধ্যে কত পরিবর্তন হয়তো ঘটে যাবে! এয়ারপোর্টে পৌঁছে বার বার আমার গৌরীর কথা মনে হয়েছিল। মায়ের কথা মনে হয়েছিল, গৌতমের আর সোমার কথা ভীষণ ভেবেছিলাম। এখান থেকে তো বম্বে কিংবা মাদ্রাজ অথবা পুরী কিংবা নৈনিতাল নয়—একেবারে ভারত ত্যাগ। সুতরাং মনে মনে ঈশ্বরের কাছে সকলের মঙ্গল কামনা করে বেণুকে নিয়ে যাত্রা শুরু করে দিলাম। আমরা উড়ে চললাম মহাশূন্য পথে। যাবার সময় অসীমের ওপর অনেকটা দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম। অসীমের সংগে আমার সম্পর্কটা তো আর প্রযোজক অভিনেতার সম্পর্ক ছিল না, সে একদিকে আমার বন্ধু অন্যদিকে আমার ভাই। সুতরাং অসীমের ওপর আমি নির্ভর করতাম অনেকখানি। এখনও নির্ভরতাটুকু আছে এটাই সান্ত্বনা।

ওখানকার মাটিতে পা রাখার সংগে সংগে ওখানকার মানুষেরা আমাকে যে-ভাবে গ্রহণ করেছিলেন তা সত্যিই স্মরণীয়। ওখানে নেমেই শুধু ফুলের বাসরে বাসরে আমরা কাটালাম। দু'মিনিট ফুরসত নেই। আমাদের ঘিরে ওখানকার সকলের কী অপরূপ ব্যবহার তা গুছিয়ে বলা যাবে না। এখানে স্টুডিওতে গেলে আমার সতীর্থরা যেমন আমার সুখ-সুবিধা দেখার জন্য সব সময় সজাগ থাকেন, ওখানেও তেমনি। বার বার মনে হচ্ছিল আমি যেন নিজের চেনা জায়গায় চেনা গণ্ডীর মধ্যে আছি। ওখানকার ভদ্রমহিলারা বেণুর সংগে যে ব্যবহার করেছিলেন তা ভাবা যায় না। আমরা যেন ওঁদের কত আপনজন।

এর মধ্যে আমার মন মাঝে মাঝেই বাংলা ছবি, আমাদের ছবির জগত নিয়ে ভাবত। আমাকে ব্যাকুল করে তুলত। এতটুকু সময় করে নিয়ে অসীমকে একটা পত্র দেব তেমন সময় করে উঠতে পারছিলাম না। তেসরা সেপ্টেম্বর অসীমের পত্র পেয়ে যে কী আনন্দ হয়েছিল তা ঠিক বোঝাতে পারব না। সেই চিঠিরও জবাব দিতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল। শুধু ওখানকার

আপ্যায়ন, ওখানকার একের পর এক নিমন্ত্রণ রক্ষা করে যখনই ভাবতাম উত্তর দেব তখনই শরীরটা ক্লান্তিতে ভেঙে যেত।

৭ই সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে ইণ্ডিয়ান এ্যামবাসাডরের বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে আলাপ হয়েছিল বাংলাদেশের এ্যামবাসাডরের সংগে। সে এক অপূর্ব মিলন মেলা। আমার অনেকদিনের ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা এখানে বেশ আরাম বোধ যেমন করছিল তেমনি আবার সর্বক্ষণ এত উৎসবের মধ্যে ছিলাম যে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম।

নিউইয়র্ক, বস্টন, ওয়াশিংটন, টোরেন্টো এসব জায়গায় প্রবাসী বাঙ্গালীর যে কত ভাল, কত আপনজনের মত তা এখানে না এলে কোনদিন বুঝতে পারতাম না। ওয়াশিংটন থেকে আমি সোমাকে চিঠি দিয়েছি, আর অসীমকে চিঠি লিখেছি। আমরা সোমাকে সংগে নিয়ে যেতে পারিনি বলে, ওখানে আমি আর বেণু দু'জনেই ওকে নিয়ে ভাবনায় থাকতাম। ভাবনা হতো—সংসার বিষয়ে মেয়েটা একদম অনভিজ্ঞ, তার উপরে তার বাচ্চা—, এই দুটো নিয়ে সে যে হিমসিম খাচ্ছে তা আমরা বুঝতে পারতাম। ওখানে থাকাকালীন আমি আর বেণু আলোচনা করতাম সোমাকে নিয়ে। আমরা জানি সোমার কোন অভাব নেই সত্য—কিন্তু ওর মনটা কি করে সব সময় হাসিতে খুশিতে থাকতে পারে সেই ভাবনা আমাদের ছিল। আরও যে ভাবনাটা আমার সারা মন জুড়ে সব সময় থাকত তা হলো আমাদের স্টুডিও পাড়ার খবর কি! যে ছবিগুলো রিলিজ হয়েছে সেগুলো কেমন চলছে। আমরা যাবার সময় দেখে গিয়েছিলাম 'সুনয়নী' রিলিজ হয়েছে—সেই ছবি চলছে কিনা। এই সময় অসীমের একটা ছবি রিলিজের ব্যবস্থা হচ্ছিল দেখে এসেছিলাম বলে সেই রিলিজ নিয়ে ভাবনা হয়েছিল! ভাবনা ছিল বুড়োদের নিয়ে। ভবানীপুরের বাড়ির সবাই কেমন আছে তাও ভাবতাম। মাষ্টারজীর কথাও মনে হয়েছিল। ১৯৭৮-এ মাষ্টারজীর হার্ট এ্যাটাক হয়েছিল। তিনি ছিলেন ভাঙ্গর হাসপাতালে। রাত ১১টায় আমি-বেণু মাষ্টারজীকে এনে উডল্যাণ্ডে ভর্তি করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। এখন তিনি কেমন আছেন তাও ভাবতাম।

২৮শে সেপ্টেম্বর আমরা সকালে ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজে কোলকাতায় ফিরেছিলাম। এসেই আনন্দবাজারের নিউজটা পড়লাম। আমাদের লণ্ডন যাবার কথা ছিল ঠিকই, আনন্দবাজারে তাই লিখেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি লণ্ডনে যেতে পারিনি। চারিদিক থেকে সবাই আমাদের এত সব ভাল ভাল গিফ্‌ট দিয়েছিলেন যা অতুলনীয়। ওখানে ভালই ছিলাম বলে শরীরের কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। এখন ভাবছি—চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সেরা দেশে ঘুরে এলাম

একবার শরীরটা চেক করিয়ে এলে পারতাম, তা হয়নি!

একটা কথা বলা হয়নি যা এই মুহূর্তে বলা দরকার।

আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকারী নির্দেশে পালন করে একটি ঐতিহাসিক বেতার প্রোগ্রামের পরিবর্তন পরিকল্পনায় নিজেকে জড়িয়েছিলাম। তা হলো মহালয়ার প্রভাতি অনুষ্ঠান "মহিষাসুর মর্দিনী"। আমার পরম শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্র-কৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়কে বাদ দিয়ে নতুন করে এই অনুষ্ঠান করেছিলেন বেতার কর্তৃপক্ষ। আমাকে সেই অনুষ্ঠানে যুক্ত করেছিলেন। আমি জানতাম যে এই দুরূহ ব্যাপারটায় আমি চরমভাবে অকৃতকার্য হব। তাই হয়েছিলাম। একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল। এমনকি নিউইয়র্কের অনেক বাঙালী এ-ব্যাপারে আমার তীব্র সমালোচনাও করলেন। আমি ভীষণ লজ্জা পেয়েছিলাম।

অক্টোবর মাস থেকে নিয়মিত কাজ করছি।

আবার বম্বে-কোলকাতা চলছে আমার। এর মধ্যে একদিন শুভেন্দু আমার সংগে দেখা করে। শুভেন্দু চ্যাটার্জী আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। ছেলে হিসেবে চমৎকার। ডাক্তার হিসেবে যদি কাজ করত তাহলে আমাদের অনেক উপকার হতো, তার পরিবর্তে অভিনয় করার কাজ নিয়ে সেখানেও সে হারেনি। বেশ কিছুদিন ধরে ছবি পরিচালনার কাজে নামার ইচ্ছে ছিল তার। অবশেষে আমি তার ছবিতে কাজ করবো বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। ছবির নাম 'হব ইতিহাস'। যে চরিত্রটিতে কাজ করার কথা সেই চরিত্রটি আমার ভালই লেগেছিল, তার উপরে শুভেন্দু। অগত্যা ব্যাপারটা ফাইন্যাল করে দিলাম।

এ-সবের মধ্যে মৃত্যু-সংবাদ বাদ যাচ্ছে না। কোন বছরটাই বাদ যাচ্ছে না। একজন না একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি চলে যাচ্ছেন, এটা মর্মান্তিক। তবুও মৃত্যুকে তো রুখতে পারা যাবে না, তাই নিজেকে সহজ করে নিতে পারি। যেমন সহজ করে নিলাম জয়প্রকাশ নারায়ণের মৃত্যু-সংবাদ পেয়েও।

৮ই অক্টোবর '৭৯ তারিখে জয়প্রকাশ নারায়ণ পাটনায় দেহরক্ষা করেছেন শুনে মনটা ভারাক্রান্ত হয়েছিল। বিরাট মানুষ, বিরাট এক ঐতিহাসিক পুরুষ চলে গেলেন।

ইতিমধ্যে অগ্রদূতের 'সূর্যসাক্ষী' ছবিতে সামান্য কাজ করেছিলাম। প্রচুর কাজ বাকী। তার মধ্যে চলছে 'ওগো বধূ সুন্দরী' ছবির কাজ। অসীমের ছবি 'খনা'ও। ওদিকে বম্বেতে 'দেশপ্রেমী'।

হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয়ে গেল।

মানুষ অনেক বয়স হবার পর মারা গেলে হয়তো তাতে মনের ওপর বিশেষ চাপ পড়ে না, অথবা কর্ম দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে অনেক মানুষের মন জয় করার

আগে যদি কেউ চলে যায় তাতেও মন ব্যথিত হয় কিন্তু সেই শোক তেমন করে মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে না; কিন্তু যে-মানুষ নিজের কর্ম দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে, সাধনা দিয়ে একজন বিশেষ মানুষে পরিণত হয়ে একদম হাসতে হাসতে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে যদি চলে যায়, সেই ব্যথা অনেকদিন মনে থাকে। এই যে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া এটা মৃত্যুর পক্ষে সুন্দর, কিন্তু এই মৃত্যুটা যে কত মর্মান্তিক তা বোঝানো যায় না।

হঠাৎ কানে এল তাজা-প্রাণবন্ত আমার একান্ত বন্ধু পীযূষ বসু মারা গেছে। এই মৃত্যুর কথা বলার আগে একটি জন্মের কথা বলি।

২৯শে সেপ্টেম্বর '৭১।

সেদিন আমাদের মহাপূজার মহানবমী তিথি। উৎসব মুখরিত শহর। সকলের মনে খুশির বন্যা। মন্দিরে মন্দিরে—মণ্ডপে মণ্ডপে চলেছে দেবী-অর্চনা। আমার জীবনে সেদিন মহা আনন্দ। আজ গৌতমের কন্যা এসেছে পৃথিবীর আলোয়। আমার নাতনী হয়েছে। সেই খুশিতে আমি যখন মশগুল ছিলাম, ময়রা স্ট্রীটের বাড়িতে যখন আমি সবাইকে নিয়ে আনন্দে মেতে ছিলাম, ঠিক তখনই পীযূষের মৃত্যু-সংবাদ এল। সমস্ত আকাশটা যেন ভেঙে পড়ল মাথায়। আমার বুকের ভিতরটা নিদারুণভাবে কেঁপে উঠল। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি ব্যাপারটা। এইভাবে পীযূষ চলে যেতে পারে—এইভাবে একটা তাজা জীবন মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করেনি।

আমার কাছে সে কতবড় মর্মান্তিক তা ঠিক বোঝাতে পারব না। আমার মনের ওপর কী বিচিত্র একটা খেলা। না পারছি গৌতমের সন্তান লাভে আনন্দ করতে, না পারছি আমার প্রিয় পীযূষের মৃত্যু-সংবাদ শুনে কাঁদতে। বুকটা ফেটে যাচ্ছে অথচ কিছু প্রকাশ করতে পারছি না। বেণু সেই মুহূর্তে যেভাবে আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল—যেভাবে আমাকে সহজ করে তুলেছিল তার তুলনা হয় না।

এই নবমীর দিন গৌতমের কন্যা সন্তান জন্মেছিল বলে আমি তার নাম রেখেছিলাম নবমীতা।

যা হোক পীযূষের মৃত্যুতে অসীম ভীষণ ভেঙে পড়েছিল। ওর ভেঙে পড়বারই কথা। 'ধন্যা' ছবিটা পীযূষকে দিয়ে করাবার কথা ছিল তা হলো না; 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী'র কাজও অনেকটা বাকি। শেষ পর্যন্ত 'ধন্যা' ছবির পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলো বিজয়বাবুর ওপরে। আর আমি দায়িত্ব নিলাম 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী'র। ইতিমধ্যে 'দুই পৃথিবী'র কাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে একদিকে আমি অভিনেতা, অন্যদিকে আমি পরিচালক। একদিকে

অভিনেতা হিসেবে শুটিং করছি—অন্যদিকে প্রায় রোজই 'কলঙ্কিনী'র এডিটিং-এ বসি আমি!

এ-সবের ভিতরে আমার জীবনের আর এক কলঙ্কিত আমার রচনার সূত্রপাত। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ইদানিং কেউ কেউ মনে করছেন যে আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। উত্তমকুমার এখন অচল হয়ে পড়ছেন, তাই তাঁরা পরোক্ষভাবে আমাকে আঘাত করছেন আর ভাবছেন যে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না! আমি সব বুঝি, অনেকের চাইতে এই বোঝার ব্যাপারটা আমার নিতান্ত বেশী ছিল বৈকি। কিন্তু প্রকাশ করিনি কখনো। প্রকাশ করি না। প্রকাশ করি না বলে অনেকে ধরে নিয়েছেন যে আমি ফুরিয়ে গেছি। তেমনি একটা ব্যাপার ঘটে গেল!

প্রযোজক ধীরেশ চক্রবর্তী আর পরিচালক তপন সিং আমাকে তাঁদের 'বাঞ্ছারামের বাগান' ছবির জন্য মনোনীত করলেন। ওঁরা আমার সংগে যোগাযোগ করলেন এবং সবিনয়ে আমার কাছ থেকে অনুমতি চাইলেন অভিনয় করার। আমি গল্প শুনলাম। যে চরিত্রটি আমাকে করতে হবে তাও স্থির করা হলো। চরিত্রটি আমার ভাল লেগেছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নামটিও চমৎকার—নকড়ি ও ছকড়ি।

একটা কথা না বলে পারছি না, আমি যাঁদের সংগে কাজ করি, আমার কর্মক্ষেত্রে, তাঁরা সকলেই আমাকে ভালবাসেন, আমার প্রতি তাঁদের যে শ্রদ্ধা দেখেছি তা অবশ্যই বলার মত, কিন্তু তপনবাবুকে অর্থাৎ তপন সিংহকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাঁর সংগে সেদিনও কত গল্প করেছি। যখন শুনেছি তপনবাবুর স্ত্রী অরুন্ধতী দেবীর শরীর ভাল নেই—তপনবাবুকে দেখেছি মন-মরা। তাঁকে নানা কথায় ইনস্‌প্যায়ার্‌ড্‌ করেছি। হঠাৎ সেই তপনবাবুদের পক্ষ থেকে একটা অসৌজন্যমূলক ব্যবহার পেয়ে ভীষণ খারাপ লেগেছিল। ভিতরে ভিতরে বেশ উত্তেজিত হয়েও পড়েছিলাম। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে একটু ব্যক্তিগত সম্পূর্ণ পারিবারিক কথায় আসি।

আমার মাঝে মাঝে যে নিদারুণ মানসিক অস্থিরতা থাকত তার মধ্যে বিশেষ করে আমার মনে হতো, আমাকে ভালবেসে বেণুর যত দুঃখ; আমাকে কেন্দ্র করে বেণুর মনের মধ্যে মাঝে মাঝে অশান্তির ঝড়। আর তাই সে মাঝে মাঝেই বড় ছেলেমানুষ হয়ে পড়ে। আমি বুঝি ওর মনের মধ্যে একরাশ ব্যথা জমা হয়ে আছে। অথচ সেই ব্যথা থেকে ওকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলার চেষ্টার ত্রুটি আমি করিনি। সে-কথা কাউকে কোনদিন বলা হয়নি, যে কথা সযত্নে মনের ভিতরে রক্ষা করে এসেছি আমরা আজ সেই কথাটুকুও চিরদিনের

মত এখানে রেখে দিতে চাই।

বেণু যেদিন শ্বশুরঘর থেকে সম্পূর্ণ একলা হয়ে ফিরে এসেছিল, যেদিন একমাত্র সন্তানকে বুকের ভিতরে আঁকড়ে নিয়ে নিজের চেষ্টায়—অসম্ভব মনের জোরে বেঁচে ছিল, সেইদিন সেইরকম একটা সময়ে আমিও যখন বার বার ফিল করছিলাম যে আমার সব থাকতে কোথায় যেন আমি বড় একলা—আমার মনটা যখন একটু তৃপ্তি—সাংসারিক তৃপ্তির জন্ত কাঙাল হয়ে উঠেছিল, তখন বেণুর দিকে তাকালেশমনে হতো ও পারে আমাকে তৃপ্তি দিতে। একদিন ও তো বলেই ফেলেছিল সে একটা নির্ভর স্থল খুঁজছে। তারপর ভবিতব্য। ঈশ্বরের নির্দিষ্ট খেয়াল খণ্ডন করবে কে! ঈশ্বরই বোধহয় আমাদের দু'জনার মধ্যে এই বন্ধনের সৃষ্টি করে দিলেন। ঈশ্বরই তৈরি করলেন আমাদের মিলন। আমি আইনের চাইতে মনকে বিশ্বাস করি বেশী। আমি বিশ্বাস করি, মন-পরমাত্মা যেখানে পবিত্র মিলন আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল, সেখানে যে মিলনের স্বর্গ রচিত হয়—অনেক সময় কোন আইনই তাকে ভাঙতে পারে না। তাই আমি আইন জানতে চাইনি, আমি ভবিষ্যতের রূপ কল্পনা করতে চাইনি, আমি আমার মানবিক চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বেণুকে গ্রহণ করেছিলাম আমার পবিত্র কর্তব্য জ্ঞানে। আমি ওকে নারীত্বের মর্যাদা দিয়েছিলাম। যদিও জানতাম আমার স্ত্রী আছেন, আমার সন্তান আছে, আমার সংসার আছে, আমার সমাজ আছে—সবার উপরে আমার মা আছেন ; তবুও যে আমাকে লতার মত জড়িয়ে রেখেছিল, যার সেবা-যত্ন, যার মমতা—যার ভালবাসা আমাকে অনেকখানি সজীব করে রেখেছিল, তাকে আমি কোনভাবেই ঠকাতে চাইনি, কোনভাবেই আমি আমার বিবেকটাকে কদর্য করে তার সংগে প্রতারণা করতে পারিনি। আজ এসব বলছি তার একমাত্র কারণ, মানুষের জীবনের কথা বলা তো যায় না, কখন কি হয়ে যায়। হয় এই আছি—দশ মিনিট পরে হয়তো আমি নাও থাকতে পারি, তাই সময় থাকতে, যা সত্য তাকে স্বীকার করছি মাত্র। আমি জানি, মানুষ একদিন না একদিন মরবেই। আমি মরব, বেণু মরবে, গৌরী মরবে—আমরা কেউ আগে কেউ পরে যাব পরলোকে! যতক্ষণ আছি ততক্ষণ সবাই মানসিক শান্তি নিয়েই থাকি না কেন!

যা হোক, সংসারে থাকতে হলে সবাইকে নিয়ে থাকতে হলে মাঝেমধ্যে একটু আধটু ঝগড়াঝাটি হবে বৈকি! সংসারে মন কষাকষি হবে এটাই তো নিয়ম। সেই নিয়মের ব্যতিক্রম আমাদের এই ময়রা স্ট্রীটের বাড়িতেও ইদানিং প্রায়ই হতো না। মাঝে মাঝে এমন হয় যে সহ্যের সীমা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলি! সবটাই যে বেণুর দোষ তা নয়, আমারও দোষ আছে বৈকি! এই প্রসঙ্গে বেণু

এই তো সেদিন একটা পত্রিকায় বলেছিল—"আর পাঁচটা মেয়ে যেমন স্বামী সন্তান নিয়ে সুন্দর একটা ঘরের স্বপ্ন দেখে, তেমনি স্বপ্ন আমিও দেখেছিলাম। তখন কে জানত আমার ভাগ্য মন্দ। তাই যতবারই আমি নতুন করে বাঁচবার স্বপ্ন দেখেছি ততবারই আমার সবকিছু ভেঙ্গে গেছে খান খান হয়ে। আমি অভিনেত্রী, বাইরের থেকে যাঁরা আমাকে দেখেন তাঁরা হয়তো ভাবেন আমার আবার দুঃখ কি? কিন্তু সত্যি বলছি আমার জীবন শুধু বঞ্চনা আর অত্যাচারে ভরা।"—

এসব অভিমানের কথা। বুঝতে পারি এই অভিমান তার আছে আমাকে ঘিরেই। আমরা উভয়েই প্রথমত চলচ্চিত্রের শিল্পী, সুতরাং আমাদের মান অভিমান ঝগড়াঝাটির খবর সংবাদ-পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে কাগজের কাটতি বাড়াবার ব্যাপারটা তো থাকবেই। এটাও আমার মানসিক অশান্তির আর এক কারণ। যে সাংবাদিকরা আমার বন্ধু-স্থানীয়—যাঁরা আমার সংগে থেকে অনেক মধুর মুহূর্ত এন্‌জয় করেন তাঁরা আমার বন্ধু হয়ে উঠতে চাননি মনে হয়, তাঁরা আমার জীবনের একান্ত ঘটনাগুলি সুন্দর করে প্রকাশ করতে যেন সদাই উদ্‌গ্রীব।

তেমনি করেই আমাকে হেয় করার একটা মন ইদানিং তৈরি হয়েছিল অনেকেরই। আগেই বলেছি, তপনবাবুর "বাঞ্ছারামের বাগান" ছবিতে আমি কাজ করতে সম্মতি দিয়েছিলাম। আমার সংগে চুক্তিও হয়েছিল। পরে এই প্রসঙ্গে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল ধীরেশবাবু আর তপনবাবুর সংগে। আমি আমার খ্যাতি-আভিজাত্যের মর্যাদা রক্ষা করার জন্ত ওঁদের ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। এই ধরনের ব্যাপারটা আমার জীবনের আর এক ইতিহাস। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী '৮০ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার আইন-আদালত বিভাগের সংবাদটুকু এখানে উল্লেখ করছি আর একবার—

উত্তমকুমারের ওপর শোকজ নোটিশ

আদালতের সংবাদদাতা: প্রখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এক আবেদন অনুসারে আলিপুর কোর্টের দ্বিতীয় মুনসেফ মানসকুমার সেনগুপ্ত 'বাঞ্ছারামের বাগান' শিরোনামায় রঙিন ছায়া-ছবির নির্মাতা-পরিবেশক ধীরেশকুমার চক্রবর্তী ও নির্দেশক তপন সিংহের উপর একটি অন্তর্বর্তী ইনজাংশন জারি করে উত্তমকুমারকে বাদ দিয়ে ওই ছায়াছবির নকড়ি ও ছকড়ি চরিত্রে কোন শুটিং করা থেকে নিবৃত্ত থাকার

AmarBoi.com

আদেশ দেন। শ্রীচক্রবর্তী ও শ্রীসিংহ এই আদেশের বিরুদ্ধে ২৪ পরগণার জেলা ও দায়রা জজ নলিনীকান্ত সেনের আদালতে আপিল করেন।

জেলা ও দায়রা জজ শ্রীসেন উত্তমকুমারের উপর একটি নোটীশ জারি করে আপিলের নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত ইনজাংশনের আদেশ প্রয়োগ কেন স্থগিত রাখা হবে না, নোটীশ জারির সাতদিনের মধ্যে তার কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছেন। জজ আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তী ইনজাংশন প্রয়োগ যেন স্থগিত রাখা হয়।

উল্লেখ্য, উত্তমকুমার অসুস্থ থাকায় তাঁর আত্মীয় ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর মাধ্যমে তিনি মামলা দায়ের করেন। উত্তমকুমার বলেন, ওই ছায়াছবির নির্মাতা শ্রীচক্রবর্তীর সঙ্গে তিনি এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন যে নকড়ি ও ছকড়ির চরিত্রে তিনি অভিনয় করবেন এবং তার জন্য ৩৫ হাজার টাকা পাবেন। তিনি কয়েকটি গানও গাইতে সম্মত হন। ২ই জানুয়ারী আউট-ডোর শুটিং আরম্ভ হবে স্থির হয়। ইতিমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসক তাঁকে কয়েকদিন বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি নির্মাতা ও ডিরেক-টরকে জানুয়ারীর শেষাশেষি তাঁর শুটিংয়ের দিন ফেলার অনুরোধ জানান। উত্তমকুমার বলেন, ইতিমধ্যে তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, তাঁর বদলে অন্য কোন অভিনেতাকে দিয়ে ওই চরিত্রে অভিনয় করানো হবে।

এদিকে ২রা নভেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে ওই চরিত্রে উত্তমকুমার অভিনয় করবেন এবং নিজের কয়েকটি গানও গাইবেন।

উত্তমকুমারের বক্তব্য, তাঁর বদলে অন্য কোন অভিনেতাকে দিয়ে অভিনয় করানো হলে তাঁর গুরুতর মর্যাদা হানি ঘটবে, টাকা দিয়ে যার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়।

অপরপক্ষে শ্রীচক্রবর্তী ও শ্রীসিংহ বলেন, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে ছবি তোলার জন্য বারুইপুরে একটি সব্‌জী বাগান গড়ে তুলতে তাঁরা আশি হাজার টাকা ব্যয় করেছেন। ইতিমধ্যে পনের দিন শুটিং হয়েছে। প্রত্যেকদিন শুটিং-এর জন্যে খরচ হয়েছে কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা। নকড়ি-ছকড়ি চরিত্রে শুটিং প্রায় সারা। তপন সিংহ বলেন, ইনজাংশনের ফলে তিনি আউটডোর শুটিং বন্ধ করে দেন। তাঁর আশঙ্কা শীত চলে গেলে শীতের সব্‌জী ও ফুল শুকিয়ে যাবে ফলে ইস্টম্যান কলারে একটি সার্থক বাংলা ছায়াছবি নির্মাণের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এই ইনজাংশনের ফলে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পেরও ক্ষতি হবে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শুনানি মুলতুবি রাখা হয়েছে।

আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। ১৯৭৯ সালের ১০ই ডিসেম্বর আবার আমি কার্ডিয়াক অ্যাজমায় আক্রান্ত হয়েছিলাম। সেদিন ছিল সোমবার, ভোরের দিকে আমি যখন বুকের যন্ত্রণা অনুভব করলাম, তখন আমাকে সুনীলদা ভর্তি করে দিলেন উডল্যাণ্ড নার্সিং-হোমে। সব ডাক্তাররা আমাকে বললেন কিছুদিন বিশ্রাম নিতে। আমি তপনদাকে অনুরোধ করেছিলাম ছবির কাজ কিছুদিন পিছিয়ে দিতে। দিলেন না। আমাকে উপেক্ষা করা হল। আমিও ইনজাংশন দিলাম। কাগজে যে-সংবাদ প্রকাশিত হলো সেখানে এক জায়গায় লেখা হয়েছে "সার্থক বাংলা ছায়াছবি নির্মাণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে"। এই 'সার্থক' বিশেষণটি ছবি তৈরির সময় ব্যবহার করা হয়েছে। ছবি মুক্তির পর প্রমাণিত হয় সার্থক অথবা অসার্থক। এ ক্ষেত্রে 'সার্থক' কথাটি ছবি তৈরির মুহূর্তে উচ্ছ্বাসবশত কোন চিত্র-সাংবাদিক যদি দিতেন বলার কিছু ছিল না, আইন আদালতের সাংবাদিক এই শব্দটি কিভাবে যুক্ত করলেন—কোন সেন্টিমেন্ট এখানে প্লে করল আমি বুঝতে পারলাম না। আর এক জায়গায় লেখা হলো "বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পেরও ক্ষতি"; এই উক্তিতে আমি অবশ্যই মর্মাহত। যে উত্তমকুমার ছাড়া বাংলা ছবি নাকি অচল লোকে বলে, যে উত্তমকুমারের নামটি জড়িয়ে রেখে, এই একটি নামের জোরে যাঁরা চিত্রের ব্যবসা করেন, যাঁরা উত্তমকুমারকে বলেন একচ্ছত্র সম্রাট, যে উত্তমকুমার একটি ইন্ডাস্ট্রিকে রেখেছেন সবাই বলেন—সেই উত্তমকুমার মাসখানেক অবসর নিলে তৎক্ষণাৎ অন্য শিল্পী নির্বাচন না করলেই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষতি! আমি বুঝতে পারলাম, এই অভিসন্ধিমূলক আচরণকে বরদাস্ত করা উচিত নয়। আমি এখনও শেষ হয়ে যাইনি এটা ওঁদের বুঝিয়ে দেবার জন্য আইনের আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমি স্পষ্ট বুঝেছিলাম কেউ কেউ আমাকে করুণার চোখে দেখতে শুরু করেছেন। এর কারণ পরপর ক'খানা ছবি বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারেনি। এতে আমার ভাবনা কম ছিল না, আমার বার বার মনে হয়—দর্শক সমাজ আমাকে যে প্রীতির চোখে দেখছেন তা খর্ব হয়ে যাবে। তার উপরে এইভাবে আমাকে বাদ দিয়ে অন্য আর্টিস্ট নেবার মানসিক শক্তি প্রযোজকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে! এটাকে বাড়তে দেওয়া উচিত নয় মনে করেই আইনের আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমার বার বারই মনে হয়—তাহলে কি আমি মানুষের ভালবাসা থেকে চ্যুত হয়েছি! তা না হলে দীর্ঘ তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে এদেশের প্রযোজকরা যা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না, আমাকে নিয়ে আবার বাদ দেওয়া, সেই ব্যাপারটা কি করে সম্ভব হলো এখানে।

আমি সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম মাত্র ক'দিন পর। তখন আমার মনে হয়েছিল এই ব্যাপারটাকে সহজ করেই নেওয়া ভাল। পার্ক হোটেলের এক নম্বর ব্যাঙ্কোয়েটে এক ঘরোয়া পার্টিতে আমি বলেছিলাম এক সময়ে, 'বাঞ্ছারামের বাগান' তপনদার অপূর্ব স্ক্রীন প্লে ও আমার জীবনের এক স্মরণীয় ভূমিকা হবে এটা। প্রাণ দিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলাম। তা হল না।

পরে আমি, ধীরেশবাবু একজন প্রযোজক বলে—আমার জন্যে তাঁর ক্ষতি হোক চাইতে পারলাম না বলে মামলা তুলে নিলাম।

১৩ই জানুয়ারী সকাল ৯টায় টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে প্রথম কালার ল্যাবরেটরী উদ্বোধন হ'ল। আমাদের অনেকদিনের আশা মিটতে চলেছে দেখে ভীষণ তৃপ্তি পেলাম। বম্বে-মাদ্রাজের বহু শিল্পী—এখানকার সাংবাদিকরা কাননদেবীর সংগে আমিও উপস্থিত ছিলাম এই শুভ দিনটিতে।

আবার আমার কাজ চলতে থাকল। আমি ৮*শে জানুয়ারীর শেষদিকে বম্বে গেলাম। প্রায় মাসখানেক বম্বে থাকার কথা। ওখানে কাজ শেষ করে ১৪ই ফেব্রুয়ারী আমি কোলকাতায় এলাম প্লেনে। 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী'র এডিটিং, 'দুই পৃথিবী', 'আরো একজন', 'প্রতিশোধ', তা ছাড়া আরও অনেক ছবির কাজ। কোলকাতায় এসেই আবার কলের পুতুলের মত হয়ে গেলাম। এর মধ্যে আমাদের দেশের কৃতি সন্তান ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার গত ১১ই ফেব্রুয়ারী মারা গেছেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারী গৌরাঙ্গ আমার সংগে এন. টি. স্টুডিও নাম্বার ২-এ (এখন যাকে বলা হয় কোঅপারেটিভ স্টুডিও) দেখা করল। 'আরো একজন' ছবির কাজ চলছে। প্রচণ্ড লোডশেডিং। গৌরাঙ্গ আমার মেক-আপ রুমে এসে একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইল। বুঝলাম ও আমার জীবন-কাহিনী শুনতে চায়। আমি ৯ই মার্চ রবিবার সকালে দেখা করতে বললাম। নির্ধারিত সময়ে গৌরাঙ্গ এসেছিল। আমি জানতে চাইলাম কি ব্যাপার! গৌরাঙ্গ আমাকে এক বছর আগেকার একটা স্মৃতি মনে করিয়ে দিল। এক বছর আগে ও আমাকে অনুরোধ করেছিল যাত্রায় নির্দেশক আর সুরকারের ভূমিকা নিতে। তারপর আর সে-কথা কখনো বলেনি। আজ আবার সেই একই অনুরোধ। আমি তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিতে পারিনি, সংশয় প্রকাশ করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত তাকে বলেছিলাম, যদি আমার মর্যাদা হানিকর কিছু না হয় তাহলে যাঁরা যে-দল আমাকে চাইছেন তাঁদের কাউকে নিয়ে চলে এসো—, আসতে বললাম ১৭ই মার্চ মঙ্গলবার সকালে।

ওরা এসেছিল। এবার গৌরাঙ্গর সংগে আছেন তপনকুমার। তপনকুমার

যাত্রাজগতের বেশ বড় আর্টিষ্ট, আমাদের শিল্পী-সংসদের সদস্য। অনেক আলোচনার পর আমি সম্মতি দিলাম। আমি আমার লেটার হেডের একখানা কাগজ ছিঁড়ে গৌরাঙ্গর হাতে দিলাম। বললাম, আমি কথা দিলাম, এই লেটার হেডটা নিয়ে যাও—যা লেখার দরকার তাই লিখে এনো, সই করে দেব। আবার ওদের আসতে বললাম ১৮ই মার্চ।

আমি যাত্রার নির্দেশক ও সুরকার হিসেবে জড়িত হয়ে পড়লাম জনতা অপেরায়। যা লিখে এনেছিল তা পড়লাম এবং লিখিত অনুমতিও দিলাম। এরপর আমাদের চলল নাট্য-ভাবনা। আমি, গৌরাঙ্গ এবং তপনকুমারকে বার বার বলেছি, এমন গল্প চাই—এমন জমাটি ব্যাপার করতে চাই যা দেখলে অন্তত যাত্রার দর্শকরা যেন বুঝতে পারেন আমার কিছু করার ব্যাপার এই পালায় আছেই!

১৩ই জুন, আমরা কয়েকজন, তার মধ্যে অন্যতম হলেন প্রযোজক পরিবেশক বিমল দে গেলাম দিল্লীতে। বাংলা সিনেমা শিল্পের নানা দিকের উন্নতি—বিশেষভাবে লোডশেডিং ইত্যাদি থেকে এই শিল্পকে কেমন করে বাঁচানো যায় তাই নিয়ে আলোচনা করলাম কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরকত গণিখান চৌধুরীর সংগে।

এবার আমার আউটডোর যাবার ব্যাপার। 'প্রতিশোধ' ছবির জন্য জগৎবল্লভপুরে ২২ আর ২৩শে জুন দুদিন আমাকে থাকতে হয়েছিল। তার আগে থাকতেই আমার মনটা মাঝে মাঝে বড় বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে তরুণ সম্ভাবনাময় যুবনেতা সঞ্জয় গান্ধীর অপঘাতে মৃত্যু এবং তার দুইদিন পরেই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরির মৃত্যুতে আমার মনে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল। বিশেষ করে সঞ্জয়ের মৃত্যু আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এরপর "দুই পৃথিবী" ছবির ফাইন্যাল প্রোজেকশান দেখে বেরিয়ে আসার পর নানা ব্যাপার নিয়ে প্রণবের সংগে আলোচনা করে নিজেকে অনেকখানি হাল্কা করেছিলাম। প্রণবের কথা আগে অনেকবারই বলেছি। জীবনের অনেক-অনেকগুলো দিন, অনেক মুহূর্ত আমাকে প্রণবের সংগে কাটাতে হয়েছে। আমার একদিকে যেমন অসীম অন্যদিকে তেমনি প্রণব! এদের সংগে আমার সম্পর্ক শুধুমাত্র প্রযোজক-পরিবেশক আর অভিনেতার মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে তা নয়। অনেকটা নির্ভর করে আছি ওদের ওপর! সেই প্রণব কথায় কথায় আমাকে অনেক আলোচনার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি—ভাল পরিচালকের বড় অভাব এখানে। ভাল রোলেরও খুব অভাব। যদি অনেক বেছে বেছে ছবি করি, রোল নিই—

তা হলে তো কোন কাজই করা যায় না।

ব্যস্ততার মধ্যে থাকি বলে ভাল থাকি। কাজ করতেই হবে, তাই অনেক সময় মনের দিক থেকে সায় না থাকা সত্ত্বেও আমাকে কাজ করতে হয়। অনেক সময় অবলিগেশানের ব্যাপারটাও আছে। যেমন দিলীপ রায় আমার অতি প্রিয়। দিলীপ অভিনয়ের সংগে সংগে পরিচালনার কাজটাও চালিয়ে যাচ্ছে। সে আমাকে যদি বলে একটা রোলে কাজ করতে হবে আমি তাকে না বলতে পারব? 'দর্পচূর্ণে'র চরিত্রটি আমি মনের দিক থেকে নিতে পারিনি। পারিনি না বলতে। এই ছবির সমালোচনায় তার যথাযথ পুরস্কারও পেয়েছি। আনন্দ-বাজার লিখল—

"উত্তমকুমার অভিনীত চরিত্র ও তার উপাখ্যান শরৎরচনার ভিত্তি অনেকটা চূর্ণ করে দিয়েছে······উত্তমকুমারের উপস্থিতি 'দর্পচূর্ণ'তে কেন জরুরী হয়ে পড়েছে সেটা অজ্ঞেয়।"

টাকারও ব্যাপার একটা আছে। আমার এখন অনেক টাকার দরকার। যেখানে আছি যে পরিবেশ তৈরি করেছি—যে খরচ প্রতিদিন আমাকে করতেই হবে তা না হলে স্ট্যাটাস্ মেনটেইন হবে না, তার জন্যে টাকার দরকার। আমি অদ্যাবধি কখনও আত্মপ্রচার করেছি বলে আমার মনে হয় না। আজ এমন কিছু বলতে চাই যাতে আত্মপ্রচার করছি লোকের মনে হতে পারে, কিন্তু এসব কথা না বললে এই প্রয়োজনের কারণটা বোঝানো যাবে না। টাকার দরকার অনেক, তার কারণ, অনেকেই অনেক প্রত্যাশা নিয়ে আমার কাছে আসে। আর্থিক সাহায্য চায়। কার কন্যার বিয়ে, কার বাড়িতে অসুস্থতা এসব মাঝে মাঝেই ঠেকাতে হয় আমাকে। এগুলো আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। যা হোক, অনেক টাকার প্রয়োজন আমার, তাই বেছে বেছে কাজ করার অবস্থা নেই! তাই ইদানিং অনেক ছবিতে কাজ করছি এটাও অনস্বীকার্য।

কিছু কিছু ছবি সাফল্য লাভ করেনি। এটা অবশ্যই আমার ত্রুটি নয়! আমার দোষ নয়। তবুও লক্ষ্য করেছি আমাকে বাদ দিয়ে ছবি করার কথা অনেকেই ভাবছেন না, আবার জাহাজের সঙ্গে গাধা বোটের মত জুড়ে দিচ্ছেন আমার নাম! তা থেকে আমার মনে হয়—দর্শকদের টেনে রাখার ক্ষমতা কি আমার শেষ হয়ে গেছে! এ দেশের সবাই আমাকে শুনেছি নাকি ভালবাসেন। সেই ভালবাসা কি দু' চারখানা ছবির অসাফল্যের জন্যে হারিয়ে ফেলেছি আমি! ইদানিং কোন কোন পরিচালক-প্রযোজক আমার অভিনয় জীবনের গোড়ার দিককার অবস্থাটা ফিরিয়ে আনছিলেন মনে হয়।

একেবারে গোড়ার দিকে প্রচার পত্রে আমার নাম দেওয়া হয়নি দু'একখানা ছবিতে। ইদানিং পোষ্টার ইত্যাদিতে "ও" "এবং"-এর পর আমাকে রেখে করুণা করা হচ্ছিল। আমার প্রতি যেন করুণা করছে এরা! আমি ভীষণ ভাবছি তাহলে কি উত্তমকুমারের পুল নেই! যারা আমাকে এইভাবে ব্যঙ্গ করে তারা কি ভেবে নিয়েছে যে আমার জনপ্রিয়তা ম্লান হয়ে গেছে! এইসব ভাবনায় আমার মনটা ভীষণ কাতর হয়ে পড়ছে ইদানিং। প্রতিশোধ-এর আউটডোরে গিয়ে, চণ্ডীমাতা ফিল্মসের কর্ণধার নারায়ণদা আমার জন্যে যে ঘর সাজিয়ে রেখে গেছেন, যে ঘর শুধুমাত্র আমার জন্যে নির্দিষ্ট আমি সেই ঘরে বসে প্রণবকে এ সব কথা বলে হাল্কা হলাম সেদিন। বড়দা অর্থাৎ বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী, প্রণব এঁরা আমাকে বলেছিল—দাদা, এটাই হলো মানুষের চরিত্র! এঁরাই আবার তোমার কাছে এসে দাঁড়াবে—, একটা মজা দেখ, এঁরা তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে আবার এঁরা তোমাকে বাদ দিয়ে কাজও করতে পারছে না—এঁরা ভাল করেই জানেন তোমার নামটি জড়িয়ে রাখলেও লাভ—'দুই পৃথিবী' তোমার মিরাকল্ করবে—

তাই বোধহয় সত্যি হয়ে গেল। 'দুই পৃথিবী'র সমালোচনায় আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। প্রত্যেকটি পত্র-পত্রিকা। আনন্দবাজার লিখল—"ছবির প্রধান আকর্ষণ বেশ কিছুকাল পর উত্তমকুমারের আবার দুর্দান্ত অভিনয়। সাংবাদিকের চরিত্র হিসাবে নয়, নাট্য ঘনঘটায় তাঁর অভিনয়ই দেখবার।"

আমরা স্থির করলাম শিল্পী সংসদের সভাপতি হিসেবে এই ছবির ওপরে একটা ভাল বিবিধ ভারতী প্রোগ্রাম করব? আমি আজ অবধি কোন ছবির প্রচারে বিশেষ করে বিবিধ ভারতীর ব্যাপারে বিশেষ ভাবে কোন ইন্টারভিউ-ধর্মী কিছু বলিনি, কিন্তু 'দুই পৃথিবী' হলো সংসদের ছবি, এ ছবিকে চালাতেই হবে, এর টাকা দুঃস্থ শিল্পীদের জন্য ব্যয় করা হবে, তাই প্রণবকে বলেছিলাম উদয়কে নিয়ে ১৩ই জুলাই ময়রা স্ট্রীটের বাড়িতে বসে আমরা প্রোগ্রামটা ঠিক করে নেব। কিন্তু ১৩ই জুলাই আমরা বসতে পারিনি। নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ ১৩ই জুলাই প্রণব বন্ধ, উদয় বন্ধুকে নিয়ে ময়রা স্ট্রীটের বাড়িতে এসেছিল। ঐ দিন কাজ করতে পারিনি। আগের দিন ১২ই জুলাই সোমার জন্মদিন ছিল। পার্টি দিয়ে শরীরটা ক্লান্ত ছিল বলে ওদের ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।

এসব কথা বলার আগে 'দুই পৃথিবী'র রিলিজ ডেটের কিছু স্মৃতি বলে নিতে চাই! ২৭শে জুন '৮০ 'দুই পৃথিবী' রিলিজ হলো। ২৮শে জুন ভারতী সিনেমায় ছিল প্রেস শো। আমি ইন্টারভ্যালে লবীতে সকলের সংগে দেখা করলাম। অনেকদিন পর এমন করে দেখা সবার সংগে। সাংবাদিকদের

সকলেই ঐ প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে আমার সংগে করমর্দন করলেন, ছবিটবি তুললেন অনেকেই। যাত্রা জগতের ক'জন নায়ক তার মধ্যে মোহন চ্যাটার্জী ও তপনের সংগেও দেখা হলো ঐ ভীড়ের মধ্যে। আবার ছবি আরম্ভ হলো, সবাই হাউসে গেলেন। আমি ফিরে এলাম বাড়িতে। আবার পোষাক পাল্টে নিলাম। পাঞ্জাবী-ধুতি ছেড়ে স্যুট পরলাম। 'দুই পৃথিবী' দেখে সাংবাদিকরা আরও অনেক অতিথিরা আসবেন পার্ক হোটেল ব্যাঙ্কোয়েটে। আমি আর বেণু তাঁদের সামনে উপস্থিত থাকব। যথাসময়ে আমি-বেণু-সোমা সবাই পার্ক হোটেলের দুই নম্বর ব্যাঙ্কোয়েটে হাজির। ছবি দেখে সবাই এলেন সেখানে। সংসদের সম্পাদক গোপাল, সংসদের ক'জন সদস্য তাছাড়া শিল্পীরা, যাত্রার মোহন চ্যাটার্জী সস্ত্রীক, তপনকুমার, অনেক অতিথি, সাংবাদিকদের মধ্যে এন. কে. জি (নির্মল ঘোষ), পঙ্কজদা (পঙ্কজ দত্ত), অজয় বিশ্বাস, গৌরাঙ্গ (আমার অনুলেখক সাংবাদিক), নির্মল ধর, সেবাব্রত গুপ্ত (সেবাদা এসে আমার সঙ্গে একটু কথা বলে চলে গেলেন), ওদিকে দেবেশ ঘোষ, কালাচাঁদদা অর্থাৎ অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী, ভিক্টর, কল্যাণী মণ্ডল আরও কত নাম করব সবাই এলেন, আমরা জমিয়ে কথা বললাম। একটু একটু করে সবাই ! প্রায় রেশায়-আনন্দে-খুশিতে ভরে গেলেন। রাত পৌনে বারোটায় আমরা চলে এলাম ! সাংবাদিকদের মধ্যে প্রায় সবার সংগে আমার দেখা হল এটাই বড় কথা।

আবার ১৩ই জুলাইয়ে ফিরে যাই।

ওদিন প্রণব-উদয়বাবু ফিরে এলেন। আমি ওদের রথের দিন অর্থাৎ ১৬ই জুলাই সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় আবার আসতে বললাম। সেইদিন ছিল সোমবার।

আমি ওদের টাইম দিয়েছিলাম সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা। অপেক্ষা করছি বাড়িতে—লোডশেডিং। মনটাও বেণুর জন্যে ভাল নেই। বেণু তখন মেট্রোপলিটান নার্সিংহোমে। পায়ের ব্যথাটা ওঁর বেড়েছে। আমি অপেক্ষা করতে পারলাম না। চলে গেলাম মেট্রোপলিটানে। যাবার সময় বংশীকে বলে গেলাম ওরা এলে যেন বলে দেয় ২০শে জুলাই সকালে আসতে ! রাত্রে বাড়ি এসে শুনলাম, প্রণব, সুহৃদা, উদয়বাবু এসেছিলেন পৌনে আটটায়।

২০শে জুলাই সকাল।

আজ প্রণব এল না। এলেন উদয়বাবু। আমি ওঁকে বলেছিলাম—কিছু প্রশ্ন তৈরি করে আনতে। সেইগুলি দেখে তার ওপরে আমার বক্তব্য থাকবে। উদয় টেপ করবে ! উদয়বাবু টেপ আর প্রশ্নগুলো এনেছিলেন। আমি ওঁর কাছ থেকে প্রশ্নগুলো নিয়ে নিলাম, বললাম ২১শে জুলাই সোমবার সন্ধ্যেবেলায় রেকর্ডিং

করব।

এই সোমবারটা আমার জীবনের এক অভিশপ্ত দিন।

আমি সকালে যথাসময়ে স্টুডিওতে গেছি। আমার জন্যে যে নির্দিষ্ট মেক-আপ রুম—যে মেক-আপ রুমটি সুদীর্ঘ বছরকাল ধরে শুধুমাত্র আমার জন্যে নির্দিষ্ট বলে জানতাম,যে মেক-আপ রুমে আমার অনুপস্থিতিতে কেউ কোনদিন প্রবেশ করেনি, আজ সেই মেক-আপ রুমে ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! চোরার দখল করে নেবার মত বোম্বাইয়ের এক বালিকা অভিনেত্রী আমার মেক-আপ রুম দখল করে আছে। আমাকে দেখে সে সরে এল না, এমনকি সৌজন্যটুকুও দেখাল না!

আমি চলে এলাম নীরবে। তারপর সোজা চলে গেলাম অন্য স্টুডিওতে। সেখানেও আমার জন্যে নির্দিষ্ট মেক-আপ রুম আছে। সেখানকার সবাই সানন্দে রুম খুলে দিলেন। বিস্মিত হলেন অনেকেই। অনেকেই বললেন, আপনার শুটিং তো আজ এই স্টুডিওতে নয় দাদা—অমুক স্টুডিওতে—

আমি মনে মনে এমন আহত হয়েছিলাম যে সে-কথার বিশেষ উত্তর দিইনি। পরে অবশ্য—আমি যেহেতু প্রযোজক-পরিচালকদের চাকর ছাড়া আর কিছুই নই—সেই হেতু আবার এসে কাজ করতে শুরু করেছিলাম।

এই দিন একটা শট ছিল গ্যাসটে ছোড়ার। সুমিতা রেগে গ্যাসটে ছুঁড়বে। সেই মাটির গ্যাসটে বেরিয়ে যাবে দরজা দিয়ে। সলিল গ্যাসটেটা ছুঁড়েছিল। পরে এডিটিং-এ গ্যাড জাষ্ট করার কথা। কিন্তু কী কপাল আমার!

সেই গ্যাসটে দরজার মাথার ওপরকার কাঠে লেগে আবার ফিরে এসে প্রচণ্ড জোরে আমার কপালের ওপর আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কপাল কেটে রক্ত ঝরল আমার। ফার্ষ্ট এড করা হলো। আমি অনেকটা তুলো চেপে বাড়ি এলাম। আমাকে বাড়ি নিয়ে এলেন সলিল দত্ত আর এ্যাসিস্টেন্ট শ্রীকান্ত। ইতিমধ্যে ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছিল।

বাড়ি অর্থাৎ ময়রা স্ট্রীটে ফিরে পৌনে আটটায় দেখলাম প্রণব, উদয়বাবু বিবিধ ভারতীর জন্য—প্রচারের জন্য—শিল্পীসংসদের সভাপতি উত্তমকুমারের বক্তৃতা টেপ করার জন্য বসে আছেন। আমি ওদের আজ আসতে বলেছিলাম! ওরা আমার ফাটা কপাল দেখে ভীষণ দুঃখ পেল। বললাম, কাল শুটিং ক্যানসেল করেছি—ডাক্তার আসছেন—তোমরা আগামীকাল সকাল এগারটায় এস। মনে হয়—ভালই থাকব। কাল দেব আমার প্রথম বিবিধ ভারতীর জন্য ভাষণ—ওরা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে চলে গেল।

২২শে জুলাই ওরা এল। আমি ওদের বসিয়ে রেখে স্নান সেরে এলাম।

তারপর আমার স্টাডিরুমে বসে রেকর্ডিং করলাম। বেলা ১২৷৷ টা নাগাদ গৌতম এল। মনটা ভীষণ খারাপ লাগছিল আমার। হয়তো বেণুর জন্যে—হয়তো এই রক্ত ঝরার জন্যে—হয়তো অনেক কিছুর জন্যে! রেকর্ডিং শেষ করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম বেণুকে দেখার জন্যে! —আবার গৌরাঙ্গ এল! ওঁর অনেক প্রত্যাশা। আমার সারা জীবনের সব কথা-কাহিনীকে মালার মত করে গেঁথে রাখার প্রত্যাশা! ওকে তেইশ তারিখে সকালে আসতে বললাম। এই গৌরাঙ্গই প্রথম আমার জীবনে আসা এমন এক তরুণ সাংবাদিক যে দীর্ঘ দশ বছর ধরে মাঝে মাঝেই আমার জীবনের সব ঘটনাকে ফুলের মত কুড়িয়ে কুড়িয়ে একটু একটু করে মালা গাঁথছে। ওকে কি ফেরানো যায়?

এরপর!

২৮শে জুলাই।

প্রতিদিনের মত দাদার ঘুম ভাঙল। যথাসময়ে বড় সাধের প্রভূত অর্থব্যয়ে তৈরি মনের মত স্নানাগারে স্নান সেরে, ধূপ জ্বালিয়ে দাদা প্রতিদিনের মত পুজো করলেন তাঁর সিদ্ধিদাতা গণেশজীকে, তারপর বাবা সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের বৃহৎ তেলরঙে আঁকা ছবিও পুজো করলেন।

বাড়িতে তখন এসে পৌঁছে গেছেন নিত্যদিনের সঙ্গী—পরম প্রিয় ভ্রাতৃপ্রতিম অশীম সরকার।

বংশী এবং অন্য সব ভৃত্যেরা সজাগ, কর্ম তৎপর। একে একে গাড়িতে তারা তুলে দিল 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী' ছাড়া আরও কিছু স্ক্রীপ্ট। গাড়িতে তুলে দিল দাদার নিত্যদিনের সঙ্গী মেক-আপ বক্স, সেই সঙ্গে প্রিয় রেডিও কাম টেপরেকর্ডার। ক্যাসেটস্। যখন মুড ঠিক থাকে না, যখন কোন কারণে মনটা বিক্ষিপ্ত থাকে তখন ঐ টেপ চালিয়ে নিজের, সম্পূর্ণ নিজের মেক-আপ রুমে গান শোনেন, মৃদু লয়ে শোনেন সহ মূর্ছনা।

এবার দাদা বেরুবেন।

রোজ যেমন বেরোন তেমনি। দাদা দরজার কাছ বরাবর এলে বংশী কিংবা অন্যেরা অথবা বেণুদি নিজেই দরজা খুলে দাঁড়ান। দাদা বেরিয়ে সম্রাটের মত এক ধাপ এক ধাপ করে সোপান অতিক্রম করেন। বেণুদি দাঁড়িয়ে থাকেন দরজায়। মনে মনে হয়তো তাঁর এই মনের মানুষের শুভকামনা করেন। যখন মহানায়ক সম্পূর্ণ চোখের আড়ালে চলে যান, সুপ্রিয়া দেবী দরজা বন্ধ করে

আবার ফিরে আসেন। সেদিন তা হলো না। সুপ্রিয়া দেবী তেমনি করে দরজা খুললেন না, বন্ধও করলেন না। আসলে তিনিও তখন নার্সিংহোমে।

দাদা বেরুতে যাবেন এমন সময় জরুরী কিছু কথা নিয়ে উপরে এলেন অসীমদা। কথা হলো। এবার নীচে নেমে গাড়িতে পা রাখতে গিয়ে চমকে উঠলেন! চমকে উঠলেন প্রযোজক অসীম সরকারও। কোথায় টেপরেকর্ডার? রেডিও কাম টেপরেকর্ডারটা কোথায়! এই সতের বছরের মধ্যে যা-হয়নি, আজ তাই হয়ে গেল। গাড়ি থেকে, ময়রা স্ট্রীটের বাড়ির গেট থেকে টেপরেকর্ডারটা চুরি হয়ে গেল! এ অবিশ্বাস্য। উত্তমকুমার স্তম্ভিত! মর্মাহত! হয়তো বা ক্ষুব্ধ।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে উত্তমকুমার চললেন স্টুডিওতে। কর্তব্যের কোন ত্রুটি রাখতে চান না তিনি। ডেট দিলে আর ডেট ক্যানসেল বিশেষ কোন কাজ না থাকলে করেন না। অনেকদিনের সঙ্গী টেপরেকর্ডারটা চুরি হয়ে গেল বলে উত্তমবাবু 'ওগো বধূ সুন্দরী' ছবির শুটিং ক্যানসেল করলেন না।

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের সেক্রেটারী, প্রযোজক এবং উত্তমবাবুর ভ্রাতৃপ্রতিম প্রণব-বাবু বললেন, চণ্ডীমাতার প্রাণপুরুষ নারায়ণ খাঁ দাদাকে ভীষণ ভালবাসতেন। জগৎবল্লভপুরের বাড়িতে নারায়ণবাবু তাই উত্তমকুমারের জন্যে আলাদা একটা ঘরই রেখে দিয়েছিলেন। সবাই জানে সেই ঘরটি উত্তমকুমারের ঘর। বহু ছবির আউটডোর হয়েছে এই জগৎবল্লভপুরে। এখানকার মানুষেরা দাদার সঙ্গে অনেকটা পরিচিত হয়ে পড়েছিল। ওখানকার সবাই বলত, উত্তমকুমার তো আমাদের ঘরের লোক। এমনি আপনজন হয়ে পড়েছিলেন উত্তমদা এই অঞ্চলে। নারায়ণবাবুর বাড়িতে দাদা তাঁর নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে অনেকটা হাল্কা বোধ করতেন! গত ২২ এবং ২৩ জুন 'প্রতিশোধে'র শুটিং ছিল। আগে আগে হ'ত কি, বিশেষ কোন কারণে যদি শুটিং না হতো, দাদা সঙ্গে সঙ্গে কোলকাতায় ফিরে আসতেন। বলতেন, কাজ যখন হ'ল না তখন টাইম ওয়েষ্ট করে কি হবে!

এবারই ব্যতিক্রম হলো। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য আমরা শুটিং করতে পারলাম না। কিন্তু দাদা ফিরতে চাইলেন না। ফিরতে তাঁর মন চাইল না। তারপর আবার ২৬ জুলাই '৮০ এই জগৎবল্লভপুরেই ছিল অসীমের "খনা" ছবির কাজ। কিন্তু ক'দিন ধরে দাদা নিজেই বলছিলেন, ভাবছি দিনসাতেক সম্পূর্ণ রেষ্ট নেব। হয় বেনারস চলে যাব—না হয় পুরী!

সেই উত্তমকুমার টেপরেকর্ডারটা হারিয়ে আহত মন নিয়ে গেলেন টেকনি-সিয়ান স্টুডিওতে।

একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে "এন. টি. ওয়ান থেকে মেক-আপ নিয়ে এসে প্রথম শট দিলেন সাড়ে এগারোটা থেকে পৌনে বারোটার মধ্যে।...উনি

কিছু খেলেন না।"

টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে শুটিং অথচ মেক-আপ নিয়ে এলেন এন-টি-স্টুডিও ওয়ান থেকে। কেন? কিছু খেলেন না কেন? অবশ্যই এসব কথার সঠিক উত্তর দিতে পারবেন, সেদিনকার ছবির ডিরেক্টর এবং সংগের বাকিরা! উত্তমকুমারকে স্টুডিওতে এনে, অনেক সময় ধরে কাজ না করিয়ে বার বার "আপনি রেষ্ট নিন", "আপনি রেষ্ট নিন, ডাকব" বলে কি কেউ কোনদিন উত্তমকুমারকে বসিয়ে রাখার স্পর্ধা দেখাতে পারতেন? অমন কিছু না ঘটলে, শুধুমাত্র টেপরেকর্ডার হারাবার জন্যেই কি ওঁর মন খারাপ ছিল? সেই জন্যেই কি তিনি খাননি কিছু? যে মণ্টুদিকে কোনদিন দাদা কোনভাবেই উপেক্ষা করেননি, মণ্টুদিকে-স্টুডিও মহলের কে কি ভাবতেন আমি জানি না, কিন্তু এটা জানি মণ্টুদির সঙ্গে দাদা ব্যবহার করতেন তাঁর পুতুলদির আসনে বসিয়ে, বেণুদিও এই মণ্টুদিকে ভালবাসেন। মণ্টুদিও ভাইকে না খাইয়ে স্থির হতে পারতেন না, সেই মণ্টুদিকেও দাদা সেদিন উপেক্ষা করেননি বটে তবে শরীর খারাপ বলে কিছু খাননি অনেক বলা সত্ত্বেও। এর পিছনে আছে এমন কিছু, এমন কোন ব্যবহার—যাতে এই মহানায়ক মনে মনে আহত হয়েছিলেন! সারাদিনের মধ্যে দাদাকে নিয়ে কাজ হয়েছিল খুবই কম। ভিতরে ভিতরে তিনি প্রচণ্ড যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন। তাই হয়তো এক সময় তিনি একজন প্রযোজকের কাছে (তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন) বলেছিলেন, আমি তো তোমাদের চাকর—যখন ডাকবে তখন আমাকে যেতে হবে—, কথাটা শুনে এই বাইরের অর্থাৎ অন্য ছবির প্রযোজক বুঝেছিলেন—মহানায়ককে কেউ আহত করেছে।

এরপর মহানায়ক শুটিং করেছিলেন শেষবারের মত। হয়তো শেষ শুটিং। তাই হয়তো শেষ সংলাপ—"আমিও দেখে নেব, আমার নাম গগন সেন। যাওয়া-আসার দরজা খোলাই রয়েছে।"

এমনভাবে এমন অভিব্যক্তিতে বলেছিলেন যা সুপারব। ফ্লোরের সবাই হাতে তালি দিয়ে উঠে মহানায়কের এই অনন্যসাধারণ শেষ নিবেদনকে অভিনন্দিত করেছিলেন!

এবার বাড়ি এলেন। ময়রা স্ট্রীটের উত্তম তীর্থে এলেন মহানায়ক উত্তম! এই দিন ৮-৩৫ মিনিটে বিবিধ ভারতীতে শিল্পীসংসদের সভাপতির কণ্ঠস্বর ইথার তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল ঘরে ঘরে। শুনলেন স্বয়ং সভাপতি। তারপর রাত ন'টা দশ মিনিটে মহানায়ক গেলেন কথা রাখতে। অনেকদিনের বন্ধু প্রযোজক দেবেশ ঘোষের ঘরে অর্থাৎ ফ্ল্যাট কেনার আনন্দ বিলাসের চরম

খুশির মধ্যে! 'দুই পৃথিবী'র প্রেস শো'র দিনে পার্ক হোটেলের দুই নম্বর ব্যাঙ্কোয়েটে সেদিন কেউ তাঁকে বললেন না—রাত হয়েছে, ঘরে যান। রেষ্ট নিন।

তারপর আর কটা অর্ধ রাত এমনি করে কেটেছিল তাঁর আমি জানি না, ২৩ তারিখে দেবেশবাবুর বাড়িতে অর্ধ রাত কাটিয়ে ক্লান্ত, শ্রান্ত আনন্দপিয়াসী মহানায়ক এলেন ঘরে ফিরে। এরপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সকলের নায়কের মণি, রূপালী পর্দার সোনার নায়ক-এর শারীরিক অবস্থার কথা নানাভাবে লিখিত হয়েছে! লিখিত হয়েছে ২৩ তারিখের রাতের অংশ আর ২৪ তারিখের রাত ন'টা বত্রিশ মিনিট পর্যন্ত। ডাক্তার মণি ছেত্রী, ডাক্তার এ. বি. মুখার্জী, ডাক্তার সুনীল সেন, ডাক্তার চোপড়া, ডাক্তার বিশ্বাস আর আবালের সখা ডাক্তার লালমোহন মুখার্জী—সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মৃত্যুকে পরাস্ত করতে পারেননি।

দাদা চলে গেলেন! রাত ন'টা বত্রিশের পর গোটা রাত সেই মর্মান্তিক খবর ছড়িয়ে পড়েনি তখনও ইথারে। তবে সারারাত ধরে টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার্স, সংবাদ আদান-প্রদানের সব রকম মিডিয়া ব্যস্ত থেকেছিল। ভোরে, ২৫ তারিখের ভোরে, এই অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়েছে বাংলা তথা ভারতের ঘরে ঘরে।

মহানায়কের জীবনদীপ নির্বাপিত হবার সংগে সংগে বেলভিউ নারসিং হোম থেকে গিরিশ মুখার্জী রোডের বাড়িতে দাদা এসেছেন প্রাইভেট কারে। এ বাড়ির সবাই (গিরিশ মুখার্জী রোডের) ও বাড়ির সবার কাছ থেকে উত্তমবাবুকে নিয়ে এসেছেন আপনজনের দাবীতে! বুকফাটা আর্তনাদে শহরের একাংশ ২৪ তারিখের সারারাত মুখর থেকেছে।

২৫ তারিখে গিরিশ মুখার্জী রোডের বাড়িতে নীচের ঘরে ফুলে ফুলে সজ্জিত চিরনিদ্রিত মহানায়ককে শেষ নমস্কার জানাতে গোটা কোলকাতা যেন ভেঙ্গে পড়েছিল। শিশুরা কেঁদেছে যেন তাদের রূপকথার রাজা নেই, যুবকযুবতীরা কেঁদেছেন যেন তাঁদের প্রেরণা হারিয়ে গেল, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বুক চাপড়ে কেঁদেছেন যেন তাঁদের প্রিয়তম পুত্র-নাতি হারিয়ে গেছে!

এরপর মহানায়ক তাঁর ইংলিশ খাটে শুয়ে হাতে হাতে এসে উঠেছেন বাইরের অপেক্ষমান লরীতে। ভীড় সামলাতে সবাই হিমসিম খাচ্ছেন। লরীর ওপরে মহানায়কের মরদেহ ঘিরে থাকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন কেউ কেউ। পুলিশ সেই লরীর ওপরে উঠে খপ্ খপ্ করে এক-একজনের কলার ধরেছে আর ছুড়ে ফেলে দিয়েছে লরীর বাইরে। রূপালী পর্দায় দেখা আর্টিষ্টদের

তারা চেনে বলে কলার ধরছে না। সেই লরীর ওপরে আকুতি মিনতি জানিয়ে উঠলেন মহানায়কের মন্টুদি। পুতুলদির মত মন্টুদি। সর্বক্ষণ যে মন্টুদি মহানায়কের সেবা করেছেন সেই মন্টুদি। হঠাৎ একজন বেঁটে মত—হৃষ্টপুষ্ট-ফর্সা ভদ্রলোক আঙুল তুলে বললেন—ওই মেয়েছেলেটাকে লরী থেকে নামিয়ে দিন—"আমরা চাই না শেষযাত্রার সময় ওঁর (উত্তমবাবুর) যাত্রাপথ ওদের ছোঁয়ায় অপবিত্র হয়ে যায়—

মন্টুদি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। ইজ্জৎ আর মর্যাদা রক্ষা করার জন্যে তিনি নেমে এলেন লরী থেকে। তখন তাঁর বাহু থেকে রক্ত ঝরছে!

যুবকেরা চিৎকার করলেন—সহস্র কণ্ঠে চিৎকার—"গুরু যুগ যুগ জিও—যুগ যুগ জিও"—যুবক-যুবতীরা সব বাধা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে এলেন লরীর কাছে—সহস্র হাত 'মহানায়কের গলার ফুল নেবার' জন্য তখন আকুতি জানাচ্ছে। অরূপকুমার সেই পুষ্প বিতরণ করতে-করতে ক্লান্ত!

তারপর চিরচেনা পথ ধরে ঘুমন্ত মহানায়ক-গিরিশ মুখার্জী রোডের ছেলে, পদ্মপুকুরের-চক্রবেড়িয়ার খেলা খেলা দিনগুলোর অনেক স্মৃতি পিছনে ফেলে ফেলে এগিয়ে যেতে যেতে এক সময়ে এলেন টালীগঞ্জের তীর্থে। শত শত পুরোহিতের মধ্যে প্রধান পুরোহিত এখানকার স্টুডিও মন্দিরে শেষ প্রণাম জানিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলেন মহাপ্রস্থানের পথে! শুধু তিনি এলেন না তাঁর সতের বছরের উত্তমতীর্থ ময়রা স্ট্রিটের গেটের সামনে। যেখানে ২৩ তারিখে তাঁর টেপরেকর্ডারের সংগে সব কথা—সব সুর চুরি হয়ে গেছে। শুধু আছে রাশি রাশি 'স্মৃতি'।

'কামনা'র প্রথম নায়ক উত্তম চ্যাটার্জী (এ্যাঃ) বিংশ শতাব্দীর শেষ স্লোগান "কিংবদন্তীর নায়ক উত্তমকুমার" পঞ্চভূতে লীন হয়ে গেলেন। জন্মদাতা পিতা যেখানে ঘুমিয়ে আছেন, তাঁরই বুকের ওপর চিরশান্তির প্রলেপটুকু নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন তাঁর সোনার ছেলে উত্তম—পরম স্বস্তিতে!

"সূর্য গেল অস্তাচলে"

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ॥

শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি

[আজ পর্যন্ত কতগুলি ছবিতে উত্তমকুমার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং তাঁর অভিনীত কোন্ ছবিগুলি সম্মান অর্জন করেছে তারই একটি পূর্ণ তালিকা। —গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ।]

১৯৫৫

ছবি : হ্রদ। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে সম্মান লাভ। এই সালে বাংলার চলচ্চিত্র-সাংবাদিকদের দুটি সংস্থা ছিল। এখনকার B. F. J A. যেমন একটিমাত্র সংস্থা অথবা অ্যাসোসিয়েশন, তখন এটি দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। উভয় সংস্থাই উত্তমকুমারকে 'হ্রদ' ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্বীকৃতি দেন। একটি সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধেয় নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত এবং অপরটির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধেয় হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উত্তমকুমারের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

১৯৫৭

ছবি : হারানো সুর। ভারত সরকারের স্বীকৃতি লাভ করে উত্তমকুমার প্রযোজিত ও অভিনীত এই ছবি। সার্টিফিকেট অব মেরিট সম্মানে সম্মানিত হয় 'হারানো সুর'। তিনি এবং ছায়াবাণী সংস্থার নীরেন শীল মহাশয় এই উৎসবে যোগদান করেন দিল্লীতে। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তুলে দেন স্বীকৃতির মানপত্র শিল্পীর হাতে।

১৯৬১

ছবি : সপ্তপদী। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে সম্মানিত করা হয় উত্তমকুমারকে। বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্বীকৃতি দেন। নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার শ্রদ্ধেয় বি.এন. সরকার অসুস্থ হয়ে পড়ায় পুরস্কার বিতরণ উৎসবে তাঁর পরিবর্তে দেবকীকুমার বসু উত্তমকুমারের হাতে তুলে দেন পুরস্কার।

১৯৬৬

ছবি : নায়ক। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে সম্মান লাভ করেন। বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্বীকৃতি দেন। ডঃ বিধুভূষণ মল্লিকের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন এবং এই ছবির বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের আমন্ত্রণে উক্ত উৎসবে যোগদান করেন।

১৯৬৭ ও ভরত পুরস্কার

ছবি : চিড়িয়াখানা এবং অ্যান্টনী ফিরিঙ্গি। এই সালে ভারত সরকার 'ভরত' পুরস্কার ঘোষণা করেন। ভারত সরকার ঘোষিত এই নবতম পুরস্কার প্রথমেই উত্তমকুমারকে দেওয়া হয়। উপরোক্ত দুটি ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'ভরত' পুরস্কারে সম্মানিত হন।

১৯৬৭

ছবি : গৃহদাহ। এই সালেই বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন 'গৃহদাহ' ছবির জন্ম তাঁকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্বীকৃতি দেন। পুরস্কার বিতরণ করেন কে. কে. শা।

১৯৭১

ছবি : এখানে পিঞ্জর। বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে 'এখানে পিঞ্জর' ছবির জন্ম শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান দেন। পুরস্কার গ্রহণ করেন শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর হাত থেকে।

১৯৭৩

ছবি : স্ত্রী। শ্রেষ্ঠ নায়ক হিসেবে 'প্রসাদ' পত্রিকা পুরস্কারে সম্মানিত হন। শিল্পীকে পুরস্কার তুলে দেন কানন দেবী। ১৯৭৪ সালে বসুশ্রী সিনেমায় এই অনুষ্ঠান হয়।

১৯৭৪

ছবি : অমানুষ। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান লাভ। বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস এ্যাসোসিয়েশন উত্তমকুমারকে অমানুষ ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মানে ভূষিত করেন।

এই বছরে তৈরি হয় পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিপন্থী চলচ্চিত্র সমালোচক সংস্থা। তাঁদের বিচারে ঐ একই ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান লাভ করেন। চলচ্চিত্র প্রসার সমিতিও এই একই সম্মানে ভূষিত করেন উত্তমকুমারকে।

১৯৭৫

ছবি : অমানুষ। অমানুষ ছবিতে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মানে উত্তমবাবুকে সম্মানিত করেন ফিল্ম ফেয়ার এ্যাওয়ার্ড কমিটি। ২০শে এপ্রিল সন্ধ্যায় গ্র্যাণ্ড হোটেলে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কমিটি উত্তমবাবুর হাতে পুরস্কার তুলে দেন। পুরস্কার প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়।

উল্লেখযোগ্য : ফিল্ম ফেয়ার পারিতোষিক বিতরণ এই বছর প্রথম কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়।

চলচ্চিত্র প্রসার সমিতি এ বছরও উত্তমকুমারকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান প্রদান করেন।

২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে রবীন্দ্রসদন মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার 'অমানুষ' ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কারে সম্মানিত করেন উত্তমবাবুকে। পুরস্কার ছিল পাঁচ হাজার টাকা। এই টাকা উত্তমবাবু দুঃস্থ কলাকুশলীদের ভাণ্ডারে দান করেন।

১৯৭৬

ছবি: বাঙ্খিশিখা॥ এই ছবির জন্য বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান দান করেন।

১৯৭৭

ছবি: আনন্দ আশ্রম॥ এই ছবির জন্য উত্তমকুমার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে প্রসাদ পুরস্কার পান এবং সাংস্কৃতিক সাংবাদিক সংস্থা (সাসাস) পুরস্কারে ভূষিত হন।

উত্তম-প্রসঙ্গ

[উত্তমকুমার বা উত্তম-প্রতিভা আজ আর কারও প্রশংসাপত্র বা সার্টিফিকেটের প্রত্যাশা করে না। তথাপি এখানে উত্তমকুমার প্রসঙ্গে কয়েকজন খ্যাতনামা কথাশিল্পী এবং তাঁর সতীর্থেরা যে অন্তরঙ্গতার ছবি এঁকেছেন, তাই প্রকাশ করা হ'ল। —গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ॥]

- **আশাপূর্ণা দেবী**

উত্তম! বিস্ময়কর প্রতিভার স্বর্ণ-স্বাক্ষরে সমৃদ্ধ অফুরন্ত সম্ভাবনার অঙ্গীকারে দীপ্তিমান অনন্যসাধারণ শিল্পী উত্তমকুমার। উত্তমকুমারের শিল্পীসত্তাটি কখনো কোন ক্ষেত্রেই ম্লান নয়, নিষ্প্রভ নয়। উত্তমকুমারের শিল্পচেতনা উত্তরোত্তর উন্নতির সোপান বেয়ে উঠছে উঁচু থেকে উঁচুতে। বাইরের ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঘাত-প্রতিঘাত, লাভ-লোকসান সেই গতিকে কখনও ব্যাহত করে না। ঈশ্বর তাঁকে উত্তম স্বাস্থ্য দিন, উত্তম শক্তি দিন, উত্তম আয়ু দিন। আর অটুট অক্ষুণ্ণ রাখুন তাঁর মুখের সেই অনবদ্য হাসিটুকু। [১৩৮৭ সাল]

- **আশুতোষ মুখোপাধ্যায়**

আমার একটি নয় বহু কাহিনী-চিত্রের তিনি নায়ক এবং প্রাণ।

তখন ১৩৮৭ সাল। টালিগঞ্জ স্টুডিওতে 'জীবন তৃষ্ণা' ছবির শুটিং চলছে। আমাকে একদিন বললেন, একদিন এসে দেখুন না কেমন লাগে।

গেছি। তাঁর শুটিং চলছে। সুন্দর অভিনয় করলেন। সকলে বাঃ বাঃ করে উঠলেন। আমারও ভালই লেগেছে, কিন্তু কোথায় যেন একটু অস্বস্তিও। উত্তমকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন হ'ল? বললাম, ভালই তো। মাত্র দু'তিনটে মুহূর্ত উত্তমবাবু মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কি ভাবলেন একটু। তারপরই সেটে ফিরে গিয়ে বললেন, সীনটা আবার নেওয়া হোক—

পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, শব্দযন্ত্রী সকলেই আবার তৎপর। এবারের অভিনয়ে হাব-ভাব আর আচরণ আরও একটু শিথিল ও নিস্পৃহ করলেন

তিনি। আমার মনে হ'ল নিজেরও অগোচরে ঐ চিত্রটি এবার শতকরা সবটাই সজীব হয়ে উঠল বুঝি। মনে হয় এই সূক্ষ্ম বোধশক্তিই তাঁকে নায়কত্বের এমন অনন্ত মর্যাদা দিয়েছে। চব্বিশ বছর ধরে তাঁর সংগে হৃদ্যতা। একের পর এক ছবির কাহিনী অবলম্বন করে এই হৃদ্যতা ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তিনি নিজে যেচে আমাকে দাদার সম্মান দিয়েছেন। আমি ছোট ভায়ের।

- বিমল মিত্র

শ্রীউত্তমকুমার শুধু অভিনেতা নন, আমি তাঁকে চরিত্রস্রষ্টা বলেও মনে করি। চরিত্রস্রষ্টা উত্তমকুমারের তাই এত জনপ্রিয়তা। যে অনুভূতি আর যন্ত্রণা-বোধ থাকলে শিল্পী অপরের চরিত্র নতুন করে সৃষ্টি করতে পারেন তা তাঁর নিশ্চয়ই আছে। আমরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অন্দরমহলের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না। এখন শ্রীমান গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষের অনুলেখন থেকে বুঝলাম উত্তমকুমারের এই বিস্ময়কর প্রতিভার মূল রহস্য কোথায়। উত্তমকুমারের চরিত্রের এই রহস্য-লোকের সন্ধান দিতে পেরেছেন বলে শ্রীমান গৌরাঙ্গকে ধন্যবাদ। তাঁর রচনা-ভঙ্গি শুধু সুন্দর নয়, সাবলীল আর রসমধুর। [১৩৭২ সাল]

- সমরেশ বসু

বাংলাদেশের অদ্বিতীয় নায়ক উত্তমকুমার, সব থেকে বেশী প্রিয়-প্রিয়তম। একজন সর্বজনপ্রিয় রোমান্টিক হিরো সম্পর্কে এটাই হয়তো শেষ কথা নয়। পর্দার বুকে ফেড্-ইন ফেড্-আউটের বাইরে, সকলের দৃষ্টির বাইরেও হয়তো একজন নায়ক আছে, যে নিজের কাছেও সর্বাংশে নায়ক। উত্তমও হয়তো তাই। সেটাই শক্তি। সেখান থেকেই অদ্বিতীয়ের উদ্ভব।

- সন্তোষকুমার ঘোষ

আমাদের অল্প বয়সে প্রিয় অভিনেতা ছিলেন জহর গাঙ্গুলী। প্রায় সব ছবিতেই তাঁকে নায়কের ভূমিকায় দেখা যেত, কিন্তু নিজের সত্যিকার অভিনয়-ক্ষমতার পরিচয়পত্র পরেই দাখিল করেন তিনি,নিজস্ব ঘরানায় চলে এসে। ধীরাজ ভট্টাচার্য পর পর কয়েকটি 'ভিলেনে'র চরিত্রে নেমে ব্যক্তিত্বের প্রমাণ দেন। নইলে সত্যি বলতে কি আগে যখন নায়ক ছিলেন তখন তাঁকে একটু বোকা বোকা লাগত। প্রেমের সঙ্গে বোকামির একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, আমাদের দেশে খুব কম অভিনেতাই এই গাঁটছড়া ছিঁড়তে পেরেছেন। প্রায় অনন্য ব্যতিক্রম উত্তমকুমার। এ যুগের উপর তিনি প্রণয়ের সঙ্গে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অভিনয়ের দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। এর তুলনা বেশী পাইনি।

* **সত্যজিৎ রায়**

উত্তমকুমার কোন পরিচালকের ব্যক্তিগত সার্টিফিকেটের অপেক্ষা রাখেন না। তিনি যে বিশ বছর ধরে একশোরও বেশী ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে আজও জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন এটাই তাঁর কৃতিত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এ জিনিস যে কেবল বরাতজোরে হয় না, এ বিশ্বাস আমার আগেই ছিল। আমি আশা করি তিনি আজ যে জায়গা দখল করে আছেন, সেখানে ঠিক এইভাবেই আরও বহুদিন থাকবেন।

ওঁর মত স্টার আর হবে না। বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পের দিকপাল। ওঁর সঙ্গে আমি কাজ করেছি। আশ্চর্য অভিনয় দক্ষতা। উত্তমের মত কোন নায়ক নেই, কেউ হবে না! উত্তমের দর্শকদের টেনে রাখার ক্ষমতা আছে। অনেক নায়ক আছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভাল অভিনয় করেন, কিন্তু উত্তমের মত কেউ নেই, কেউ হবে না।

* **তপন সিংহ**

আমার নিজের মনে হয়েছে উত্তমকুমারের অভিনয় যে-কোন দেশের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অভিনয়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে। উত্তমকুমারের খুব বড় গুণ হ'ল অধ্যবসায়। যতক্ষণ কাজ করেন, কাজের চিন্তাতেই বিভোর হয়ে থাকেন। অনেকেই প্রতিভা নিয়ে জন্মায়, কিন্তু অধ্যবসায়ের অভাবে প্রতিভা ম্লান হয়ে যায়। উত্তমকুমারের মধ্যে দুটোই আছে। সেই জন্যেই বোধহয় উত্তমকুমার অম্লান।

* **তরুণ মজুমদার**

উত্তমের কাছে ব্যক্তিগত সাহায্য না পেলে বহু শিল্পী কাজ করতে পারতেন না। উত্তম মানবিকতায় অনন্য।

* **বিভূতি লাহা**

বাংলা ছবির ব্যাপারে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে, উত্তমকুমারকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানবার। তাঁর এই ক্রমবর্ধমান আকাশ-ছোঁয়া খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মুখ্য অথবা গৌণভাবে জড়িয়ে থাকবার শুভযোগ আমার ঘটেছিল এবং বর্তমানেও ঘটছে। সাধারণত সুদর্শন এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ, যিনি হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি স্থায়ীভাবকে অনায়াসে এবং নিখুঁতভাবে প্রকাশ করতে পারেন তাঁকেই আমরা নায়করূপে মেনে নিতে পারি। আবার যতদূর জানা আছে, আমাদের নাট্যশাস্ত্রের আদিযুগ থেকে আজ অবধি এই ধারণাই পোষণ

করে আসছি। আমাদের উত্তমকুমার এইসব স্থায়ী ভাবগুলিকে অনায়াসে প্রকাশ করতে সক্ষম। এককথায় বলতে গেলে উত্তমের এক-একটি চরিত্রসৃষ্টি এক একটি অভিনব অভিজ্ঞতা। তাই উত্তমকুমার বাংলা ছবির একমাত্র নায়ক।

- **অজয় কর**

উত্তমকুমারের মুখে সর্বদাই হাসি। এই হাসি দিয়েই বোধহয় উত্তম আজ সমস্ত বাংলাদেশের তথা ভারতের মন জয় করেছে। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে ওঁর মুখের ওই হাসিটি সমান অক্ষুণ্ণ। বারো বছরের মধ্যে আমি এর কোন হেরফের দেখিনি। এই ট্র্যাডিশন একইভাবে চলেছে—চলবে আরও অনেকদিন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, শতাধিক ছবির এই জনপ্রিয় নায়ক শত শত বৎসর ধরে দর্শক-মনে বেঁচে থাকুন।

- **সুকুমার দাশগুপ্ত**

সেটা বোধ করি ১৯৫০-৫১ সাল। বারাকপুর ট্রাংক রোডের ওপর এম. পি. স্টুডিও। আমি সেখানে কাজ করি। এম. পি. চিত্র প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্রদ্ধেয় মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের পুরনো লোক আমি, আর নতুন লোক তখন উত্তমকুমার। আমার ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর কাছ থেকে যে মধুর ব্যবহার আর সাহায্য পেয়েছি, সেটা আমাদের দুজনের মধ্যেই থাক। বাইরে প্রকাশ করলে মনে হয় তার শুচিতা আর মাধুর্য নষ্ট হয়ে যাবে। তাঁর ও আমার সম্পর্ক অভিনেতা আর পরিচালকের গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক গভীরে চলে গিয়েছে। তাই শুধু পরিচালক হিসাবে নয় জ্যেষ্ঠ অগ্রজ হিসাবে প্রার্থনা করি, বাংলার উত্তমকুমার, সারাদেশের উত্তমকুমার, আমাদের উত্তমকুমার আরও বড় হোক, শতায়ু সহস্রায়ু না, চিরজীবী হোক।

- **সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়**

উত্তমকুমার সম্বন্ধে সবিস্তারে আমার পক্ষে লেখা ভারি মুশকিল। শুধু উত্তমকুমার কেন, সকলেই যারা একসঙ্গে কাজ করি, এক আনন্দ-বেদনার অংশীদার, তাদের সকলের সম্বন্ধেই কিছু লেখা মুশকিল। আমরা এত কাছাকাছি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এত দ্রুত ছুটে চলেছি যে নিরাসক্তভাবে পরস্পরকে দেখা আমাদের হয়েই ওঠে না। তবু তারই মধ্যে মানুষের যে খণ্ড খণ্ড পরিচয় দিনে দিনে জানা হতে থাকে তাকে এক জায়গায় করলে একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, আদতে আমরা দোষে-গুণে আর পাঁচজনের মতই মানুষ। কেউই আমরা সৃষ্টিছাড়া অত্যুজ্জ্বল বিস্ময়কর একটা কিছুই নই, এমনকি উত্তমকুমারও না।

- **বসন্ত চৌধুরী**

ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়ে এক দক্ষ খেলোয়াড়ের নট-আউট হাফ সেঞ্চুরীর পর তার খেলার বিচার করতে বসলে যেমন মন কখন সে সেঞ্চুরী পূর্ণ করবে সেই দিকেই আকৃষ্ট থাকে বেশী, ঠিক তেমনি এক্ষেত্রেও আমার বন্ধুটির অভিনয়-দক্ষতার বর্তমান মূল্যায়নের চেষ্টা করলেও তার ভবিষ্যতের নতুন নতুন চিত্রায়নই আমায় আকৃষ্ট করছে বেশী।

- **বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়**

মানুষ উত্তমকুমারের বিরাটত্ব নিয়ে পাতার পর পাতা লিখে গেলেও আমার কথা ফুরোবে না, কারণ আমি দীর্ঘদিন ধরে নিজের অন্তর দিয়ে মানুষটিকে উপলব্ধি করেছি। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে শিল্পী উত্তমকুমারের মত, মানুষ উত্তমকুমারও সব লেখালেখির অনেক উর্দ্ধে।

- **অনিল চট্টোপাধ্যায়**

একসঙ্গে কাজ করা একটা ছবির প্রোজেকশন দেখে বেরুলাম। আমার মন খারাপ দেখে উত্তম বলল, কি ব্যাপার? বললাম, নিজের অভিনয় আমার ভাল লাগেনি, খুব বাড়াবাড়ি করেছি। আমার পিঠে হাত রেখে ও বলল, এ ছবিতে তোর প্রচুর নাম হবে। [উত্তম, তোর বোধহয় মনে আছে যে এই ছবির পর প্রযোজকরা আমাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। একটা গাড়ি কেনাও সম্ভব হল।] উত্তম, একদিন আড্ডা মারতে মারতে বলিস তো, তুই এত বুঝিস্ কি করে! তোর কাছে কিছু জানতে [শিখতে বলাটাই ঠিক] চাইলে হেসে উড়িয়ে দিস। তবু, তোকে বলে রাখছি—আমার মত ছাত্রকে তুই এড়িয়ে যেতে পারবি না। আমার 'গোঁ' তো তুই জানিস।

- **কানন দেবী**

একজনের প্রশংসা সকলে করছে শুনলে ভাল লাগে। উত্তমকুমার তেমনি একজন। আমি যে সমস্ত ছবিতে অভিনয় করেছি তার মধ্যে একটি ছবির ভূমিকালিপিতে উত্তমকুমারের নামটা যুক্ত ছিল। 'দেবত্র'। তাও সেই ১৯৫৫ সালে। সুতরাং শিল্পী উত্তমকুমারের বিশেষত্ব নিয়ে আমার পক্ষে কিছু বলা মুশকিলের ব্যাপার। তবে এমনিতে যতটা দেখেছি, তাতে উত্তমকে খুব কাছের মানুষ বলে মনে হয়েছে। ওর মধ্যে কোন পোজ বা প্রিটেনশন নেই। নিশ্চয়ই আরও কিছু কিছু মহৎ গুণ ওর মধ্যে আছে, নইলে এত বড় হল কেমন করে।

ঈশ্বর উত্তমকে সব দিয়েছিলেন শুধু সত্যিকারের বন্ধু দেননি।

- **অরুন্ধতী দেবী**

'নবীন যাত্রা'র সেটে এবং আমার সঙ্গে প্রথম ছবি 'বকুল'-এ অভিনয় দেখে ওঁর সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল যে উনি বড় শিল্পগুণের অধিকারী। তারপর 'মানময়ী গার্লস স্কুল', 'পুষ্পধনু', 'বিচারক', 'নবজন্ম', 'জতুগৃহ', 'শিউলিবাড়ি', 'ঝিন্দের বন্দী' এমনি আরও অনেক ছবিতে বোধ করি ওঁর

সংশিল্পীর মর্যাদা, প্রতিভা ও অনেক সাধারণ গুণের পরিচয়ে আনন্দ পেয়েছি। সব সময় মনে হয়েছে সুযোগ হলে আবার ওঁর সঙ্গে অভিনয় করব।

• **মাধবী মুখার্জী (চক্রবর্তী)**

আমাদের কোন কোন ইন্দ্রিয় জুড়ে তখন উত্তম-প্রভাব তীব্র। চোখ এবং কান এই দুই বিশেষ ইন্দ্রিয়ের ওপর ইন্দ্রধনুর রঙ ছড়িয়ে আমাদের মনের ওপর ইন্দ্রজাল বিস্তার করে চলেছেন উত্তমকুমার, রূপালী পর্দার বুকে হেঁটে, চলে, কথা বলে। আর আমরা ঐ বয়সের দর্শকরা নানা কল্পনার রঙ তুলি দিয়ে আমাদের মনের ক্যানভাসে এঁকে গিয়েছি একটার পর একটা ছবি। 'উত্তম-ছবি'। ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন উত্তমকুমার। সৃষ্টি হয়েছে এক রূপকথা। এই রূপকথার রোমান্টিক নায়কটির ব্যক্তিসত্তা নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কোনদিনই ভাবিনি আমি। ভাবতে চাইনি। কি জানি যদি স্বপ্নভঙ্গ হয়! সুন্দর কল্পনাটুকু বেঁচে থাক, বেঁচে থাকুন উত্তমকুমার— The evergreen romantic Hero.

• **সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়**

উত্তমকুমারের সিন্সিয়ারিটি অভাবনীয়। সব কিছুতেই। অভিনয় তো বটেই। খারাপ ভাল সব বিষয়েই উনি সমান সিন্সিয়ার। আর মজা হচ্ছে, যখন যা করেন, সেই মুহূর্তে অন্য কিছু মনে রাখেন না। আগের এবং পরের ব্যাপারটা অনায়াসেই ভুলে থাকতে পারেন। তাই যখনই তিনি যা করেন সেটাই রিমার্কেবল্ হয়ে দাঁড়ায়। এটাই বোধহয় উত্তম-বৈশিষ্ট্য।

• **গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার**

উত্তম রোনাল্ড কোলম্যানকে ভীষণ পছন্দ করেন। ওঁর "র‍্যানডম হারভেস্ট" ছবিটা উত্তমকে এত ইনফ্লুয়েন্স করেছিল যে "হারানো সুর" ছবিতে তিনি সেই রকম অভিনয় করেছিলেন। পিটার সেলার্সের অভিনয়ও ওঁর খুব ভাল লাগত। সেলার্সকে গুরুর মত মানতেন! উভয়ের গলার গান ভাবলেই আপনা থেকেই আমার গান লেখা হয়ে যেত।

• **শক্তি সামন্ত**

উত্তম চমৎকার মানুষ। তাঁর দারুণ শিল্পীসত্তার সংগে আমার পরিচয় ছিল বলেই আমি কিন্তু ঠিক করেছিলাম, 'অমানুষ' ছবির বাংলা ও হিন্দী দুই সংস্করণেই উত্তম স্টার হবেন। রুচির দিক থেকে আড়ম্বরহীন সদাপ্রসন্ন মানুষটিকে সকলেরই ভাল লাগার কথা। এ কথা জোর দিয়েই বলা যায় —তাঁর মত অভিনেতা বিরল।

• **সুচিত্রা সেন**

উত্তম আমার বন্ধু। এককথায় গ্রেট, গ্রেট আর্টিস্ট। তবু যেন মনে হয় ওকে ঠিকমতো এক্সপ্লয়েট করা হয়নি।

উত্তমকুমার অভিনীত ছবি

[এই আত্মজীবনী প্রকাশ পর্যন্ত প্রথম থেকে যতগুলি ছবিতে উত্তমকুমার অভিনয় করেছেন এবং যে ছবিগুলিতে অভিনয় করেছেন অথচ মুক্তিলাভ করেনি তারই একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা উপস্থিত করছি। ছবিগুলি কত সালের কোন্ তারিখে কোন্ কোন্ চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছিল এবং উত্তমকুমারের বিপরীতে কোন মহিলাশিল্পী অভিনয় করেছিলেন, কার পরিচালনাধীনে ছবিগুলি তৈরি হয়েছিল তা সবই সংযুক্ত করবার চেষ্টা করলাম। যদি কোন ছবির নাম বাদ পড়ে গিয়ে থাকে তার জন্যে আমি দুঃখিত।—গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ।]

১৯৪৭

মায়াডোর (হিন্দী)। এই ছবিতে দিন পাঁচেকের কাজ করেছিলেন।
মুক্তিলাভ করেনি।

১৯৪৮

দৃষ্টিদান। পরিচালনা : নীতিন বসু। নায়ক অসিতবরণের ছোটবেলার চরিত্র। ২৪।৪।৪৮ চিত্রা ও পূর্ণ।

১৯৪৯

কামনা। পরিচালক : নবেন্দুসুন্দর। নায়িকা : ছবি রায়।
৪।৩।৪৯ পূর্ণশ্রী, প্রাচী, আলেয়া।

১৯৫০

মর্যাদা। পরিচালক : দিগম্বর চ্যাটার্জী। নায়িকা : স্মৃতিরেখা বিশ্বাস।
এই ছবিতে মনীষা দেবী পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।
২২।১২।৫০ রূপবাণী, অরুণা, ইন্দিরা।

১৯৫১

ওরে যাত্রী। পরিচালক : রাজেন চৌধুরী। নায়িকা : করবী গুপ্ত।
২।২।৫১ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা।

সহযাত্রী। পরিচালনা : অগ্রদূত। নায়িকা : ভারতী দেবী।
৯।৩।৫১ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা।

নষ্টনীড়। পরিচালক : পশুপতি চ্যাটার্জী। নায়িকা : সুনন্দা দেবী।
২৪।৮।৫১ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা।

১৯৫২

সঞ্জীবনী। পরিচালক : সুকুমার দাশগুপ্ত। নায়িকা : সন্ধ্যারাণী।
৮।২।৫২ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা।

বসু পরিবার। পরিচালক : নির্মল দে। বোনের চরিত্রে সুপ্রিয়া ব্যানার্জী (চৌধুরী)। নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী।
১১।৪।৫২ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা।

কার পাপে। পরিচালক : কালীপ্রসাদ ঘোষ। নায়িকা : মঞ্জু দে।
১৫।৮।৫২ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা।

১৯৫৩

সাড়ে চুয়াত্তর ॥ পরিচালক : নির্মল দে ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ॥
২০।২।৫৩ উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা ॥

লাখ টাকা ॥ পরিচালক : নীরেন লাহিড়ী ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ।
১০।৭।৫৩ উত্তরা, প্রাচী, উজ্জলা ॥

নবীন যাত্রা ॥ পরিচালক : সুবোধ মিত্র ॥ নায়িকা : মায়া মুখার্জী ॥
১১।৯।৫৩ চিত্রা, প্রাচী, ইন্দিরা ॥

বউ ঠাকুরাণীর হাট ॥ পরিচালক : নরেশ মিত্র ॥ নায়িকা : মঞ্জু দে ॥
৯।১০।৫৩ উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা ॥

১৯৫৪

মনের ময়ূর ॥ পরিচালক : সুশীল মজুমদার ॥ নায়িকা : ভারতী দেবী ॥
১৯।১।৫৪ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

ওরা থাকে ওধারে ॥ পরিচালক : সুকুমার দাশগুপ্ত ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ॥ ৫।২।৫৪ উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা ॥

চাঁপাডাঙ্গার বৌ ॥ পরিচালক : নির্মল দে ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥
২।৪।৫৪ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

কল্যাণী ॥ পরিচালক : নীরেন লাহিড়ী ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥
৭।৫।৫৪ উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা ॥

মরণের পরে ॥ পরিচালক : সতীশ দাশগুপ্ত ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ও প্রণতি ভট্টাচার্য ॥ ২৫।৬।৫৪ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

সদানন্দের মেলা ॥ পরিচালক : সুকুমার দাশগুপ্ত ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ॥ ১৬।৭।৫৪ উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা ॥

অন্নপূর্ণার মন্দির ॥ পরিচালক : নরেশ মিত্র ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ॥
৬।৮।৫৪ রাধা, পূর্ণ, প্রাচী ॥

অগ্নিপরীক্ষা ॥ পরিচালক : অগ্রদূত ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ॥
৩।৯।৫৪ উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা ॥

বকুল ॥ পরিচালক : ভোলানাথ মিত্র ॥ নায়িকা : অরুন্ধতী মুখার্জী ॥
১।১০।৫৪ দর্পণা, ইন্দিরা, প্রাচী ॥

গৃহপ্রবেশ ॥ পরিচালক : অজয় কর ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ॥
১২।১১।৫৪ রূপবাণী, অরুণা, ইন্দিরা ॥

মন্ত্রশক্তি ॥ পরিচালক : চিত্ত বসু ॥ নায়িকা : সন্ধ্যারাণী ॥
১৭।১২।৫৪ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

১৯৫৫

শাঁখের প্রদীপ ॥ পরিচালক : সুধাংশু মুখার্জী ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ॥
২৮।১।৫৫ দর্পণা, প্রাচী, পূর্ণ ॥

অনুপমা ॥ পরিচালক : অগ্রদূত ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥
১৮।২।৫৫ উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা ॥

রাইকমল ॥ পরিচালক : সুবোধ মিত্র ॥ নায়িকা : কাবেরী বসু ॥
৮।৩।৫৫ দর্পণা, পূর্ণ ॥

দেবত্র ॥ পরিচালক : হরিদাস ভট্টাচার্য ॥ নায়িকা : সবিতা চ্যাটার্জী ॥
৮।৬।৫৫ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

শাপমোচন ॥ পরিচালক : সুধীর মুখার্জী ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ॥
২৭।৫।৫৫ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

বিধিলিপি ॥ পরিচালক : মান্থ সেন ॥ নায়িকা : সন্ধ্যারাণী ॥
১।৭।৫৫ রাধা, প্রাচী, ইন্দিরা ॥

হ্রদ ॥ পরিচালক : অর্ধেন্দু সেন ॥ নায়িকা : সন্ধ্যারাণী ॥
২৯।৭।৫৫ দর্পণা, ছায়া, পূর্ণ ॥

উপহার ॥ পরিচালক : তপন সিংহ ॥ নায়িকা : মঞ্জু দে ॥
১২।৮।৫৫ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

কঙ্কাবতীর ঘাট ॥ পরিচালক : চিত্ত বসু ॥ নায়িকা : সন্ধ্যারাণী ও
অনুভা গুপ্তা ॥ ১২।৮।৫৫ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

রাতভোর ॥ পরিচালক : মৃণাল সেন ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥
২১।১০।৫৫ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

ব্রতচারিণী ॥ পরিচালক : কমল গাঙ্গুলী ॥ নায়িকা : সন্ধ্যারাণী ॥
২১।১০।৫৫ রাধা, পূর্ণ, প্রাচী ॥

সবার উপরে ॥ পরিচালক : অগ্রদূত ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ॥
১।১২।৫৫ উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা ॥

১৯৫৬

সাগরিকা ॥ পরিচালক : অগ্রগামী ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ॥
১।২।৫৬ শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ॥

সাহেব বিবি গোলাম ॥ পরিচালক : কার্তিক চ্যাটার্জী ॥ নায়িকা : অনুভা
গুপ্তা ও সুমিত্রা দেবী ॥ ৯।৩।৫৬ দর্পণা, পূরবী, আলোছায়া ॥

লক্ষহীরা ॥ পরিচালক : চিত্তরঞ্জন মিত্র ॥ নায়িকা : মঞ্জু দে ॥
১৩।৪।৫৬ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

চিরকুমার সভা ॥ পরিচালক : দেবকীকুমার বসু ॥ নায়িকা : অনীতা গুহ ॥ ১৪।৪।৫৬ নিউ এম্পায়ার, উত্তরা, উজ্জলা ॥

একটি রাত ॥ পরিচালক : চিত্ত বসু ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ॥ ১১।৫।৫৬ রূপবাণী, ভারতী, অরুণা ॥

শঙ্করনারায়ণ ব্যাঙ্ক ॥ পরিচালক : নীরেন লাহিড়ী ॥ নায়িকা : কাবেরী বসু ॥ ১।৬।৫৬ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

শ্যামলী ॥ পরিচালক : অজয় কর ॥ নায়িকা : কাবেরী বসু ॥ ১৫।৬।৫৬ দর্পণা, ইন্দিরা, অরুণা এবং অঞ্জন ॥

ত্রিযামা ॥ পরিচালক : অগ্রদূত ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ও অনুভা গুপ্ত ॥ ২৮।৬।৫৬ উত্তরা, উজ্জলা, পূরবী ॥

পুত্রবধূ ॥ পরিচালক : চিত্ত বসু ॥ নায়িকা : মালা সিন্‌হা ॥ ৫।১০।৫৬ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

শিল্পী ॥ পরিচালক : অগ্রগামী ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ॥ ৩০।১১।৫৬ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

নবজন্ম ॥ পরিচালক : দেবকীকুমার বসু ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥ ২৮।১২।৫৬ উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা ॥

১৯৫৭

হারজিৎ ॥ পরিচালক : যাত্রিক সেন ॥ নায়িকা : অনীতা গুহ ॥ ১৮।১।৫৭ দর্পণা, ইন্দিরা, প্রাচী ॥

বড়দিদি ॥ পরিচালক : অজয় কর ॥ নায়িকা : সন্ধ্যারাণী ॥ ২৩।১।৫৭ রাধা, পূর্ণ, প্রাচী ॥

যাত্রা হলো শুরু ॥ পরিচালক : সন্তোষ গাঙ্গুলী ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥ ১৯।৪।৫৭ উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা ॥

পৃথিবী আমারে চায় ॥ পরিচালক : নীরেন লাহিড়ী ॥ নায়িকা : মালা সিন্‌হা ॥ ৩।৫।৫৭ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

তাসের ঘর ॥ পরিচালক : মঙ্গল চক্রবর্তী ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ও দেবযানী ॥ ১৪।৯।৫৭ রাধা, পূর্ণ, প্রাচী ॥

সুরের পরশে ॥ পরিচালক : চিত্ত বসু ॥ নায়িকা : মালা সিন্‌হা ॥ ২৮।৬।৫৭ উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা ॥

পুনর্মিলন ॥ পরিচালক : যাত্রিক সেন ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥ ২।৮।৫৭ দর্পণা, ইন্দিরা, প্রাচী ॥

হারানো সুর ॥ পরিচালক : অজয় কর ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ॥ ৬।৯।৫৭ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

অভয়ের বিয়ে। পরিচালক : সুকুমার দাশগুপ্ত। নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী। ২০।২।৫৭ মিনার, বিজলী, ছবিঘর।

চন্দ্রনাথ। পরিচালক : কার্তিক চ্যাটার্জী। নায়িকা : সুচিত্রা সেন। ১৪।১১।৫৭ মেট্রো। ১৫।১১।৫৭ দর্পণা, ইন্দিরা, প্রাচী।

পথে হলো দেরী। পরিচালক : অগ্রদূত। নায়িকা : সুচিত্রা সেন। ৫।১২।৫৭ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা, লাইটহাউস।

জীবন-তৃষ্ণা। পরিচালক : অসিত সেন। নায়িকা : সুচিত্রা সেন। ২৫।১২।৫৭ মিনার, বিজলী, ছবিঘর।

১৯৫৮

রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত। পরিচালক : হরিদাস ভট্টাচার্য। নায়িকা : সুচিত্রা সেন। ২৮।২।৫৮ মিনার, বিজলী, ছবিঘর।

বন্ধু। পরিচালক : চিত্ত বসু। নায়িকা : মালা সিন্‌হা। ২৮।২।৫৮ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী।

মানময়ী গার্লস স্কুল। পরিচালক : হেমচন্দ্র চন্দ্র। নায়িকা : অরুন্ধতী মুখার্জী। ১৪।৩।৫৮ শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা।

ডাক্তারবাবু। পরিচালক : বিশু দাশগুপ্ত। নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী। ৮।৮।৫৮ রাধা, পূর্ণ, প্রাচী।

শিকার। পরিচালক : মঙ্গল চক্রবর্তী। নায়িকা : অরুন্ধতী মুখার্জী। ২৫।৯।৫৮ এলিট, উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা।

ইন্দ্রাণী। পরিচালক : নীরেন লাহিড়ী। নায়িকা : সুচিত্রা সেন। ১০।১০।৫৮ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী।

যৌতুক। পরিচালক : জীবন গাঙ্গুলী। নায়িকা : সুচিত্রা দেবী। ১৪।১১।৫৮ দর্পণা, ইন্দিরা, প্রাচী।

সূর্যতোরণ। পরিচালক : অগ্রদূত। নায়িকা : সুচিত্রা সেন। ২১।১১।৫৮ মিনার, বিজলী, ছবিঘর।

১৯৫৯

মরুতীর্থ হিংলাজ। পরিচালক : বিকাশ রায়। নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী। ১২।২।৫৯ মিনার, বিজলী, ছবিঘর।

চাওয়া পাওয়া। পরিচালক : যাত্রিক। নায়িকা : সুচিত্রা সেন। ২৭।২।৫৯ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী।

বিচারক। পরিচালক : প্রভাত মুখার্জী। নায়িকা : অরুন্ধতী মুখার্জী। ১২।৩।৫৯ শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা।

পুষ্পধনু। পরিচালক : সুশীল মজুমদার। নায়িকা : অরুন্ধতী মুখার্জী। ২৫।৬।৫৯ শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা।

গলি থেকে রাজপথ ॥ পরিচালক : প্রফুল্ল চক্রবর্তী ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥ ১৭।৭।৫৯ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

খেলাঘর ॥ পরিচালক : অজয় কর ॥ নায়িকা : মালা সিন্হা ॥ ৪।৯।৫৯ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

সোনার হরিণ ॥ পরিচালক ॥ মঙ্গল চক্রবর্তী ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া চৌধুরী ॥ ৮।১০।৫৯ শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ॥

অবাক পৃথিবী ॥ পরিচালক : বিশু চক্রবর্তী ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥ ৬।১১।৫৯ রূপবাণী, ভারতী, অরুণা ॥

১৯৬০

মায়ামৃগ ॥ পরিচালক : চিত্ত বসু ॥ নায়িকা : সন্ধ্যা রায় ॥ ১।১।৬০ রাধা, পূর্ণ, প্রাচী ॥

রাজাসাজা ॥ পরিচালক : বিকাশ রায় ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥ ৮।১।৬০ রূপবাণী, ভারতী, অরুণা ॥

কুহক ॥ পরিচালক : অগ্রদূত ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥ ২৩।১।৬০ উত্তরা, উজ্জ্বলা, পূরবী ॥

উত্তরমেঘ ॥ পরিচালক : জীবন গাঙ্গুলী ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া চৌধুরী ॥ ১২।২।৬০ শ্রী, ইন্দিরা, আলোছায়া ॥

হাত বাড়ালেই বন্ধু ॥ পরিচালক : সুকুমার দাশগুপ্ত ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥ ১৯।৪।৬০ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন ॥ পরিচালক : অগ্রদূত ॥ নায়িকা : সুমিতা সান্যাল ॥ ২৮।৪।৬০ উত্তরা, উজ্জ্বলা, পূরবী ॥

সখের চোর ॥ পরিচালক : প্রফুল্ল চক্রবর্তী ॥ নায়িকা : বাসবী নন্দী ॥ ৩০।৬।৬০ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ॥

শহরের ইতিকথা ॥ পরিচালক : বিশু দাশগুপ্ত ॥ নায়িকা : মালা সিন্হা ॥ ২৩।৯।৬০ রাধা, পূর্ণ, প্রাচী ॥

শুন বরনারী ॥ পরিচালক : অজয় কর ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী ॥ ৯।১২।৬০ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

১৯৬১

সাথীহারা ॥ পরিচালক : সুকুমার দাশগুপ্ত ॥ নায়িকা : মালা সিন্হা ॥ ২।৩।৬১ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

অগ্নিসংস্কার ॥ পরিচালক : অগ্রদূত ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী ॥ ১৪।৪।৬১ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ॥

ক্লিন্দের বন্দী ॥ পরিচালক : তপন সিংহ ॥ নায়িকা : অরুন্ধতী দেবী ॥
৮।৬।৬১ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

নেকলেস ॥ পরিচালক : দিলীপ নাগ ॥ নায়িকা : সুনীতা দেবী ॥
৭।৭।৬১ রাধা, পূর্ণ, প্রাচী ॥

সপ্তপদী ॥ পরিচালক : অজয় কর ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ॥
২০।১০।৬১ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

দুই ভাই ॥ পরিচালক : সুধীর মুখার্জী ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥
২০।১০।৬১ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

১৯৬২

বিপাশা ॥ পরিচালক : অগ্রদূত ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ॥
২৬।১।৬২ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

শিউলিবাড়ি ॥ পরিচালক : পীযূষ বসু ॥ নায়িকা : অরুন্ধতী মুখার্জী ॥
২৩।২।৬২ শ্রী, ইন্দিরা, প্রাচী ॥

কান্না ॥ পরিচালক : অগ্রগামী ॥ নায়িকা : নন্দিতা বসু ॥
১২।৪।৬২ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ॥

১৯৬৩

শেষ অঙ্ক ॥ পরিচালক : হরিদাস ভট্টাচার্য ॥ নায়িকা : শর্মিলা ঠাকুর ॥
১।২।৬৩ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

নিশীথে ॥ পরিচালক : অগ্রগামী ॥ নায়িকা : নন্দিতা বসু ও সুপ্রিয়া দেবী ॥ ৮।৩।৬৩ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

উত্তরায়ণ ॥ পরিচালক : অগ্রদূত ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী ও সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥ ২৬।৪।৬৩ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ॥

ভ্রান্তিবিলাস ॥ পরিচালক : মানু সেন ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ও সন্ধ্যা রায় ॥ ৩১।৫।৬৩ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

সূর্যশিখা ॥ পরিচালক : সলিল দত্ত ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী ॥
২৪।১০।৬৩ রাধা, পূর্ণ ॥

দেয়া নেয়া ॥ পরিচালক : সুনীল ব্যানার্জী ॥ নায়িকা : তনুজা সমর্থ ॥
২৪।১০।৬৩ বসুশ্রী, বীণা, মিত্রা, আলোছায়া ॥

১৯৬৪

বিভাস ॥ পরিচালক : বিশু বর্মন ॥ নায়িকা : ললিতা চ্যাটার্জী ॥
১৪।২।৬৪ শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ॥

জতুগৃহ ॥ পরিচালক : তপন সিংহ ॥ নায়িকা : অরুন্ধতী দেবী ॥
২০।৩।৬৪ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

নতুন তীর্থ। পরিচালক : সুধীর মুখার্জী। নায়িকা : সুলতা চৌধুরী।
২৪।৮।৬৪ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা॥

মোমের আলো। পরিচালক : সলিল দত্ত। নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী।
২।১০।৬৪ রাধা, পূর্ণ, প্রাচী॥

লালপাথর। পরিচালক : সুশীল মজুমদার॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী।
৬।১১।৬৪ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা॥

১৯৬৫

থানা থেকে আসছি। পরিচালক : হীরেন নাগ। নায়িকা : মাধবী মুখার্জী। ১২।২।৬৫ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী।

রাজকন্যা॥ পরিচালক : সুনীল ব্যানার্জী। নায়িকা : বীণা ঘোষ।
২।৪।৬৫ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী॥

সূর্যতপা॥ পরিচালক : অগ্রদূত। নায়িকা : সন্ধ্যা রায়॥
১।১০।৬৫ উত্তরা, উজ্জ্বলা, পূরবী॥

১৯৬৬

রাজদ্রোহী। পরিচালক : নীরেন লাহিড়ী। নায়িকা : অঞ্জনা ভৌমিক।
২৫।২।৬৬ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা॥

শুধু একটি বছর। পরিচালক : উত্তমকুমার। নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী॥
১।৪।৬৬ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী॥

নায়ক। পরিচালক : সত্যজিৎ রায়। নায়িকা : শর্মিলা ঠাকুর।
৬।৫।৬৬ শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা॥

শঙ্খবেলা। পরিচালক : অগ্রগামী। নায়িকা : মাধবী মুখার্জী।
২০।১০।৬৬ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ॥

কাল তুমি আলেয়া॥ পরিচালক : শচীন মুখার্জী। নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী। ৩০।১২।৬৬ মিনার, বিজলী, ছবিঘর॥

১৯৬৭

নায়িকা সংবাদ। পরিচালক : অগ্রদূত। নায়িকা : অঞ্জনা ভৌমিক।
১৭।২।৬৭ শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা॥

জীবনমৃত্যু। পরিচালক : হীরেন নাগ। নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী॥
১৪।৪।৬৭ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা॥

গৃহদাহ। পরিচালক : সুবোধ মিত্র। নায়িকা : সুচিত্রা সেন॥
৫।৫।৬৭ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী॥

চিড়িয়াখানা॥ পরিচালক: সত্যজিৎ রায়॥ নায়িকা: কণিকা মজুমদার॥ ২২।৭।৬৭ রাধা, পূর্ণ, অরুণা॥

এ্যান্টনী ফিরিঙ্গী॥ পরিচালক: সুনীল ব্যানার্জী॥ নায়িকা: তনুজা সমর্থ॥ ৬।১০।৬৭ রূপবাণী, বসুশ্রী, বীণা, পদ্মশ্রী, যোগমায়া, অলকা॥

১৯৬৮

চৌরঙ্গী॥ পরিচালক: পিনাকি মুখার্জী॥ নায়িকা: সুপ্রিয়া দেবী ও অঞ্জনা ভৌমিক॥ ২০।৯।৬৮ উত্তরা, শ্রী, পূরবী, উজ্জ্বলা॥

তিন অধ্যায়॥ পরিচালক: মঙ্গল চক্রবর্তী॥ নায়িকা: সুপ্রিয়া দেবী॥ ২০।৯।৬৮ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী॥

গড় নাসিমপুর॥ পরিচালক: অজিত লাহিড়ী॥ নায়িকা: মাধবী মুখার্জী॥ ১।১১।৬৮ বীণা, বসুশ্রী, পূর্ণশ্রী॥

কখনো মেঘ॥ পরিচালক: অগ্রদূত॥ নায়িকা: অঞ্জনা ভৌমিক॥ ১২।১২।৬৮ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা॥

১৯৬৯

সাবরমতী॥ পরিচালক: হীরেন নাগ॥ নায়িকা: সুপ্রিয়া দেবী॥ ৩।১।৬৯ শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা॥

চিরদিনের॥ পরিচালক: অগ্রদূত॥ নায়িকা: সুপ্রিয়া দেবী॥ ২৪।১।৬৯ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী॥

শুকসারী॥ পরিচালক: সুশীল মজুমদার॥ নায়িকা: অঞ্জনা ভৌমিক॥ ১৬।৫।৬৯ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা॥

কমললতা॥ পরিচালক: হরিসাধন দাশগুপ্ত॥ নায়িকা: সুচিত্রা সেন॥ ২১।১০।৬৯ ঘোষ, জেম্স, দর্পণা, প্রিয়া, গ্রেস, রূপালী, লিবার্টি॥

মন নিয়ে॥ পরিচালক: সলিল সেন॥ নায়িকা: সুপ্রিয়া দেবী॥ ১০।১০।৬৯ বসুশ্রী, বীণা, মিত্রা॥

অপরিচিত॥ পরিচালক: সলিল দত্ত॥ নায়িকা: অপর্ণা সেন॥ ৫।১২।৬৯ জ্যোতি, উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা॥

১৯৭০

কলঙ্কিত নায়ক॥ পরিচালক: সলিল দত্ত॥ নায়িকা: অপর্ণা সেন॥ ১৫।৫।৭০ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী॥

বিলম্বিত লয়॥ পরিচালক: অগ্রগামী॥ নায়িকা: সুপ্রিয়া দেবী ও দীপা॥ ৫।৬।৭০ মিনার, বিজলী, ছবিঘর॥

ছুটি মন॥ পরিচালক: পীযূষ বসু॥ নায়িকা: সুপর্ণা সেন॥ ২৪।৭।৭০ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা॥

রাজকুমারী ॥ পরিচালক : সলিল সেন ॥ নায়িকা : তনুজা সমর্থ ॥
২১।১০।৭০ বসুশ্রী, বীণা, মিত্রা ॥

নিশিপদ্ম ॥ পরিচালক : অরবিন্দ মুখার্জী ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥
২৩।১০।৭০ শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ॥

মঞ্জরী অপেরা ॥ পরিচালক : অগ্রদূত ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥
২৭।১১।৭০ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ॥

১৯৭১

এখানে পিঞ্জর ॥ পরিচালক : যাত্রিক ॥ নায়িকা : অপর্ণা সেন ॥
২২।১।৭১ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

জয়জয়ন্তী ॥ পরিচালক : সুশীল বসুমল্লিক ॥ নায়িকা : অপর্ণা সেন ॥
১২।৩।৭১ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা, গ্লোব ॥

ধন্যি মেয়ে ॥ পরিচালক : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ও জয়া ভাদুড়ী ॥ ১২।৩।৭১ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ॥

নবরাগ ॥ পরিচালক : বিজয় বসু ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ॥
৬।২।৭১ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

জীবন জিজ্ঞাসা ॥ পরিচালক : পীযূষ বসু ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী ॥
১৫।১০।৭১ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

ছদ্মবেশী ॥ পরিচালক : অগ্রদূত ॥ নায়িকা : মাধবী চক্রবর্তী ॥
২৬।১১।৭১ রাধা, পূর্ণ, প্রাচী ॥

১৯৭২

বিরাজ বৌ ॥ পরিচালক : মানু সেন ॥ নায়িকা : মাধবী চক্রবর্তী ॥
১৮।২।৭২ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ॥

আলো আমার আলো ॥ পরিচালক : পিনাকী মুখার্জী ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ॥ ১৭।৩।৭২ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

অন্ধ অতীত ॥ পরিচালক : হীরেন নাগ ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী ॥
৭।৭।৭২ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

স্ত্রী ॥ পরিচালক : সলিল দত্ত ॥ নায়িকা : আরতি ভট্টাচার্য ॥
১৮।৮।৭২ শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ॥

ছিন্নপত্র ॥ পরিচালক : যাত্রিক ॥ নায়িকা : মাধবী চক্রবর্তী ও সুপ্রিয়া দেবী ॥ ১৩।১০।৭২ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

মেমসাহেব ॥ পরিচালনা : পিনাকী মুখার্জী ॥ নায়িকা : অপর্ণা সেন ॥
১৩।১০।৭২ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ॥

হার মানা হার ॥ পরিচালনা : সলিল সেন ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ॥
২২।১২।৭২ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

১৯৭৩

বনপলাশীর পদাবলী ॥ পরিচালনা : উত্তমকুমার ॥ শিল্পীসংসদের সদস্যবৃন্দ অভিনীত ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী ॥ ৯।২।৭৩ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

কায়াহীনের কাহিনী ॥ পরিচালক : অজয় কর ॥ নায়িকা : অপর্ণা সেন ॥ ১৩।৪।৭৩ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ॥

রাতের রজনীগন্ধা ॥ পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলী ॥ নায়িকা : অপর্ণা সেন ॥ ২২।৬।৭৩ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ॥

সোনার খাঁচা ॥ পরিচালনা : অগ্রদূত ॥ নায়িকা : অপর্ণা সেন ॥ ২০।৭।৭৩ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

রৌদ্রছায়া ॥ পরিচালনা : শচীন অধিকারী ॥ নায়িকা : অঞ্জনা ভৌমিক ॥ ২৮।৯।৭৩ নিউ এম্পায়ার, বসুশ্রী, বীণা ॥

১৯৭৪

রক্ততিলক ॥ পরিচালনা : বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী ॥ ১৫।২।৭৪ নিউ এম্পায়ার, বসুশ্রী, বীণা ও অজন্তা ॥

আলোর ঠিকানা ॥ পরিচালনা : বিজয় বসু ॥ নায়িকা : অপর্ণা সেন ॥ ১৫।২।৭৪ মিনার, বিজলী ও ছবিঘর ॥

যদি জানতেম (নাগচম্পা) ॥ পরিচালনা : যাত্রিক ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী ॥ ১।৩।৭৪ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

যদুবংশ ॥ পরিচালনা : পার্থপ্রতিম চৌধুরী ॥ নায়িকা : অপর্ণা সেন ॥ ২৯।৩।৭৭ শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ॥

রোদন ভরা বসন্ত ॥ পরিচালক : সুশীল মুখার্জী ॥ নায়িকা : বাসবী নন্দী ॥ ৫।৪।৭৪ ॥

বিকালে ভোরের ফুল ॥ পরিচালনা : পীযূষ বসু ॥ নায়িকা : সুমিত্রা মুখার্জী ॥ ৬।৯।৭৪ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

অমানুষ ॥ পরিচালনা : শক্তি সামন্ত ॥ নায়িকা : শর্মিলা ঠাকুর ॥ ১৮।১০।৭৪ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ॥

১৯৭৫

মৌচাক ॥ পরিচালক : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ নায়িকা : মিঠু মুখার্জী ও সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥ ১০।১।৭৫ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

আমি সে ও সখা ॥ পরিচালক : মঙ্গল চক্রবর্তী ॥ নায়িকা : কাবেরী বসু ॥ ১১।৪।৭৫ শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ॥

অগ্নীশ্বর ॥ পরিচালক : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ নায়িকা : মাধবী চক্রবর্তী ॥ ১৩।৬।৭৫ রাধা, পূর্ণ, প্রাচী ॥

নগর দর্পণে ॥ পরিচালক : যাত্রিক ॥ নায়িকা : কাবেরী বসু ॥
২৭।৬।৭৫ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥
কাজললতা ॥ পরিচালক : বিকাশ রায় ॥ নায়িকা : অপর্ণা সেন ॥
২৯।৮।৭৫ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ॥
প্রিয় বান্ধবী ॥ পরিচালক : হীরেন নাগ ॥ নায়িকা : সুচিত্রা সেন ॥
৩১।১০।৭৫ রাধা, পূর্ণ, প্রাচী ॥
সন্ন্যাসী রাজা ॥ পরিচালক : পীযূষ বসু ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী ॥
৩১।১০।৭৫ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥
বাঘবন্দী খেলা ॥ পরিচালক : পীযূষ বসু ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী ॥
১৯।১২।৭৫ রাধা, পূর্ণ, প্রাচী ॥
অমানুষ (হিন্দী) ॥ পরিচালক : শক্তি সামন্ত ॥ নায়িকা : শর্মিলা ঠাকুর ॥
মুনলাইট ॥

১৯৭৬

হোটেল স্নো ফক্স ॥ পরিচালক : যাত্রিক ॥ নায়িকা : মিঠু মুখার্জী ॥
১৬।৪।৭৬ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥
আনন্দমেলা ॥ পরিচালক : মঙ্গল চক্রবর্তী ॥ নায়িকা : আরতি ভট্টাচার্য ॥
২৩।৪।৭৬ রাধা, পূর্ণ ॥
মোমবাতি ॥ পরিচালক : যাত্রিক ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী ॥
১৮।৬।৭৬ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ॥
সেই চোখ ॥ পরিচালক : সলিল দত্ত ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥
৩০।৭।৭৬ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥
নিধিরাম সর্দার ॥ পরিচালক : রবি ঘোষ ॥ নায়িকা : অপর্ণা সেন ॥
২৪।৯।৭৬ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ॥
বহ্নিশিখা ॥ পরিচালক : পীযূষ বসু ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী ॥
২৬।১১।৭৬ রাধা, পূর্ণ, প্রাচী ॥
চাঁদের কাছাকাছি ॥ পরিচালক : যাত্রিক ॥ নায়িকা : অপর্ণা সেন ॥
৩১।১২।৭৬ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

১৯৭৭

রাজবংশ ॥ পরিচালক : পীযূষ বসু ॥ নায়িকা : আরতি ভট্টাচার্য ॥
৭।১।৭৭ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥
সব্যসাচী ॥ পরিচালক : পীযূষ বসু ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী ॥
২১।১।৭৭ রাধা, পূর্ণ, প্রাচী ॥

অসাধারণ ॥ পরিচালক : সলিল সেন ॥ নায়িকা : আরতী ভট্টাচার্য ॥
১৮।২।৭৭ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

ভোলা ময়রা ॥ পরিচালক : পীযূষ গাঙ্গুলী ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী ॥
১৪।৪।৭৭ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

সিস্টার ॥ পরিচালক : পীযূষ বসু ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী ॥
২৯।৪।৭৭ উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা ॥

জাল সন্ন্যাসী ॥ পরিচালক : সলিল সেন ॥ নায়িকা : আরতি ভট্টাচার্য ॥
২৬।৮।৭৭ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

আনন্দ আশ্রম ॥ পরিচালক : শক্তি সামন্ত ॥ নায়িকা : শর্মিলা ঠাকুর ॥
১৪।১০।৭৭ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

১৯৭৮

দুই পুরুষ ॥ পরিচালক : সুশীল মুখার্জী ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী ॥
২৪।২।৭৮ উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা ॥

নিশান ॥ পরিচালক : এস. এস. বালান ॥ নায়িকা : আরতি ভট্টাচার্য ॥
৪।৮।৭৮ বসুশ্রী, বীণা, মিত্রা ॥

বনরাজ তামাং ॥ পরিচালক : পীযূষ বসু ॥ নায়িকা : সন্ধ্যা রায় ॥
২৯।৯।৭৮ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

বন্দী ॥ পরিচালক : আলো সরকার ॥ নায়িকা : সুলক্ষণা পণ্ডিত ॥
১৪।৪।৭৮ রূপবাণী, ভারতী, অরুণা ॥

১৯৭৯

ব্রজবুলি ॥ পরিচালনা : পীযূষ বসু ॥ নায়িকা : সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥
১৯।১।৭৯ মিনার, বিজলী, ছবিঘর ॥

দেবদাস ॥ পরিচালনা : দিলীপ রায় ॥ নায়িকা : সুমিত্রা মুখার্জী ও
সুপ্রিয়া দেবী ॥ ২৩।৩।৭৯ উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা ॥

সুনয়নী ॥ পরিচালনা : সুখেন দাস ॥ নায়িকা : শকুন্তলা বড়ুয়া ॥
৩।৮।৭৯ রাধা, পূর্ণ, প্রাচী ॥

নবদিগন্ত ॥ পরিচালনা : পলাশ ব্যানার্জী ॥ নায়িকা : সুমিত্রা মুখার্জী ॥
২১।৯।৭৯ শ্রী, ইন্দিরা ॥

শ্রীকান্তের উইল ॥ পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত ॥ নায়িকা : সুমিত্রা মুখার্জী ॥
২৮।৯।৭৯ রাধা, পূর্ণ, জগৎ ॥

সমাধান ॥ পরিচালনা : জয়ন্ত বসু ॥ নায়িকা : গায়ত্রী মুখার্জী ॥
৩০।১১।৭৯ শ্রী, ইন্দিরা ॥

॥ ১৯৭৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দি ছবি ॥

কিতাব ॥ পরিচালক : গুলজার ॥ নায়িকা : বিদ্যা সিন্‌হা ॥ এবং বন্দী ॥

১৯৮০

পঞ্চীরাজ ॥ পরিচালক : পীযূষ বসু ॥ নায়িকা : নন্দীতা বসু ॥
১।২।৮০ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

রাজনন্দিনী ॥ পরিচালক : সুখেন দাস ॥ নায়িকা : সুমিত্রা মুখার্জী ও সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥ ৭।৩।৮০ শ্রী, ইন্দিরা, জগৎ ॥

আরো একজন ॥ পরিচালক : সুজন ॥ নায়িকা : সুমিত্রা মুখার্জী ॥
১১।৪।৮০ ইন্দিরা ॥

দর্পচূর্ণ ॥ পরিচালক : দিলীপ রায় ॥ নায়িকা : সন্ধ্যা রায় ॥
২৭।৬।৮০ উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ॥

দুই পৃথিবী ॥ পরিচালক : পীযূষ বসু ॥ নায়িকা : সুপ্রিয়া দেবী ॥
২৭।৬।৮০ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ॥

রাজাসাহেব ॥ পরিচালক : পলাশ ব্যানার্জী ॥ ২৯।৮।৮০ রাধা, পূর্ণ, প্রাচী ॥

॥ ১৯৮১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ও হিন্দি ছবি ॥

প্লট নম্বর—৫ ॥ ওগো বধূ সুন্দরী ॥ খনা বরাহ ॥ সূর্যসাক্ষী ॥ প্রতিশোধ। কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ॥ ছুরিয়াঁ ॥

॥ ১৯৮২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ও হিন্দি ছবি ॥

ইমনকল্যাণ ॥ দেশপ্রেমী ॥

॥ অনুলেখকের সংযোজন ॥

মহানায়ক—আমাদের নয়নের মণি উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায় যে ছবিগুলির কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরেছেন এবং যেগুলি পারেননি সেই ছবিগুলির তালিকা এখানে দিলাম ॥

শুভেন্দু চ্যাটার্জী পরিচালিত : হব ইতিহাস ॥ দু'তিনদিন উত্তমবাবু শুটিং করেছেন।

ইন্দর সেন পরিচালিত : হার মানি নি ॥ মাত্র দু'দিন উত্তমবাবু শুটিং করেছেন।

শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত : ইমনকল্যাণ ॥ উত্তমবাবু ক'দিন শুটিং করেছেন।

গৌর চৌধুরী পরিচালিত : অগ্নিবিন্দু ॥ উত্তমবাবু ক'দিন শুটিং করেছেন।

শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত : তিল থেকে তাল ॥

মৃণাল চক্রবর্তী পরিচালিত : অগ্নিতৃষ্ণা ॥

এ্যালবার্ট রোড বর্তমানে "উত্তমকুমার সরণি"।

AMARBOI.COM

শ্রীমান গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ যখন আমার আত্মজীবনী লিখবার জন্য অনুরোধ জানাল তখন তা উপেক্ষা করতে পারলাম না।

ইতিপূর্বে অনেকেরই অসীম আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রত্যাখ্যান করেছি। এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলাম এই তরুণ সাংবাদিক-সাহিত্যিকের কাছে ✤

[illegible]

AMARBOI.COM